শান্তিপর্ব

SANTIPARBA

A Bengali Novel

by

PRAFULLA ROY

শান্তিপর্ব

প্রফুল্ল রায়



রত্না প্রকাশনী

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
এন, সাহা
কলিকাতা-৯

প্রকাশ কাল—শ্রাবণ ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীমদনমোহন চৌধুরী
শ্রীদামোদর প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭

দিব্যেন্দু পালিত
প্রিয়বরেষু

শান্তিপর্ব

পশ্চিম থেকে পুবে যে হাইওয়েটা আড়াআড়ি ফরবেশগঞ্জের দিকে গেছে তার দু'ধারে উত্তর বিহারের অফুরন্ত ফসলের মাঠ। আকাশ যেখানে অনেকটা দিগন্তে নেমেছে, এই সব শস্যক্ষেত্র ততদূর ছড়ানো। মাঠের পর দিগন্তের গা ঘেঁষে ছোটখাটো ক'টা পাহাড় আকাশে উঁচুনিচু ঢেউ এঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

সময়টা ফাল্গুনের মাঝামাঝি। মাসদেড়েক আগে, মাঘ পড়তে না পড়তেই 'ধানকাটাই'রা মাঠ ফাঁকা করে ফসল তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এখন যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক—সব ধু ধু, শূন্য, নিঃস্ব।

সবে সকাল হয়েছে। এইমাত্র দিগন্তের তলা থেকে সূর্যটা উঠে এল। ষষ্ঠ ঋতুর মায়াবী আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক।

ফাল্গুনের আধাআধি কেটে গেলেও সকালের দিকে রোদে তেমন ধার নেই। মিহি সিল্কের মতো কুয়াশার পটি আকাশের কানাতে কি গাছপালার মাথায় কিংবা ফসলের মাঠে আবছাভাবে ছড়িয়ে থাকে। এখনো বাতাসে হিমের আমেজ মাখানো। গায়ে লাগলে শিরশির করে। ইতি'র পর পুনশ্চ'র মতো উত্তর বিহারের এই অঞ্চলে শীতের খানিকটা জের থেকেই গেছে।

ফাল্গুনের এই সকালে পুরনো মডেলের বিরাট বিরাট চাকাওলা, হুডখোলা একটা মোটর হাইওয়েতে ঝড় তুলে পুব দিকে ছুটে যাচ্ছিল। ওটা যাবে ধরমপুরা টাউনে। গাড়িটার রুগ্‌ণ ঝরঝরে ইঞ্জিনে হাজারটা গলদ। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হলে যেমন হয়, অনবরত সেইরকম সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরুচ্ছে ওটার ফুসফুস থেকে।

গাড়িটার পেছনের সীটে বসে আছে কিরণ। তার পাশে তাদের পারিবারিক ভকিল বা উকিল খুবলাল সহায়। গাড়িটা চালাচ্ছে কিরণদের বহুদিনের পুরনো ড্রাইভার চৌধারী সিং।

কিরণের বয়স একুশ বাইশ। ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় তাকে বেশ লম্বাই বলা যায়। টান টান, সতেজ, মেদশূন্য চেহারা। মুখ ডিম্বাকৃতি। তার মসৃণ সজীব ত্বকে ডিমের ভেতরকার কুসুমের মতো হলদে আভা। পাতলা নাক সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। উজ্জ্বল চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। রেশমের সূক্ষ্ম সুতোর মতো তার বাদামী চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা, ভুরু দুটো প্লাক্‌ করা।

কিরণের গালে এবং ঠোঁটে হাল্কা রং, নখ ম্যানিকিওর করা। তার শরীর থেকে পারফিউমের ফিকে গন্ধ উঠে আসছিল। বোঝা যায়—এই সব রং এবং গন্ধ কোনোটাই টাটকা নয়, দু'তিন দিনের বাসি।

কিরণের পরনে স্লিভলেস ব্লাউজ আর মেরুন রঙের শিফন শাড়ি। গয়না-টয়না সে পছন্দ করে না। বাঁ হাতে চৌকো সুদৃশ্য ঘড়ি এবং তার মেটাল ব্যাণ্ডটি ছাড়া আর কোথাও ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। কোলের ওপর অবশ্য একটা গগলস্ আলতোভাবে পড়ে আছে।

একটু লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায়, এই মেয়েটির মধ্যে একটা শক্ত মেরুদণ্ড আছে। আছে এক ধরনের অনমনীয়তা, যেটাকে ব্যক্তিত্বই বলা যেতে পারে। সব মিলিয়ে সে আধুনিক, ঝকঝকে, নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, তেজী একটি তরুণী। অন্তত বাইরে থেকে সেরকম ধারণা করা যায়।

অথচ এমনটা হবার কথা নয়। কিরণরা শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণ। গোঁড়ামি, হাজার বছরের সংস্কার, ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ এবং ছুঁয়াছুতের চুলচেরা বিচার ইত্যাদি একাকার হয়ে তাদের যে পারিবারিক ট্রাডিশান, তার সঙ্গে কিরণের সাজপোশাক, দামী বিদেশী পারফিউম, চুলের ছাঁট, কিছুই খাপ খায় না। তবু কিরণ যে আচমকা তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড আর বংশগত গোঁড়ামির আবহাওয়া থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া আলাদা রকমের হয়ে গেছে, এর পেছনে রয়েছে তার বাবা মুকুটনাথ মিশ্র এবং ত্রিকূটনারায়ণ দুবের চতুর এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। ত্রিকূটনারায়ণ পনেরো বছর ধরে একনাগাড়ে স্বপ্ন দেখছেন কিরণকে পুতহু বা পুত্রবধূ করে ঘরে তুলবেন। কিন্তু এসব কথা পরে।

কিরণের সঙ্গী ভকিল খুবলাল সহায়ের চেহারাখানা দেখার মতো। শরীরে মাংস-টাংস বা শাঁস বলে কিছু নেই, সবটাই হাড় আর ছিবড়ে। লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা, তাই কিছুটা কুঁজো দেখায়। তার সব কিছুই অস্বাভাবিক লম্বা—হাত, পা, আঙুল, মুখ। ঢিবির মতো নাকের তলায় চৌকো গোঁফ। চোখে ধূর্ত এবং সতর্ক চাউনি।

খুবলালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। তার চুল পাকলেও সাদা হয়নি, কেমন যেন পাঁশুটে রং ধরে আছে।

লোকটার পরনে ঢলঢলে ফুল প্যাণ্ট আর বেঢপ কালো কোট। মামলার ব্যাপারে এজলাসেই যাক, আর মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতেই বেরোক, এই কালো কোটটা তার গায়ে সর্বক্ষণ ঝুলতেই থাকে।

চৌত্রিশ বছর আগে পাটনা থেকে ল'য়ের ডিগ্রি নিয়ে আসার পরদিনই কিরণের বাবা মুকুটনাথ খুবলালকে তাঁদের নিজস্ব ভকিল করে নেন। মিশ্র বংশের আইনঘটিত যাবতীয় দায়দায়িত্ব তখন থেকেই তার কাঁধে চেপে আছে। জমিজমা, বিষয়-আশয় সম্পর্কে মিশ্রদের সবরকম স্বার্থই তার হাতে সুরক্ষিত। কেস-টেস ছাড়াও মুকুটনাথদের পারিবারিক প্রচুর কাজও করে দেয় খুবলাল। লোকটা যেমন অনুগত তেমনি বিশ্বাসী। তার আনুগত্য প্রায় পোষা কুকুরের মতো।

পাশে বসে খুবলাল চোখের কোণ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে, খানিকটা ভয়ে ভয়েই যেন, কিরণকে লক্ষ্য করছে। কিছু বলতে চায় সে, কিন্তু ঠিক সাহস হচ্ছে না। অথচ এখন না বললেই নয়। কেননা, কয়েক মিনিটের ভেতর তারা ধরমপুরা পৌঁছে যাবে। তখন আর সময় পাওয়া যাবে না। নিজের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা অস্থিরতা এবং স্নায়বিক চাপ টের পেতে থাকে সে।

কিরণ কিন্তু একবারও খুবলালের দিকে তাকাচ্ছে না। তার মুখ জানালার বাইরে ফেরানো।

এই সকালবেলায় হাইওয়েতে লোকজন বা গাড়িটাড়ি তেমন চোখে পড়ে না। মাঝে মধ্যে দু একটা দূরপাল্লার বাস বা ট্রাক সাঁ-সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি বেশ কয়েকটাই দেখা গেল। চাকায় ক্যাঁচোর-কোঁচর আওয়াজ তুলে অলস ঢিমে চালে সেগুলো নবীগঞ্জের দিকে চলেছে।

অদৃশ্য চোরা স্রোতের মতো ফাগুনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। রাস্তার দু' ধারে পরাস আর সীমার গাছগুলোতে শীত কাটতে না কাটতেই ফুল ফুটতে শুরু করেছে। নির্জন ফসলের খেতে ক্বচিৎ দু-একটা মাঠকুড়ানি চোখে পড়ে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে দু'চার দানা শস্য এখানে ওখানে, আলের ধারে বা ইঁদুরের গর্তে পড়ে আছে, তারা সেগুলো খুঁটে খুঁটে জড়ো করছে। আলের ওপর দিয়ে বুক টেনে টেনে মন্থর ভঙ্গিতে চলেছে আগুনতি গোসাপ। দেখে মনে হয়, পৃথিবীর কোনো কিছুতে তাদের আদৌ গরজ নেই।

মাথার ওপর এখন অজস্র পাখি—ঝাঁকে ঝাঁকে বক সিল্লি আর পরদেশী শুগা। ডানায় হাওয়া মাপতে মাপতে তারা দিগন্ত পেরিয়ে কোথায় চলেছে, কে জানে।

কিরণ জানে, হাইওয়ের ডাইনে গোলগোলি মৌজা আর বাঁ ধারের মৌজা-টার নাম বইহারি। দুই মৌজায় এবং দূরে ছোটো ছোটো পাহাড়ের যে রেঞ্জটা রয়েছে সেগুলোর গায়ে যত জমিজমা, সবই তাদের। সে শুনেছে, কয়েক বছর

আগে বিনোবা ভাবে ভূদান মুভমেণ্টের কাজে এদিকে পদযাত্রা করেছিলেন। গরীব ভুখা ভূমিহীন মানুষদের জন্য বড়ো বড়ো জমিমালিকদের কাছে তিনি হাত পেতেছিলেন, যদি তারা কৃপা করে নিজেদের শত শত একর জমি থেকে দু' এক টুকরো খেত দান করে।

বিনোবার পদযাত্রা এ অঞ্চলে বেশ সাড়া তুলেছিল। বড়ো জমিমালিকদের হৃদয়ের নাকি এতটাই পরিবর্তন ঘটে যায় যে বিনোবার সামনে সরকারী অফিসারদের ডেকে এনে স্ট্যাম্পড্ কাগজে তারা নিভূ´ম কিষাণদের নামে দানপত্র লিখে দিয়েছিল। সেবার তার বাবা মুকুটনাথও কয়েক ঘর অচ্ছুতকে সুদূর পাহাড়ের গায়ের সবটুকু জমি লিখে দিয়ে বিনোবাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ভূদান যজ্ঞে মহানুভবতার এমন দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে আগে আর কখনো দেখা যায় নি, এমন কি পরেও না। অভিভূত আপ্লুত বিনোবা নাকি এমন কথাও বলেছেন, গোটা ভারতবর্ষে যদি মুকুটনাথের মতো মহৎ আত্মা হাজারখানেকও পাওয়া যায় এ দেশ সত্যিকাবের রামরাজ্য হয়ে যাবে। অবশ্য তিনি জানতেন না মুকুটনাথ যে জমি দান করেছেন তা পাথুরে কর্কশ এবং বাঁজা। এই পড়তি নিষ্ফলা মাটিতে এক দানা ধান গেঁহু তো দূরের কথা, অকেজো আগাছাও জন্মায় না।

তবে বইহারি এবং গোলগোলি মৌজার উৎকৃষ্ট দো-ফসলা জমিগুলোর কথা একেবারেই আলাদা। দু'বার লাঙল দিয়ে বীজ রুইলেই ফি বিঘেতে তিরিশ মণ করে ভালো জাতের তুলসীমঞ্জরী, পূর্বী কেলাসর বা গজমুক্তা ধান ফলে। চৈত্র মাসে পাওয়া যায় অঢেল রবি ফসল—তিল তিসি রাই সর্ষে মুগ কলাই ইত্যাদি।

মিশ্রদের কয়েক জেনারেশন ধরে একটা পারিবারিক অহংকার বা গর্ববোধ রয়েছে। তাঁরা এ অঞ্চলের অন্য জমিমালিকদের মতো নন। অন্যেরা লাঠি বন্দুক এবং পোষা পহেলবানদের জোরে বা হাজারটা কূট-কৌশলে অচ্ছুত, আনপড়, গরীবের চাইতেও গরীব মানুষদের জমিজমা খেত কেড়েকুড়ে নেয়। মিশ্রদেরও প্রচুর গুলি-বন্দুক আছে, পোষা পহেলবান আছে, কিন্তু জোরজুলুম করে কারো এক খুর মাটিও তারা কোনোদিন ছিনিয়ে নেননি। এটা তাঁরা ভাবতেই পারেন না, উলটে এ জাতীয় বর্বর নিষ্ঠুর পদ্ধতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন।

মিশ্রদের বিষয়-আশয় বাড়াবার প্রক্রিয়া একেবারেই অন্যরকম। তাঁদের যাবতীয় জমিজমা এসেছে বিয়ের যৌতুক হিসেবে। মিশ্রদের এমনই কপাল যে গত পাঁচ জেনারেশন ধরে তাঁদের বংশে একটি মেয়েও জন্মায়নি, সবই ছেলে। মুকুটনাথ, তাঁর বাবা মথুরনাথ, তাঁর বাবা জগনাথ, তাঁর বাবা রাজনাথ এবং তস্য

পিতা চতুরনাথ। চতুরনাথের আগে মিশ্রদের বংশতালিকার আদি ইতিহাস এখন আর জানা যায় না। সে সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

মিশ্ররা বেছে বেছে এমন সব ঘর থেকে পুতহু বা পুত্রবধূ এনেছেন যাদের জমি ঠিক তাঁদেরই জমিজমার পাশে। প্রতিটি ছেলের বিয়েতে তাঁরা দেড়'শ থেকে দু'শ বিঘে করে জমি আদায় করেছেন। ছেলের শ্বশুরের কাছে যৌতুক হিসেবে মিশ্ররা সোনা চাঁদি হীরে জেবর এবং টাকাপয়সা কিছুই চাননি। এসব উত্তেজক ধ্বংসপ্রবণ বস্তুগুলির ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ কম, কিন্তু জমির মার নেই। চোর-ডাকাত তা কেড়ে নিতে পারবে না।

যৌতুক নিয়েই জমিগুলোকে আইনের মারপ্যাঁচে এমনভাবে মিশ্ররা বেঁধে দিয়ে গেছেন যাতে পরের জেনারেশনের কেউ বেচে 'সত্যনাশ' করে দিতে না পারে। এইভাবে সম্পত্তি বাড়তে বাড়তে গোলগোলি এবং বইহারি মৌজা দুটো তাঁদের মুঠোর ভেতর চলে এসেছে।

আসলে বংশ পরম্পরায় মিশ্ররা বিয়েটাকে বিষয় সম্পত্তি বাড়াবার কাজে একটা সূক্ষ্ম চারুকলার স্তরে তুলে এনেছেন। তাঁদের কাছে বিয়ে মানেই জমি, পুতহুর অর্থ হ'ল ল্যাণ্ড প্রোপার্টি। পুরুষানুক্রমে এটাই হ'ল মিশ্র বংশের বীজমন্ত্র।

কিন্তু পাঁচ জেনারেশন নির্বিঘ্নে কাটবার পর হঠাৎ পরিবারিক পরম্পরা ভেঙে মুকুটনাথের দুটি মেয়ে হয়েছে—কিরণ এবং সুষমা। বরাবর মিশ্ররা যৌতুক পেয়েই এসেছেন, এবার তাঁদের দেবার পালা। দুই মেয়ের বিয়েকে মুকুটনাথ কতটা নিপুণভাবে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন, এখন সেটাই দেখার।

কিরণ অন্যমনস্কর মতো তাকিয়েই আছে। দু'ধাবের ফাঁকা মাঠ, আবছা ফিন-ফিনে কুয়াশা, মাথার ওপর পাখির ঝাঁক বা দিগন্তের গা ঘেঁষে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেঞ্জ, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। গাড়িটা ধরমপুরার দিকে যত এগোচ্ছে ততই এক ধরনের ভয় উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা তার চোখেমুখে ফুটে উঠছে।

পরশু দুপুরে দিল্লিতে তাদের হোস্টেলে এসে খুবলাল জানিয়েছিল, মুকুটনাথ হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, আজই কিরণকে খুবলালের সঙ্গে ধরমপুরায় ফিরে যেতে হবে। প্রচুর ঘুষ দিয়ে দু'খানা টিকিট কেটে সেই দিনই রাত্তিরের ট্রেন ধরেছিল তারা। কাল সন্ধ্যেয় এসেছে পাটনা। সেখান থেকে আরেকটা ট্রেনে আজ ভোরে এসে নেমেছে পানপোরিয়াতে। স্টেশনে চৌধারী সিং তাদের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

এদিকে প্রায় মরিয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত খুবলাল পাশ থেকে ডাকে, 'কিরণ—'

কিরণ আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

খুবলাল ভীরু গলায় বলে, 'বেটা, আমার একটা অন্যায় হয়ে গেছে।'

ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে যায় কিরণের, এবারও সে কিছু বলে না।

খুবলাল গলা খাঁকরে খানিকটা সময় নিয়ে সাহস সঞ্চয় করে। তারপর বলে, 'আমি তোমাকে ঝুট বলেছি।'

'ঝুট!' কিরণের গলায় শব্দটা প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। বেশ অবাকই হয়ে গেছে সে।

'হ্যাঁ। মুকুটনাথজির কিছু হয়নি, তাঁর তবিয়ত ভালোই আছে।' নিশ্বাস না ফেলে এক দমে বলে যায় খুবলাল।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে কিরণ। কী বলবে, এই মুহূর্তে ভেবে পায় না। অনেকক্ষণ পর বলে, 'মিথ্যে বলার কী দরকার ছিল? বাবুজির জন্যে দুশ্চিন্তায় দু'রাত আমাকে ঘুমোতে দেননি।'

'জানি বেটা, চিন্তা হবারই কথা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।' খুবলাল যেন অনুতপ্ত সুরেই জানায়, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের অজুহাত খাড়া না করলে কিছুতেই কিরণকে দিল্লি থেকে আনা যেত না।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম চক্রান্ত রয়েছে। হঠাৎ শরীরের সমস্ত রক্ত কিরণের মাথায় উঠে আসে। অসহ্য রাগে তার নাক মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে। তীব্র গলায় সে বলে, 'এর মানে কী? কী মতলব আপনাদের?'

খুবলাল নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে কাঁপা গলায় বলে, 'এর বেশি কিছু বলতে পারব না বেটা। মুকুটনাথজি যেমন বলেছেন আমি তাই করেছি। আমি তাঁর নিমক খাওয়া নৌকর।'

লোকটার ওপর হঠাৎ করুণাই হয় কিরণের। গলার ঝাঁজ কমিয়ে হঠাৎ সে বলে, 'ঠিক আছে, ধরমপুরায় গিয়ে এখনই আমি বাবুজিকে জিজ্ঞেস করব।'

কিছু একটা মনে পড়ে যায় খুবলালের। সে বলে, 'মুকুটনাথজি তো এখানে নেই।'

কিরণ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় তবে!'

'দো রোজ আগে বেনারস গেছেন। একই সাথ আমরা ধরমপুরা থেকে বেরিয়েছিলাম। আমি দিল্লি গেলাম, মুকুটনাথজি কাশী।'

কিরণের বিস্ময় কয়েক গুণ বেড়ে যায়, 'কাশী গেছেন কেন?'

'তোমার দাদীজির জন্যে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

খুবলাল সহায় এবার যা বলে, সংক্ষেপে এইরকম।

মাসখানেক আগে কিরণের নব্বই বছরের ঠাকুমার শরীরের হাল আচমকা এমনই খারাপ হয়ে যায় যে মনে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু একেবারে অবধারিত। তক্ষুণি তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করতে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাশীতে 'দেহান্ত' ঘটলে স্বর্গবাস অনিবার্য—পুরুষানুক্রমে মিশ্রদের এ বিশ্বাস অটল। কিন্তু বেনারসে গোটা একটি মাস কাটিয়েও যখন বুড়ির মরার কোনোরকম ইচ্ছাই দেখা গেল না, বরং হাওয়া এবং জায়গা বদলের কারণে রীতিমত সুস্থই হয়ে উঠলেন তখন অত দূরে তাঁকে রাখার মানে হয় না। মুকুটনাথজি তাই তাঁকে আনতে কাশী ছুটেছেন। আজকালের মধ্যে ওঁবাও ধরমপুরায় ফিরে আসবেন।

কিরণ বলে, 'দাদীকে বেনারস পাঠানো হয়েছে, আমাকে কেউ জানায়নি তো!' তাকে বেশ ক্ষুব্ধই মনে হয়।

খুবলাল বলে, 'আচমকা এরকম একটা খবর পেলে দিল্লিতে তুমি খুব চিন্তা করতে, তাই জানানো হয়নি। তবে তেমন কিছু হলে মুকুটনাথজি টেলিগ্রাম করতেন কি লোক পাঠাতেন।'

কিরণ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। বাবার জন্য পরশু থেকে যে দুশ্চিন্তা প্রবল চাপে তার স্নায়ুগুলোকে সারাক্ষণ ছিঁড়ে ফেলছিল, যে অসহ্য কষ্টে বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, এখন সে সব কেটে যায়। হালকা বোধ করতে গিয়েও পরক্ষণে আর এক ধরনের মারাত্মক ভয়ে কিরণের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত নামতে থাকে। কেননা, তিনদিন পর এখন হঠাৎ মনে পড়ে যায়—তার পেটে রয়েছে একটি অবৈধ ভ্রূণ, আর এই ভ্রূণটি তৈরি হয়েছে খ্রিস্টানের বীজ থেকে। শুধু খ্রিস্টানই নয়, সে অচ্ছুতও। অচ্ছুত থেকে সে খ্রিস্টান হয়েছে।

ধরমপুরার মিশ্রদের চোখে কুঁয়ারীর, বিশেষ করে গোঁড়া শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণের ঘরের অবিবাহিত মেয়ের গর্ভে বাচ্চা আসার মতো জঘন্য পাপ ভূ-ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। তার ওপর সেই বাচ্চা যদি অচ্ছুত ও খ্রিস্টানের হয় তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবতেও সাহস হয় না কিরণের।

মিশ্রদের ধারণা, সত্যযুগের পর তাঁদের মতো শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। কাজেই মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মাগুলি যে স্পেশাল শকটে চেপে সোজাসুজি স্বর্গে চলে যায়, এ ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

স্বর্গের ব্রাহ্মণ কলোনিতে পুরুষানুক্রমে মিশ্র বংশের সে সব আত্মা অপার শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে, ঘুণাক্ষরে যদি তারা কিরণের পেটের ভ্রূণটার কথা টের পায়, একেবারে শিউরে উঠবে।

আপাতত স্বর্গবাসী পূর্বপুরুষদের অদৃশ্য আত্মাগুলির কথা আদৌ ভাবছে না কিরণ। এই পৃথিবীতে যাঁরা চারপাশের গাছপালা প্রান্তর বা আকাশের মতোই প্রত্যক্ষ, তাঁদের মুখগুলি চোখের সামনে সারি সারি ফুটে উঠতে থাকে। মা, বাবা, ঠাকুমা, বশিষ্ঠনারায়ণ ইত্যাদি। নিশ্চয়ই মুকুটনাথ প্রভাকরের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং পরিণতি হিসেবে তার গর্ভবতী হবার খবর পেয়ে গেছেন। তাই চতুর একটি চাল চেলে খুবলালকে দিল্লি পাঠিয়ে তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন।

কিরণ একবার ভাবে, চৌধারী সিংকে গাড়ি থামাতে বলে নেমে যাবে। তারপর বাস-টাস ধরে সোজা স্টেশনে গিয়ে দিল্লির ট্রেন ধরবে। পরমুহূর্তেই অদম্য জেদ তাকে পেয়ে বসে। কিরণের ধারণা সে যা করেছে তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায়, কেউ তার ওপর জোরজুলুম করেনি। এই সন্তান ধারণের জন্য তার কোনোরকম পাপবোধ বা অনুতাপ হচ্ছে না।

কিরণ ভাবে, বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছে তখন ভীরুর মতো পালিয়ে যাওয়ার কারণ নেই। সে জানে, ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ, বিখ্যাত মিশ্র বংশের অহংকার, গোঁড়ামি, হাজার বছরের পুরনো সংস্কার, মা, মুকুটনাথ, ঠাকুমা, তাদের কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ চৌবে—সব একাকার হয়ে প্রচণ্ড শক্তিমান, অনমনীয় এবং একরোখা এক প্রতিপক্ষ তাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। এদের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে।

মিশ্র বংশের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার হ'ল—শান্তি এবং স্থিতাবস্থা। বস্তুটাকে মূল্যবান পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে জেনারেশনের পর জেনারেশন আগলে রাখা হয়েছে। পুরুষানুক্রমে ধর্মপালনের মতো সবাই এটা অটুট রাখছেন। কখনো কোনো কারণে শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটেনি।

কিরণের বাবা মুকুটনাথ বহুকাল আগে কয়েক বছর ধরমপুরার সরকারী হাই স্কুলে যাতায়াত করেছিলেন। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর কথায় হামেশাই দু'চারটে ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝেই বলেন, 'যা চালু আছে তা চলতে দাও। কিসী প্রকার ডিসটার্ব মাত্ করনা। তাতে অশান্তি ছাড়া কোনো গেইন নেই। শান্তিভঙ্গ আমার বিলকুল না-পসন্দ।'

কিরণের কারণে কয়েক শ' বছর পর এই প্রথম মিশ্র বংশে সম্ভবত শান্তি ধ্বংস হ'তে চলেছে।

নানা চিন্তার মধ্যেও একটা কথা ভেবে মজাই পায় কিরণ। ঠাকুমা গঙ্গাযাত্রা শেষ না করে বেনারস থেকে ফিরে আসছেন, আর পেটে একটি অবৈধ ভ্রূণ নিয়ে সে আসছে দিল্লি থেকে। তার এবং ঠাকুমার মধ্যে মাত্র একটা জেনারেশনের গ্যাপ। কিন্তু মনে হয় তারা যেন সৌরলোকের আলাদা আলাদা দুটি গ্রহের মানুষ—পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা।

তার পেটের ভ্রূণটার কথা জানামাত্র ঠাকুমার মনের অবস্থা কী হবে, ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে কিরণ। আর চমকে উঠতে গিয়ে মনে মনে হেসেই ফেলে। বুড়ির তখনই, সেই মুহূর্তে দেহান্ত হয়ে যাবে। নতুন করে কাশীতে গঙ্গাযাত্রার সময় আর পাওয়া যাবে না।

দুই

হাইওয়ের গা ঘেঁষে ধরমপুরা টাউন। বড়ো সড়ক অর্থাৎ হাইওয়ে থেকে নেমে এক ফার্লং যেতে না যেতেই ধরমপুরার প্রথম যে বাড়িটা চোখে পড়ে সেটা মিশ্রদের।

বিহারের এই সব অঞ্চলের বিরাট বিরাট জমিমালিকদের বাড়ি যেমন হয়, মিশ্রদের বাড়িটা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রায় সাত-আট বিঘে জায়গা জুড়ে বিশাল কমপাউণ্ড। দশ ফুট খাড়াই আর আড়াই ফুট চওড়া দেয়াল দিয়ে সেটা ঘেরা। বাউণ্ডারি ওয়ালের মাথায় নানা রং-এর ভাঙা কাচের টুকরো আর উলটো করে গজাল বসানো। এটা হ'ল চোর এবং ডাকাতদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড দরজা। তারপর অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে জবরদস্ত কোলাপসিবল গেট। দিনরাত দুটো বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান কাঁধে বন্দুক এবং বুকে টোটার মালা ঝুলিয়ে সেখানে পাহারা দেয়। গেটের ডান পাশে কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে শ্বেত পাথরের ফলকে বাড়িটার নাম লেখা আছে: 'মিশ্র নিকেত'।

সাত আট বিঘের পুরোটা জুড়েই বাড়ি নয়। মাঝখানে প্রকাণ্ড তেতলা। কম করে খান বাটেক ঘর আছে এ বাড়িতে। সামনে এবং পেছনে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। ছাদে কুলদেবী মহালছমীর ঘর বা মন্দির।

আগে সামনের দিকের খোলা জায়গায় শেড বানিয়ে প্রচুর ঘোড়া, মোষ এবং কয়েকটা ফিটন এবং বড়ো বড়ো চাকাওলা, ক্যানভাসের হুড-বসানো, পুরনো মডেলের একটা মোটর রাখা হ'ত। বাড়িটার পেছনে রয়েছে দিশি ফুল, ফল এবং সবজির বাগান। দিনকয়েক আগে সামনের শেড খুলে পেছনের বাগানের পাশে নিয়ে বসানো হয়েছে এবং গরু মোষ ফিটন মোটর সব ওখানে চলে গেছে।

সামনের দিকটা একেবারে তকতকে পরিষ্কার। শুধু এক কোণে দিনরাত মজুর খাটিয়ে একটা পুবমুখি নতুন মন্দির বানানো হয়েছে। এতে কুলদেবী মহালছমীর মূর্তি নেই, আছে নীল পাথরে খোদাই নীলকণ্ঠ শিবের মূরত। রাতা-রাতি এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা নেহাত অকারণে নয়। কিন্তু সে কথা পরে।

মন্দিরের বাঁ পাশে ছোটোখাটো পুকুরের মতো চৌবাচ্চা করা হয়েছে। চৌবাচ্চাটা গঙ্গাজলে ভর্তি। সেটার গা ঘেঁষে বাঁধানো চবুতর।

মিশ্ররা যে মারাত্মক ধরনের গোঁড়া সেটা বাড়ির চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়। এত বড়ো বাড়ির জানালা এবং দরজাগুলো ভীষণ চাপা এবং ছোটো ছোটো। দরজায় ভারি পর্দা আর জানালায় লোহার মজবুত জাল। বাইরের লোকের চোখ এবং মুক্ত বাতাস যাতে বাড়ির ভেতর না পৌঁছুতে পারে তার সব ব্যবস্থাই পাকাপাকিভাবে করা হয়েছে। হাজার বছরের গোঁড়ামি এবং সংস্কারের শিকড় এ বাড়ির ভিতের তলায় বহুদূর ছড়িয়ে আছে।

'মিশ্র নিকেত'-এর ভেতরটা সব সময় আবছা আবছা। এমন কি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে রোদে যখন প্রচণ্ড তেজ তখনো এ বাড়ি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন, অন্ধকার।

চার জেনারেশন আগে এই বাড়িটা ঠিক এই মডেলে তৈরি করিয়েছিলেন চতুরনাথ মিশ্র। গোঁড়ামির ছাঁচে ঢেলে তিনি যে জীবনযাত্রার প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়ে গেছেন, পরের জেনারেশনের বংশধরেরা একান্ত নিষ্ঠায় তা চালু রেখেছে, এতটুকু হেরফের হতে দেয়নি।

মিশ্রদের এখন যিনি প্রধান পুরুষ সেই মুকুটনাথ মিশ্রকে হয়ত কিছুটা লিবারেল বলা যায়। তিনি অচ্ছুতদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেন, দৈবাৎ তাদের ছায়া মাড়িয়ে আগের আগের জেনারেশনের মতো দশ বার নাহানা ক'রে নিজের দেহ শুধ্ (শুদ্ধ) করার কথা ভাবেন না। এই সামান্য পরিবর্তনটা হয়ত দিনকাল বদলে যাবার কারণে। যতই পূর্বপুরুষেরা স্টিলের ফ্রেমে জীবনযাত্রার মডেল বাঁধিয়ে দিয়ে যান না, সময় তলায় তলায় সবার অজান্তে নিজের কাজ করে যায়। তবুও লিবারেল মুকুটনাথ দরজা-জানলা ভেঙে সেগুলো বড়ো করে

বাইরের আলো-হাওয়া বইয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেন না। আবহমান ট্রাডিশান ভাঙার শক্তি সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর নেই। সুদীর্ঘ কালের প্রাচীন সংস্কার লক্ষ কোটি জীবাণু হয়ে তাঁর রক্তে ছড়িয়ে আছে। কাজেই দরজায় পুরু পর্দা, জানালায় লোহার জাল নির্বিঘ্নেই বজায় আছে।

এক সময় কিরণদের গাড়িটা 'মিশ্র নিকেত'-এর গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে থামে। গাড়িতে বসেই বাড়ির সামনের দিকের পরিবর্তনটা দেখতে পায় কিরণ। বছরখানেক বাদে সে ধরমপুরায় এল। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে। গরু-মোষের 'শেড'গুলো নেই। ওধারে শিব মন্দির উঠেছে, পুকুর বানানো হয়েছে। সে বেশ অবাকই হয়।

খুবলাল সহায় গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। ঘুরে এসে কিরণের দিকের দরজা খুলে দিয়ে নরম গলায় বলে, 'নামো বেটা—' তারপর গলা চড়িয়ে নৌকরদের ডাকাডাকি শুরু করে, 'এ ভলুয়া, এ ঘনিরাম, সামান লে যা।' এ বাড়ির কাজের লোকেদের সবাইকেই চেনে সে।

কিরণ নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নামে। তখনই দেখতে পায়, খানিকটা দূরে শিব মন্দিরের সামনের উঁচু চাতালে বসে আছেন তাদের কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ এবং তার মা রেবতী। কাছাকাছি একটা বড়ো পেতলের পরাতে প্রচুর ফুল নিয়ে বসেছে মায়ের খাস নৌকরানী কোয়েরি। এধারে ওধারে দু'চারটে নৌকর ভীষণ ব্যস্তভাবে বাড়িঘর ধোয়ামোছা করছে।

কিরণকে দেখে যে যার কাজ থামিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

ওধার থেকে বশিষ্ঠনারায়ণ ডাকেন, 'এখানে এস বেটা।'

চুপচাপ মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায় কিরণ, তার পাশে খুবলাল।

বশিষ্ঠনারায়ণের বয়স সত্তর বাহাত্তর। গোলগাল মাঝারি চেহারা, গায়ের রং টকটকে। ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল, পেছনে এক গোছা ধবধবে মোটা টিকি। নিয়মিত তিনটি বেলা বিপুল পরিমাণে দুধ এবং ঘি তিনি খেয়ে থাকেন। ফলে তাঁর মসৃণ নিভাঁজ চামড়া থেকে সর্বক্ষণ যেন মাখন গড়িয়ে পড়ছে। দু'চোখ স্নেহে ভেজা। মুখে অপার প্রশান্তির একটি হাসি লেগেই আছে।

বশিষ্ঠনারায়ণের পরনে ফিনফিনে সাদা থান এবং উড়নি। উড়নিটা এতই মিহি যে ভেতরে পৈতের গোছা দেখা যাচ্ছে।

আগে আগে কিরণের মনে হ'ত, পবিত্র ব্রাহ্মণের চেহারার মডেলটি এরকমই হওয়া উচিত।

রেবতীর বয়স পঞ্চাশের মতো। নরম ধাঁচের ছোটোখাটো চেহারা তাঁর। এই বয়সেও শরীরে মেদ-টেদ তেমন জমেনি। গায়ের রং কালোই বলা যায়, তবে মুখটি ভারি সুন্দর। পানপাতার মতো গড়ন, সরু চিবুক, ভাসা ভাসা বড়ো চোখ, পাতলা ঠোঁট। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে কোঁচকানো কোঁচকানো ঘন চুলের ঘের। সিঁথির দু'পাশে কিছু কিছু চুল সাদা হতে শুরু করেছে।

এ অঞ্চলের বিশেষ একটি স্টাইলে একটা রঙচঙে শাড়ি ফেরতা দিয়ে পরেছেন রেবতী। রঙিন জমকালো কাপড় চোপড় তাঁর খুব পছন্দ। দু'হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি এবং মোটা কাংনা, নাকে হীরের নাকফুল, গলায় মটরদানা হার, কোমরে চাঁদির চওড়া বিছে। বিছের সঙ্গে বাঁধা চাবির থোকা।

কিরণ জানে, এই কোমল ধাঁচের মহিলাটির মধ্যে কোথায় যেন অলৌকিক দৃঢ়তা আছে।

রেবতী স্থির চোখে কিরণকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ, তাকানোর ভঙ্গিতে অদ্ভুত কাঠিন্য। অন্যান্য বার দিল্লি থেকে বাড়ি এলেই মা ছুটে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতেন, স্নিগ্ধ মুখে কত কথা যে বলতেন। কিরণের শরীর কেমন আছে, দিল্লিতে সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করত কিনা, বন্ধুদের খবর কী—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঁচ মিনিটে সব কিছু জেনে নিতেন। এবার উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই, রেবতীর মুখ চোখ একেবারে অন্যরকম—রুক্ষ, কর্কশ, আবেগশূন্য।

কিরণ বুঝতে পারে মা তার ব্যাপারটা জেনে গেছেন। কিন্তু এই জানাটা কতদূর পর্যন্ত, সেটাই ধরা যাচ্ছে না। ফলে অচেনা সংশয় তার বুকের ভেতর প্রবল চাপ তৈরি করতে থাকে।

এদিকে বশিষ্ঠনারায়ণ মধুর হেসে বলেন, 'বেটা, আগে শিউশংকরজির নয়া মন্দিরে পরণাম করে নাও। পরে অন্য কথা হবে।'

আরেকটু হলে উটকো ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে ফেলত কিরণ। সে যা বলতে যাচ্ছিল তা এইরকম। বাড়ির ছাদে কুলদেবী মহালছমীর ঘর থাকা সত্ত্বেও নতুন করে এক্সট্রা একটা শিবমন্দির তোলার উদ্দেশ্য কী? পাঁচ জেনারেশন ধরে পুজো চড়াবার পরও কি মহালছমী মিশ্র বংশের মনস্কাম পূর্ণ করতে পারেন নি? আরো ল্যাণ্ড আরো পুণ্য আরো দৌলতের জন্যই কি শিবকে বাড়িতে এনে বসানো হয়েছে? বলতে গিয়েও এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, মনে হ'তেই সামলে নিয়েছে কিরণ। কিন্তু একটা খটকা থেকেই যায়। শিবের পুজোয় সারপ্লাস পুণ্য

হয়ত হ'তে পারে কিন্তু তার যতদূর জানা আছে টাকা পয়সা প্রোপার্টি, জমিজমা— এসব শিবের এক্তিয়ারের বাইরে।

বশিষ্ঠনারায়ণ স্নিগ্ধ গলায় আবার বলেন, 'পরণামটা সেরে নাও বেটা।'

কিরণের খেয়াল হয়, সে দাঁড়িয়েই আছে। গুরু, ঈশ্বর, দেবদেবী, পুজো-পার্বণ, এ সব ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ নেই। তবে সে পুরনো ধর্মবিশ্বাস বা ট্রাডিশানকে ধ্বংস করার মতো প্রচণ্ড বিপ্লবীও না। কিরণ একজন নন-প্র্যাকটিসিং হিন্দু এবং সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কৃষ্ণ বিষ্ণু ব্রহ্মা কালী দুর্গা তৌহার-পরব, এসবও থাক এবং আমিও থাকি, এরকমই তার মনোভাব। দেবদেবীর মূরতের সামনে মাথা নোয়ানোটাকে সে খুব একটা লজ্জাকর কাজ বলে মনে করে না। আবার নোয়ালেই বাড়তি কিছু পুণ্য তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে, তা-ও ভাবে না। আসলে পাপপুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অঢেল সময় নেই তার।

সিঁড়ি ভেঙে চবুতরে উঠতে গিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে সেই ভ্রূণটার কথা হঠাৎ আবার মনে পড়ে যায় কিরণের, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। হাজার বছরের অদৃশ্য সংস্কার তাকে ওপরে উঠতে দেয় না, ক্রমাগত পেছনে টানতে থাকে। এ অবস্থায় শিবের মূরতের সামনে যেতে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করে।

সিঁড়ি দিয়ে ফের নামতে নামতে কিরণ বলে, 'গুরুজি, দু'রাত ট্রেনে এসেছি। জামা কাপড় নোংরা, বাসি। স্নান করে শিউশংকর আর আপনাকে প্রণাম করে যাব।'

একটু চিন্তা করে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ঠিক হ্যায় বেটা।' বলে মূল মন্দিরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, 'এই যে শিউশংকরজির মূরত দেখছ, ইনি বহুত মহত্ত্বপূর্ণ নীলকণ্ঠ শিব। অন্দর-বাহার শুধ্ হয়ে এঁকে পরণাম করাই ভালো।'

মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে সায় দেয় কিরণ।

বশিষ্ঠনারায়ণ আচমকা গভীর গলায় বলেন, 'ভগোয়ান শিউশংকরজি তোমাকে সৎ মতি দিন, সৎ পথ দেখান। সৎ কুলে তোমার জনম, এই কুল শিউশংকরজির কৃপায় সদা পবিত্র থাক। ওঁ শিবায় নমঃ।'

এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে থাকেন বশিষ্ঠনারায়ণ। হয়ত শিব প্রতিষ্ঠার কারণে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে। তাঁর কথায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচুর স্থানীয় দেহাতী 'বুলি'ও মিশে থাকে। বলার ভঙ্গিতে এবং কণ্ঠস্বরেও দেহাতী টান।

কিরণ চমকে ওঠে। বশিষ্ঠনারায়ণ এই যে সৎ পথ, সুমতি এবং মিশ্র বংশকে

পবিত্র রাখার কথা বললেন, সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। তার ব্যাপারটা কি বশিষ্ঠনারায়ণকে জানানো হয়েছে? ভেতরে ভেতরে নিজের অজান্তেই কুঁকড়ে যেতে থাকে কিরণ।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলতে থাকেন, 'অব, যাও বেটা। দো রাত ট্রেনে এসে বহুত 'থকে' গেছ। ঘরে গিয়ে আরাম করো।'

উত্তর না দিয়ে এবার রেবতীর দিকে তাকায় কিরণ। মা তার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি। খারাপ লাগছে তার। আস্তে ডাকে, 'মা—'

রেবতী তাকিয়েই ছিলেন। এক পলকের জন্যও মেয়ের দিক থেকে চোখ সরাননি। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

ভীরু গলায় কিরণ ফের বলে, 'মা, তোমার—'

তার কথা শেষ হবার আগেই রেবতী নীরস গম্ভীর গলায় প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতেই বলেন, 'ওপরে নিজের ঘরে যাও।'

বশিষ্ঠনারায়ণের মতো রেবতীর কথাতেও বিহারের গ্রাম্য টান। আসলে ধরমপুরাকে টাউন বলা হলেও দিল্লি বোম্বাই বা কলকাতার কাছে এটা কিছুই না। যদিও ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে, অনেকগুলো রাস্তা পিচ বাঁধানো, গণ্ডা গণ্ডা কংক্রিটের বিল্ডিং উঠেছে, তবু ওই সব শহরের তুলনায় ধরমপুরা একটা বড়ো মাপের গ্রামই। এখানে আজীবন থেকে শুধু রেবতীর কেন, পুরুষানুক্রমে 'মিশ্র নিকেত'-এর মানুষজনের চালচলন, কথাবার্তা, রাহান সাহান, সব কিছুতেই পাকা দেহাতী ছাপ পড়ে গেছে।

মায়ের কথায় দেহাতী ঢং নিয়ে কিরণের আদৌ দুশ্চিন্তা নেই, এটা ত সে আজন্মই শুনে আসছে। কিরণ অবাক হচ্ছিল অন্য কিছু ভেবে। রেবতী আগে আর কখনো এমন রূঢ়ভাবে, হুকুমের স্বরে কথা বলেছেন কি না, সে মনে করতে পারে না।

কিরণ আর দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে নিচে নেমে ঘাসের ফাঁকা জমিটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

চবুতরের সামনে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল খুবলাল। এবার সে রেবতীকে বলে, 'লেড়কিকে পোঁছে দিলাম, এবার বাড়ি যাই ভাবীজি, পরে আসব।'

রেবতী তাকে এখানেই স্নানটান করে খেয়ে যেতে বলেন।

খুবলাল বিনীতভাবে জানায়, তার বাড়িতে 'থোড়া কুছ' জরুরি কাজ আছে, স্নান-খাওয়ার জন্য এখানে থেকে গেলে অসুবিধা হবে।

রেবতী বলেন, 'তা হলে আর কী বলি, আপনা মকানেই যান। লেকেন সামকো জরুর আইয়েগা। সাসকে নিয়ে আপনাদের মিশ্‌রজি এর মধ্যে কাশী থেকে এসে যাবেন। দিল্লিতে গিয়ে কী করলেন, কিভাবে মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এলেন, কিছুই শোনা হ'ল না।'

'সন্ধ্যেবেলা এসে বলব।'

খুবলাল সহায় বাঁকানো শিরদাঁড়া নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে গেটের দিকে চলে যায়। এদিকে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বিশাল তেতলা বাড়িটার পাথরে বাঁধানো বারান্দায় উঠে আসে কিরণ। ওখান থেকেই দেখতে পায় ঘনিরাম আর ভলুয়া মোটরের ক্যারিয়ার থেকে তার স্যুটকেশ হোল্ডঅল এবং টুকিটাকি অন্য সব মালপত্র নামাচ্ছে।

আগে লক্ষ্য করেনি, এবার কিরণ দেখতে পায়, গোটা বাড়িটায় নতুন রং করা হয়েছে। দরজা জানালা এবং দেয়াল থেকে টাটকা রং-এর গন্ধ উঠে আসছে।

বারান্দার ডান পাশে ওপরে যাবার সিঁড়ি। একশ' বছর আগের সরু সরু ইট দিয়ে তৈরি ধাপগুলো আড়াই ফুট করে চওড়া।

দোতলায় উঠতে উঠতে কিরণ দেখতে পায়, নৌকর নৌকরানীরা প্রতিটি ঘর বারান্দা সিঁড়ি ধুয়ে মুছে ঘষে মেজে তকতকে করে তুলছে। এ বাড়িতে ঘর ত কম নয়, প্রায় ষাটটা। তা ছাড়া ডজন দুয়েক বারান্দা, অগুনতি সিঁড়ি, এক-তলার ঢালাও চাতাল—সব মিলিয়ে বিশাল ব্যাপার। কাজের লোকগুলো ঘেমে নেয়ে একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

ষাটটা ঘর দরকার হয় না কিরণদের। তাঁরা মানুষ তো মোটে পাঁচ জন। বাবা মা সুষ্‌মা ঠাকুমা এবং সে নিজে। অবশ্য দশ বারোটা নৌকর নৌকরানীও আছে।

একতলায় ছ'সাতটা ঘরে কাজের লোকেরা থাকে, দোতলায় এবং তেতলায় খান পাঁচেক ঘর নিয়ে কিরণরা। সে আর ঠাকুমা ক'দিনই বা এখানে থাকতে পারে! দশ বারো বছর ধরে বেশির ভাগ সময়টাই তার দিল্লিতে কাটছে, ছুটিছাটায় শুধু বাড়ি আসতে পারে। আর ঠাকুমা ক'বছর ধরে প্রায়ই গঙ্গাযাত্রা করতে যাচ্ছেন কাশী। তাদের দু'জনকে বাদ দিলে বাড়িতে সারাক্ষণ থাকে মোট তিন জন। তিনটি লোকের জন্য পাঁচটি ঘর আর নৌকরদের জন্য সাতটা, মোট বারো-খানা ঘর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। বাকি ঘরগুলো সারা বছর তালা বন্ধ থাকে। শুধু দশেরার আগের দিন একবার তালা খুলে সাফ-সুতরো করা হয়।

কিন্তু এই ফাল্গুন মাসে ত দশেরা হয় না। তা হ'লে আবহমান কালের নিয়ম ভেঙে এই অসময়ে আস্ত বাড়ি সাফাই করা হচ্ছে কেন? ব্যাপারটা রহস্য-ময় থেকে যায়।

দোতলায় উঠে আসে কিরণ। তারপর তেতলায় নিজের ঘরে।

ঘরটা প্রকাণ্ড। একধারে দেয়াল ঘেঁষে পুরনো আমলের মকরমুখি খাট। আর এক দেয়ালে আয়না-বসানো আলমারি, ড্রেসিং টেবল, বুককেস, পড়া-শোনার জন্য টেবল-চেয়ার, ডিভান, ইত্যাদি। এ ঘরের সব আসবাব দুষ্প্রাপ্য দামী বর্মা-টীকে তৈরি। সেগুলো ভারী ভারী, প্রাচীন। কাচের ওপর, আলমারি কিংবা খাটের পায়ায় এবং ছত্রিতে পুরনো নক্‌শা, পুরনো গন্ধ। এ বাড়ির আবহাওয়ায় এরকম আসবাব ছাড়া যেন মানায় না।

তবু এরই মধ্যে ছোটোখাটো তিনটি বিপ্লব ঘটিয়েছে কিরণ। প্রায় প্রতিবারই দিল্লি থেকে ফেরার সময় সে একটা করে মডার্ন পেইন্টিং-এর কপি বাঁধিয়ে এনে দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে। চার দেয়ালে এখন মডার্ন আর্টের মোট সাতটি নমুনা। এইসব বিদ্‌ঘুটে ছবির দিকে যাতে বেশি মন না যায়, তাই মুকুটনাথ এবং রেবতী পলকা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো লছমী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু এবং গণপতির ধ্যাব্‌ড়া ক'টা ছবি ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়েছেন।

ছবি ছাড়া অন্য দু'টি বিপ্লব এইরকম। কার্পেট এনে মেঝেতে বিছিয়েছে কিরণ আর জোর করে ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্‌ বাথরুম করিয়ে নিয়েছে।

কার্পেটটা নিয়ে বিশেষ আপত্তি হয়নি কারো। কিন্তু অ্যাটাচ্‌ড বাথ এবং কমোড নিয়ে মিশ্র বংশ একেবারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। যে বাড়ির মাথায় কুলদেবী মহালছমীর মন্দির, তারই আঠারো ফুট তলায় কমোডের মতো 'গন্ধা' নোংরা বস্তু বসানো হ'লে সে মন্দিরের পবিত্রতা যে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে এ বিষয়ে ঠাকুমা থেকে সুষ্‌মা পর্যন্ত সবাই ছিল একমত।

'মিশ্র নিকেত'-এ কি তাই বলে বাথরুম বা পায়খানা-টায়খানার মতো অশুদ্ধ নারকীয় ব্যাপার নেই? নিশ্চয়ই আছে। সেগুলো রয়েছে মূল তেতলা বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে পেছন দিকের ফুল ফল সবজি বাগানের ওপাশে। পাঁচ জেনারেশন ধরে তাতেই দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে।

কুলদেবীর ঘরের পবিত্রতা নিয়ে অনেক বোঝানো হয়েছিল কিরণকে কিন্তু টলানো যায়নি। সে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একাই চার জনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত মুকুটনাথকে মেয়ের জেদের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে। তবে তার মধ্যেও রয়েছে সেই সূক্ষ্ম দূরপ্রসারী পরিকল্পনা। অর্থাৎ যে ছক অনুযায়ী কিরণকে দিল্লিতে চৌকস সোসিয়েলাইট করতে পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথ, কমোড বা কার্পেটের কিছু সম্পর্ক আছে।

ঘরের সব কিছুই ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন। এমন কি বিছানাটা পর্যন্ত নিখুঁত পেতে রাখা হয়েছে। নকৃশা-করা রাজস্থানী বেডশীটে সামান্য ভাঁজ পর্যন্ত নেই। কিরণের জন্যই যে ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট ক'রে রাখা হয়েছে, সেটা এখানে পা দিলেই টের পাওয়া যায়। অন্য সময় হ'লে ঘরের পরিপাটি চেহারা দেখে খুশিই হ'ত কিরণ। মেঝেতে ধুলো ময়লা, দেয়ালে ঝুল, নোংরা কোঁচকানো বিছানা, এসব দেখলে তার মাথা গরম হ'য়ে যায়।

কোনো দিকে না তাকিয়ে কিরণ সোজা বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। মাথার দিকের জানালায় যে লোহার জাল রয়েছে তার ভেতর দিয়ে জালি-কাটা আকাশ চোখে পড়ে। সূর্যটা এতক্ষণে আরো একটু ওপরে উঠে এসেছে, রোদের তাপ হয়ত সামান্য বেড়েছে কিন্তু তিন ফুট পুরু দেয়াল দিয়ে ঘেরা এই ছায়াচ্ছন্ন ঘরে তা একেবারেই বোঝা যায় না। অন্যমনস্কর মতো সেদিকে তাকিয়ে কিরণ হঠাৎ খুব বিপন্ন বোধ করে। অদম্য সাহস এবং জেদ নিয়েই সে এবার 'মিশ্র নিকেত'-এ ফিরেছে। কিন্তু মায়ের চেহারা দেখে মনে হয়েছে, এ বাড়ির একটি মানুষও তার পক্ষে আঙুল তুলবে না। বাবা এবং ঠাকুমা ফিরে আসার পর কী ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তখন নিজের জেদ কতটা বজায় রাখতে পারবে, এ সব সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণাই সে করতে পারছে না।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিরণ আবছাভাবে টের পায় ভলুয়া এবং ঘনিরাম তার স্যুটকেশ-টুটকেশ দিয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে কার ডাকে সামান্য চমকে মুখ ফেরায় কিরণ। দরজার কাছে সাগিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

সাগিয়ার বয়স আঠারো উনিশ। সতেজ আগাছার মতো পুষ্ট চেহারা তার। গোটা শরীরে অঢেল স্বাস্থ্য। গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, চাপা চোখ, মাথাভর্তি রুক্ষ তেলহীন জট-পাকানো চুল। হাত পায়ের হাড় মোটা মোটা। দেখেই টের পাওয়া যায় এই মজবুত গড়নের মেয়েটার দেহে প্রচুর শক্তি জমা রয়েছে। তবে চোখে এবং ঠোঁটে সর্বক্ষণ সরল নিষ্পাপ হাসি লেগেই আছে।

সাগিয়ার গায়ে লাল জামা। শাড়িটা দেহাতী ঢং-এ পায়ের গোছ পর্যন্ত তুলে

পরেছে। নাকে ঝুটো পাথর-বসানো চাঁদির নাকফুল, দু'হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি।

সাগিয়া কিরণের খাস নৌকরানী। দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরলেই সারাক্ষণ সে তার সঙ্গে ছায়ার মতো আটকে থাকে। কিরণের মুখ থেকে কিছু একটা হুকুম বেরুনো মাত্র সে ছুটে যায়। কিরণকে খুশি করতে এটা করছে, সেটা করছে। সর্বক্ষণ তার জন্য মেয়েটা তটস্থ।

ভয়ে ভয়ে সাগিয়া জানতে চায়, ভেতরে ঢুকবে কিনা। কেননা তার জামা-কাপড় নোংরা, শাড়ির নিচের দিকটা ময়লা জলে ভেজা, গালে কপালে চুলে সাবানের ফেনা। সে জানে, অপরিচ্ছন্নতা একেবারেই পছন্দ করে না কিরণ। ভয়টা সেই কারণেই।

সাগিয়ার ভীরুতার মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষী রয়েছে। এই কারণে মেয়েটাকে ভালো লাগে কিরণের। আস্তে হাত নেড়ে বলে, 'আয়।'

আলতো করে পা ফেলে ফেলে, যেন চারপাশের ছোঁয়া বাঁচাতেই ঘরে ঢুকে জড়সড় হয়ে এক ধারে দাঁড়ায় সাগিয়া। বলে, 'কাপড়া সাফ করছিলাম। ওহী লিয়ে—' বলেই থেমে যায়। অর্থাৎ কাপড়-চোপড় কাচছিল বলে নোংরা সাবান জল তার গায়ে লেগেছে, এটাই বোঝাতে চায় সাগিয়া। এজন্য কিরণের যেন 'গুস্‌সা' না হয়। আসলে কিরণ যখন ধরমপুরায় থাকে না তখন সাগিয়াকে অন্য নৌকর নৌকরানীদের সঙ্গে বাড়ির নানা ধরনের প্রচুর কাজ করতে হয়। তখন কিরণের পছন্দমতো তার পক্ষে ফিটফাট থাকা সম্ভব না। কিরণ এসে গেছে, এখন আর সব 'গন্ধা কাম' থেকে তার পুরোপুরি ছুটি। ক্ষারে কাচা পরিষ্কার শাড়ি জামা পরে, পিঠে বিনুনি ঝুলিয়ে এবার সে কিরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে পারবে।

কিরণ বলে, 'ঠিক আছে।' বলেই লক্ষ্য করে, সাগিয়া পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠিক এইভাবেই রেবতীও কিছুক্ষণ আগে তাকে দেখছিলেন। তবে কি নৌকর নৌকরানীদের মধ্যেও তার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে? ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায় কিরণ। একবার ভাবে, এ নিয়ে সাগিয়াকে কিছু জিজ্ঞেস করবে কী না। কিন্তু পেটের ভেতরকার ভ্রূণটা সম্পর্কে একটি নৌকরানীর সঙ্গে কথা বলতে তার রুচিতে আটকায়।

কিরণের কখন কী দরকার সব জানে সাগিয়া। চোখ না সরিয়েই সে বলে, 'তুমি আসবে বলে ঘর সাফ ক'রে বিস্তারা পেতে রেখেছি।'

এতক্ষণে ঘরটার দিকে ভাল ক'রে তাকায় কিরণ এবং মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও খুশিই হয়।

সাগিয়া ফের বলে, 'নাহানা-ঘরে খুশবুও ছড়িয়ে দিয়েছি।'

খুশবু অর্থাৎ আতর। স্নানের ঘরে আতরের সুগন্ধ কিরণের খুব পছন্দ। ভেতরকার অস্বাচ্ছন্দ্য এবং চাপটা কাটাবার জন্য সে মজার গলায় বলে, 'ফাইন, ফাইন। তোর তুলনা নেই সাগিয়া।'

সাগিয়া ইংরেজি জানে না, নেহাতই আনপড়। তবে কিরণ যে তারিফ করছে, এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে হাসে, খুশিতে তার চোখ চিকচিক করতে থাকে।

ভয়টা কেটে গিয়েছিল। সাগিয়া এবার বলে, 'টিরেনে রাত জেগে এসেছ। নাহানা করবে ত?'

কিরণ মাথা হেলিয়ে দেয়—করবে।

সাগিয়া বলে, 'গরম পানি নিয়ে আসব?'

'এখন না, পরে। আগে তুই নিজে নাহানা সেরে ভাল শাড়ি-টাড়ি পরে আমার জন্যে কফি ক'রে নিয়ে আয়।' ঘনিরামরা যে মালপত্র নামিয়ে রেখে গিয়েছিল সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে একটা বাস্কেট দেখিয়ে দেয়, 'ওটার ভেতর কফির প্যাকেট আছে। নাহানা সেরে নিয়ে যাবি।'

এ বাড়িতে কিরণ ছাড়া আর কেউ কফি খায় না। এই অভ্যাসটা তার হয়েছে দিল্লিতে গিয়ে। চিনি-দুধ ছাড়া কড়া ব্ল্যাক কফি তার পছন্দ। বাড়িতে চালু নেই বলে তার জন্য কফি এনে রাখার কথা কারো মনে থাকে না। তাই দিল্লি থেকে প্রতিবারই দু-তিনটে কফির প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসে কিরণ।

সাগিয়া চলে গেল। কিছুক্ষণ পর স্নান-টান সেরে ফিটফাট হয়ে আবার এসে কফির প্যাকেট নিয়ে যায়। দশ মিনিট বাদে তৃতীয় বার যখন আসে, তার হাতে জাগের মতো লম্বাটে কাপে ভর্তি ব্ল্যাক কফি।

কাপটা কিরণের হাতে দিয়ে সাগিয়া জানতে চায়, এবার সে কী করবে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কিরণ বলে, 'কিছু করতে হবে না। এখন আমি একটু ঘুমুবো। তুই বাইরে থাক। দু'ঘণ্টা পর ডেকে দিবি।'

সাগিয়া ঘড়ি দেখতে জানে, কিরণই তাকে এটা শিখিয়েছে। সে বাইরে বেরিয়ে যায়, কিন্তু কিরণের ঘুমনো আর হয় না। কফিটা অর্ধেকও শেষ হয়নি, সুষমা হঠাৎ এ ঘরে ঢুকে সোজা কিরণের সামনে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়।

সুষ্‌মার বয়স উনিশ কুড়ি। চোঙার মতো বেঢপ মাথায় লালচে পাতলা চুল। সেই চুল দু' ভাগে বিনুনি ক'রে কাঁধের দু' পাশ থেকে সামনের দিকে এনে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। ছোটো ছোটো গোল চোখ দুটোতে ধূর্ত হিংসুটে চাউনি। পুরু ঠোঁট সুষ্‌মার, হনু বেশ খাড়া। সারা গায়ে লাবণ্য বা লালিত্য বলতে কিচ্ছু নেই। হাত-পা কাঠ কাঠ, গাঁট-পাকানো।

স্থানীয় ঢংয়ে ফেরতা দিয়ে জমকালো দামী শাড়ি পরেছে সুষ্‌মা। কপালে সবুজ রংয়ের বড়ো টিপ। হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, আঙুলে কম করে চার পাঁচটা আংটি, নাকের পাটায় হীরের নাকফুল, কানে করণফুল, গলায় চওড়া সোনার হার, পায়ের আঙুলে রুপোর চুটকি। এভাবে সারাক্ষণ প্রচুর সোনা চাঁদি গায়ে চড়িয়ে জবড়জং হয়ে থাকতে ভালোবাসে সুষ্‌মা। পোশাক সাজ-গোজ বা চেহারা, এ সব দেখে কে বলবে কিরণের আপন বোন! কে বলবে, একই পুরুষের বীজে উৎপন্ন হয়ে একই নারীর গর্ভ থেকে তারা পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

নিজের এই বোনটিকে আজন্ম দেখে আসছে কিরণ, সুষ্‌মার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তার চেনা। এমন সন্দিগ্ধ, ঈর্ষাকাতর, কুচুটে ধরনের মেয়ে আর একটিও চোখে পড়েনি কিরণের। সর্বক্ষণ অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, দিনরাত অন্যের খুঁত ধরে বেড়াচ্ছে। যা কিছু ভালো, সুন্দর বা মহৎ, সে সব আদৌ পছন্দ করে না। উদারতা, মাধুর্য, কোমলতা—এই সব বস্তু তার হাজার মাইলের মধ্যেও নেই।

এই পৃথিবীতে কিরণকে সব চাইতে বেশি ঘৃণা করে সুষ্‌মা। বড়ো বোনকে নিজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীও ভাবে। তার প্রতি সুষ্‌মার চরম বিদ্বেষ—কিরণের কাছে এটা অজানা নয়।

সুষ্‌মার ঈর্ষা বা বিদ্বেষের পেছনে সলিড কিছু কারণ আছে। সেগুলো এতই স্পষ্ট যে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না। প্রথমত, রূপের কথাই ধরা যাক। তারা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে, অনিবার্য নিয়মেই কিরণের টানটান চেহারা, ডিমের কুসুমের মতো ত্বক, সোনার ফুলদানির মতো গ্রীবা, তার ব্যক্তিত্ব বা পোশাকরুচি চুম্বকের মতো অন্যের চোখ টানতে থাকে। কিন্তু সুষ্‌মার শরীরে এতই খুঁত, নারীসুলভ কমনীয়তার এমনই ঘাটতি যে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

তা ছাড়া যে কারণটা সব চাইতে মারাত্মক তা এইরকম। কিরণের সাত বছর বয়সেই এ অঞ্চলের এম. এল. এ এবং জবরদস্ত পোলিটিক্যাল লিডার ত্রিকূটনারায়ণ

দুবে তাকে পুতহু হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নিখুঁত একটি ছক কেটে সোসিয়েলাইট বানাবার জন্য তাকে দিল্লি পাঠিয়েছেন। অথচ উনিশটা বছর পার হ'লেও এখন পর্যন্ত সুষ্‌মাকে কেউ পুতহু করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবে না। অবশ্য মুকুটনাথ যে ধরনের জাঁদরেল জমিমালিক তাতে সুষ্‌মাকে কুঁয়ারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে না। নিশ্চয়ই তিনি ছোটো মেয়ের জন্য দামাদ যোগাড় করে ফেলবেন। তবে স্বাভাবিকভাবে মিশ্র বংশের সমান লেভেলের ঠাটবাটওলা কুলীন ঘরে মেয়ে দিতে হ'লে কম করে দু' আড়াই শ' বিঘে জমি দহেজ দিতে হবে। খিঁচটা এখানেই। মিশ্র বংশ কয়েক জেনারেশন ধরে যে প্রোপার্টি বাড়িয়ে প্রায় একটা বিশাল রাজত্ব গড়ে তুলেছে তার থেকে এতটা জমি চলে যাওয়া কাজের কথা নয়, এবং এ ব্যাপারে মুকুটনাথের প্রচণ্ড আপত্তি। তাই একটি গরীব ঘরের লেখাপড়া জানা অনুগত নম্র স্বভাবের ছেলের খোঁজে চারিদিকে লোক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, ছোট দামাদকে তিনি ঘরজামাই হিসেবে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবেন। তাতে অনেকটা জমি অন্তত রক্ষা পাবে।

যে মেয়ে বংশের মর্যাদা বাড়াতে পারবে না, উলটে যার কারণে সম্পত্তি হানির প্রবল সম্ভাবনা, তাকে মুকুটনাথের মতো জমিমালিক খুব একটা ভালো চোখে যে দেখবেন না সেটা বোঝাই যায়। তবে জন্মদাতা হিসেবে নিজের দায়িত্ব তিনি আদৌ উপেক্ষা করেননি। বংশের প্রথা অনুযায়ী থুথ্‌ড়ে বুড়ো মাস্টারজি রেখে বাড়িতেই কাজ চালানোর মতো লেখাপড়া শিখিয়েছেন সুষ্‌মাকে।

সুষ্‌মার জন্য প্রোপার্টি হাতছাড়া হবে আর বিনা যৌতুকেই কি কিরণের বিয়েটা হয়ে যাবে? না, ঠিক তা নয়। তবে একটি সুন্দরী নিখুঁত সোসিয়েলাইটকে পুত্রবধূ করতে পারলে ত্রিকূটনারায়ণ যে দহেজ নিয়ে খুব একটা দড়ি টানাটানি করবেন না, এ ব্যাপারে মুকুটনাথ পুরোপুরি নিশ্চিত। তিনি যা দেবেন তাতেই খুশি থাকবেন ত্রিকূটনারায়ণ।

মা-বাপের চোখে সব ছেলেমেয়েই নাকি সমান। কিন্তু কিরণ সম্পর্কে মুকুটনাথের যে পক্ষপাতিত্ব আছে সেটা পরিষ্কার টের পাওয়া যায়।

সাত বছর বয়সেই, অযাচিতভাবে অঢেল সুখ, কনভেণ্টে পড়ার সুযোগ, পর্যাপ্ত স্বাধীনতা, বিখ্যাত শ্বশুরবাড়ির পুতহু হবার সৌভাগ্য, সব কিরণের হাতের ভেতর চলে এসেছে। সুষ্‌মার ধারণা এবং বিশ্বাস, প্রতি মুহূর্তে কিরণ তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। যা কিছু তার প্রাপ্য, পৃথিবীর

যাবতীয় সুখ আনন্দ এবং কাম্য ভবিষ্যৎ—সব প্রবল শক্তিতে সে ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই সব কারণে সুষ্‌মার বুকের ভেতরটা ঘৃণায় ঈর্ষায় হিংসায় বিষাক্ত হয়ে থাকে।

সুষ্‌মাকে দেখলেই অস্বস্তি হয় কিরণের। ছোটো বোনকে রীতিমত ভয়ই করে সে। তবু হেসে হেসে বলে, 'কেমন আছিস মুনিয়া—' সুষ্‌মার ডাকনাম মুনিয়া।

সুষ্‌মার কণ্ঠস্বর খুবই কর্কশ। খ্যাসখেসে গলায় সে বলে, 'বহুত বুরা। তোর জন্যে আমাদের ভালো থাকার উপায় আছে!'

কিরণ চমকে ওঠে। এ বাড়ির সবাই যেন তার জন্য অস্ত্র শানিয়ে বসে আছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'তোদের খারাপ থাকার মতো আমি কী এমন করেছি!' বলে ভয়ে ভয়ে চোখের কোণ দিয়ে সুষ্‌মাকে লক্ষ্য করতে থাকে।

'জানিস না কী করেছিস! বেশরম শাঁখরেল।'

বুকের ধুকপুকনি পলকের জন্য থমকে যায় কিরণের। তবে কি বাড়ির সবাই ভ্রূণটার খবর পেয়ে গেছে? শ্বাসরুদ্ধের মতো সুষ্‌মার দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

সুষ্‌মা বলে, 'মিশ্‌র বংশের মুখে তুই কালি দিয়েছিস। ধরমপুরার লোক তোর গায়ে থুক্‌ দেবে।

কিরণ জানে, সুষ্‌মার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির আশা নেই। তার সম্পর্কে মায়ের মনোভাবও সে জেনে গেছে। এ বাড়ির সর্বশক্তিমান ডিকটেটর মুকুটনাথের প্রতিক্রিয়া কী হ'তে পারে, সে ব্যাপারেও তার স্পষ্ট ধারণা আছে। তবে খুবলালকে পাঠিয়ে এভাবে তাকে ধরমপুরায় নিয়ে আসার পেছনে মুকুটনাথের কী কূট উদ্দেশ্য রয়েছে কিংবা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন করে তিনি কী ভেবেছেন, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ তা জানা দরকার।

স্নায়ুগুলোকে টান টান রেখে, খুব সতর্কভাবে কিরণ বলে, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, হাত দুটো প্রবল বেগে নাড়তে নাড়তে ভেংচে ওঠে সুষ্‌মা, 'ও হো হো হো—অন্যায় করিনি! একেবারে শুধ্‌ গঙ্গাপানি! লাখ লাখ রুপাইয়া খরচ করে কেন তোকে দিল্লি পাঠিয়েছে! কিস লিয়ে—অ্যাঁ, কিস লিয়ে?'

সুষ্‌মার আক্রমণটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে, বুঝতে পারে না কিরণ।

হঠাৎ বুকের ভেতর কাঁপুনির চোরা স্রোত টের পায়। কিছুটা শিথিল গলায় বলে, 'কিসের জন্যে আবার, লেখাপড়া শিখতে।'

আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে সুষ্‌মা 'ঝুট।' চেঁচালে তার গলার শিরাগুলো দড়ির মতো জট পাকিয়ে ফুটে বেরোয়।

হাতের কাছে উপযুক্ত একটি উত্তর খুঁজে পায় না কিরণ। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

সুষ্‌মা বিষাক্ত গলায় বলে যায়, 'তুই দিল্লি গেছিস ভাঁদো মাসের কুত্তীর মতো ছোকরাদের পেছন পেছন চক্কর মারতে।'

গলার স্বর সামান্য তুলে কিরণ বলে, 'কে বলেছে এ সব ? কে ? কে ?'

'কে আবার বলবে ! তোদের বড়ী মাস্টারনী বাপুজিকে চিট্‌ঠি লিখে সব জানিয়েছে।'

বড়ী মাস্টারনী অর্থাৎ তাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি যে মুকুটনাথকে চিঠি লিখেছেন, কিরণের জানা ছিল না। তার হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা পলকের জন্য থমকে গিয়েই আবার চলতে শুরু করে। ভীরু গলায় সে জিজ্ঞেস করে, 'কী লিখেছেন আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ?'

দু'হাত নাচিয়ে নাচিয়ে কোমরটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে নানারকম জঘন্য ভঙ্গি করতে করতে সুষ্‌মা বলে, 'তোর পাংখ্‌ গজিয়েছে, দিল্লিতে বহোত উড়ছিলি।'

সুষ্‌মা ঠিক কী বলতে চায়, বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রিন্সিপ্যালের চিঠিতে যে মারাত্মক কিছু অভিযোগ আছে এবং সেই কারণেই যে মুকুটনাথ তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন, সেটা আন্দাজ করা যায়। উত্তর না দিয়ে সে সুষ্‌মাকে দেখতে থাকে।

সুষ্‌মা শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝোঁকে, কিরণের মুখের কাছে বাঁ হাতটা এনে আঙুলে অদ্ভুত মুদ্রা ফুটিয়ে বলে, 'সমঝি নেহী ?'

কিরণ এবারও চুপ।

সুষ্‌মা বলতে থাকে, 'প্যার মোহব্বত—সমঝি ? চুটিয়ে প্যার করছিলি। বেশরম চুহিয়া।'

এ বাড়ির আবহাওয়ায় পুরুষানুক্রমে গোঁড়ামি এবং সংস্কারের যত অদৃশ্য ভাইরাস থিক থিক করছে তার প্রায় সবগুলোই সুষ্‌মার রক্তে এবং মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। মিশ্র বংশের অন্য সবার মতোই তার কাছে কুঁয়ারী মেয়ের প্রেম-ভালবাসা একেবারেই নিষিদ্ধ বস্তু, নিচু স্তরের পাপাচরণের মতো অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

উনিশ বছরের এই মেয়েটার মধ্যে একশ' বছরের জীর্ণ অসহিষ্ণু প্রাচীন একটি স্পিরিট শেকড় গেড়ে বসেছে।

সুষ্‌মার দিকে তাকিয়েই থাকে কিরণ, কিছু বলে না।

সুষ্‌মা থামেনি, সে একটানা বলেই যায়, 'বাবুজি বনারস যাবার আগে কী বলে গেছে জানিস?'

'কী?' এতক্ষণে গলায় স্বর ফোটে কিরণের।

'ফিরে এসে তোর পাংখ্‌ দুটো আগে ছেঁটে দেবে। তারপর পাক্কীর ধারে যে নহরটা আছে তাতে তোকে পুঁতে ফেলবে। বাবুজি বলেছে মিশ্‌র বংশে তোর মতো লেড়কির জরুরত নেই—সমঝি?'

জোরে শ্বাস টানে কিরণ। যতটা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় প্রিন্সিপ্যাল ছেলেদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ব্যাপারে মুকুটনাথকে কিছু লিখে থাকতে পারেন। তবে ভ্রূণটার বিষয়ে অবশ্যই কিছু জানাননি। কেননা এটা এখন পর্যন্ত এতই গোপন যে প্রভাকর এবং সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঘুণাক্ষরেও প্রিন্সিপ্যাল টের পেলে, এতদিনে সারা দিল্লি তোলপাড় করে ফেলতেন। আর মুকুটনাথ জানতে পারলে নিশ্চয়ই মাকে আনতে কাশী যেতেন না, খুবলালকে না পাঠিয়ে তিনিই স্বয়ং দিল্লি ছুটতেন। মাকে বিফল গঙ্গাযাত্রা থেকে ফিরিয়ে আনার চাইতে মেয়ের বংশধারা-বিরোধী কেলেংকারি ঠেকানোটা অনেক বেশি জরুরি।

ভ্রূণটা সম্পর্কে বাড়িতে যে জানাজানি হয়নি, এ নিয়ে আর সংশয় নেই। তা হলে এতক্ষণে সুষ্‌মা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ির ভিত নাড়িয়ে দিত। ওর পেটে কোনো কথা দশ সেকেণ্ডের বেশি থাকে না।

সুষ্‌মা বলে, 'আমি যাচ্ছি। বাবুজি ফিরে আসুক, তখন মজা দেখতে আবার আসব।'

ডানা ছেঁটে নহরের পাঁকে কিরণকে পুঁতে ফেলার অত্যন্ত দরকারি খবরটি দিয়ে সুষ্‌মা চলে যায়।

তিন

কিরণকে ঘিরে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ পনেরো বছর আগে যে সুদূরপ্রসারী চতুর পরিকল্পনাটি করেছিলেন—তা এইরকম।

ত্রিকূটনারায়ণ দুবে বা দ্বিবেদীরাও মুকুটনাথদের মতোই পুরুষানুক্রমে বিরাট জমিমালিক। গোলগোলি তালুকের বর্ডারে যে বেঁটেখাটো পাহাড়ের রেঞ্জটা রয়েছে তার ওধারের যাবতীয় জমিজমা দ্বিবেদীদের। মিশ্রদের মতো দ্বিবেদীরাও পুরনো ল্যাণ্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। তবে জমি দখল এবং জেনারেশনের পর জেনারেশন সে সব বাড়িয়ে চলার পদ্ধতি দুই বংশের দু' রকম। অবশ্য বিপুল ল্যাণ্ড প্রোপার্টি রক্ষণাবেক্ষণের কৌশল বা প্রক্রিয়া কিন্তু একই ধরনের। ত্রিকূটনারায়ণরা থাকেনও পাহাড়ের ওপারের ছোটো টাউন কামতিগঞ্জে।

মিশ্রদের সমস্ত জমিজমা বিয়ের দৌলতে। এই বংশে এক একটি পুতহু এসেছে, তাদের সঙ্গে যৌতুক হিসেবে এসেছে দেড় দু'শ বিঘে করে জমি। কিন্তু দ্বিবেদীদের জমি বেড়েছে লাঠি আর বন্দুকের দাপটে এবং হাজারটা কূটকৌশলে। কখনও গায়ের জোরে গরীব আনপড় অচ্ছুতদের জমি তারা কেড়ে নিয়েছে, কখনও মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে কিংবা চড়া সুদের দায়ে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রোপার্টি বাড়ানো যেমন বিরাট ব্যাপার, তেমনি সে সব দখলে রাখা তার চাইতেও অনেক বড়ো সমস্যা। এতদিন ভালোই চলছিল, কিন্তু 'জমিন্দারি অ্যাবোলিসান বিল' পাশ হয়ে যাবার পর প্রবলেমটা প্রথম দিকে বেশ ঘোরালোই মনে হয়েছিল। বড়ো জমিমালিকদের চোখ থেকে রীতিমত ঘুম ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক দিনের জন্য।

দিল্লির লোকসভায় জমিজমা নিয়ে কবে কখন কী আইন পাশ হ'ল সে খবর ধরমপুরা এবং কামতিগঞ্জের চারপাশের গরীবের চাইতেও গরীব, হাভাতে, আনপড়েরা রাখে না এবং সে সব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু যাদের অঢেল জমি, অজস্র সোনা চাঁদি, টাকাপয়সা এবং জমিজমার কারণে মর্যাদা, আভিজাত্য এবং প্রচণ্ড ক্ষমতা, তাদের সমস্ত খবরই রাখতে হয়। বিশেষ করে দেশে জমি সংক্রান্ত কী আইন চালু হ'ল এবং তার মধ্যে কোথায় কতটা ফাঁক আছে, এ সব কূটকচাল তাদের না জানলেই নয়। মিশ্ররা এবং দুবেরা তাই জমিদারি বিলোপ প্রথা পাশ হবার পর ঝানু ল-ইয়ারদের দিয়ে এর ফোকরগুলো খুঁজে বার করে। তারপর স্বনামে এবং বেনামে কয়েক শ'একর জমির ব্যবস্থা এমনভাবে করে ফেলে যাতে আইনের সাধ্য কি, তাদের একটি চুলের ডগাও ছুঁতে পারে!

কিন্তু দিনকাল পালটাতে শুরু করেছে। আনপড় ভুখা অচ্ছুতগুলোর চোখও ইদানীং অল্প অল্প ফুটছে। ভোজপুর মোতিহারি পালামৌর দিক থেকে অনেক

রকম গোলমেলে খবর আসে। বান্ধুয়া কিষাণ, ভূমিহীন অচ্ছুত এবং আদিবাসী ওরাওঁরা নাকি খুব ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছে। তাদের দাবি—বাপ, নানা, নানার বাপ কিংবা তার বাপের কাছ থেকে নানা অছিলায় এবং কৌশলে বা বন্দুকের জোরে যে সব জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, ফেরত দিতে হবে। শহর থেকে পোলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা এসে এইসব ভূমিহার, অচ্ছুত এবং আদিবাসীদের নাকি ক্রমাগত খেপিয়ে তুলছে। ভোজপুর পালামৌতে যে আগুনের ফুলকি দেখা দিয়েছে, ধরমপুরা কামতিগঞ্জ বইহারি এবং গোলগোলিতে তা ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ! পোলিটিক্যাল পার্টির ওয়ার্কাররা কি এ অঞ্চলের স্থিতাবস্থা বজায় থাকতে দেবে? 'ল্যাণ্ড রিফর্ম, ল্যাণ্ড রিফর্ম' বলে গোটা দেশ জুড়ে যেভাবে হৈ চৈ শুরু হয়েছে, যেভাবে নেতারা অনবরত হল্লা 'মচাচ্ছে', তাতে এখানকার শান্তি যে অটুট থাকবে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।

এসব নিয়ে আগে আগে আদৌ মাথা ঘামাতেন না মুকুটনাথ। কড়া ধাঁচের পুরনো ফিউডাল পদ্ধতিতেই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি মনে করেন প্রোপার্টি দখলে রাখার জন্য লাঠি বন্দুক এবং পোষা পহেলবানরাই যথেষ্ট। অবশ্য জমিদারি বিলোপ আইন চালু হবার পর তাঁর কিছুটা দুর্ভাবনা যে হয়নি তা নয়। পরে বিশাল জমিজমা বেনামা করে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মুকুটনাথের তুলনায় ত্রিকূটনারায়ণ ঢের বেশি দূরদর্শী। তাঁর ভাবনা-চিন্তা নিশ্চিতভাবেই একালের। অনেক আগেই তিনি বুঝেছিলেন, আজকের ভারতবর্ষে ফিউডাল সিস্টেম জিইয়ে রাখতে হলে শুধু মাত্র লাঠি বন্দুকের ওপর ভরসা করলে চলে না, তার জন্য যেটা সব চাইতে জরুরি, তা হল পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা—পোলিটিক্যাল পাওয়ার। সে কারণে গত তিনটি অ্যাসেম্বলি ইলেকশানে তিনি কনটেস্ট ক'রে আসছেন। প্রথম দু'বার তিনি হেরে যান। তৃতীয় বার অর্থাৎ সাড়ে চার বছর আগে যে চুনাওটা হয়ে গেল তাতে কোনোক্রমে জিতেছেন। ছ'মাস পর আবার সাধারণ নির্বাচন আসছে। এটা তাঁকে ভালো মার্জিনে জিততেই হবে।

পনেরো বছর হ'ল রাজনীতিতে এসেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। খুবই করিৎকর্মা মানুষ। বড়ো বড়ো জমিমালিকরা যেমন হয়, প্রচুর ঘিউ-মাখ্খন, পেস্তাবাদাম এবং হুইস্কি খেয়ে শরীরে চর্বির পাহাড় জমিয়ে কাজের বার হয়ে যায়—তিনি তার উলটো। ঘিউ-শক্কর বা মদটা তিনি নিশ্চয়ই খান তবে মাত্রা ছাড়া নয়, খুবই মাপা। ষাটের কাছাকাছি বয়স কিন্তু শরীরে বাড়তি বাজে মেদ এক গ্রামও জমতে দেননি। পেটানো চেহারা তাঁর, অটুট স্বাস্থ্য। কখনও ক্লান্ত হ'ন না, আলস্য বলতে কিছু

নেই। তাঁর পায়ে অদৃশ্য চাকা বাঁধা আছে। সর্বক্ষণ ম্যারাথন দৌড়ের মধ্যেই যেন রয়েছেন। দিনরাত ছুটছেন, প্রচণ্ড এনার্জিতে টগবগ করে ফুটছেন।

জমিজমা ত আছেই, সেসব দেখাশোনার জন্য লোকজন রেখেছেন। পুরুষানুক্রমে চাষবাসের কাজ যান্ত্রিক নিয়মেই চলছে। ও নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, এদিকে সময় না দিলেও চলে। কিন্তু রাজনীতিতে আসার পর এ ব্যাপারটাকে ত্রিকূটনারায়ণ হোল টাইম প্রফেসন হিসেবেই নিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস আধাখ্যাঁচড়া মন নিয়ে কারো পোলিটিকসে নামা ঠিক নয়। এতে শরীর নিঙ্‌ড়ে সমস্ত এনার্জি এবং কর্মক্ষমতা ঢেলে দেওয়া দরকার। এটা শুধু কথার কথা নয়, নিজেও পনেরো বছর ধরে তা ঢেলে দিয়েছেন। তার ডিভিডেণ্ডও পেতে চলেছেন এতদিনে।

এই পনেরো বছরে পনেরোটা দিনও একটানা তিনি কামতিগঞ্জে কাটাননি। পাঁচ সাত দিন পর পরই ছুটেছেন পাটনায় বা দিল্লিতে। একটা ইলেকসনে জিততে না পারলেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সঠিক জায়গায় পুজো চড়াবার ফলে পোলিটিক্যাল সার্কেলে তাঁর ছায়া ক্রমশ বড়ো হয়ে পড়তে শুরু করেছে, শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহুদূর পর্যন্ত। ত্রিকূটনারায়ণকে মোটামুটি কথা দেওয়া হয়েছে, এবারের চুনাওতে জিতে এলে স্টেট ক্যাবিনেটে তাঁর মন্ত্রিত্ব কেউ ঠেকাতে পারবে না। পাঁচ বছর এখানে কাটাবার পর পার্লামেণ্টারি ইলেকসনে জিতিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লি। সেখানে আরও বিরাট কিছু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। রাতারাতি তিনি অল ইণ্ডিয়া ফিগার হয়ে যাবেন।

রাজনীতিতে আসার পর থেকেই ত্রিকূটনারায়ণ লক্ষ্য করছেন, পুতহু বা পুত্রবধূরা ইণ্ডিয়ান পোলিটিকসের অনেকটাই কনট্রোল করছে। দিল্লি বা পাটনায় গেলে চোখে পড়ে জবরদস্ত নেতা বা মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য অলিখিত কোনো নিয়মেই যেন সুন্দরী শিক্ষিতা ঝকঝকে স্মার্ট পুত্রবধূরা সর্বক্ষণ পরছাই হয়ে ঘুরছে। এরা বিখ্যাত ক্ষমতাবান শ্বশুরদের বন্ধু সচিব পরামর্শদাতা এবং পাবলিক রিলেশান্‌স এজেন্ট। এরা নিখুঁত উচ্চারণে জলের মতো ইংরেজি বলে, পার্টিতে যায়, জনসভায় বা প্রেস কনফারেন্সে শ্বশুরদের পাশে পাশে থাকে, বক্তৃতা ড্রাফট করে দেয়, দর্শনার্থীদের সামলায়, রাত্তিরে শোবার সময় বলবর্ধক টনিক এবং ঘুমের ওষুধ হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

মেয়েদের দিয়েও এ সব কাজ হতে পারে কিন্তু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো তারা অন্যের প্রোপার্টি, বিয়ে হলেই পরের ঘরে চলে যায়। কিন্তু পুতহু কোথাও যাবে

না। ইদানীং ইণ্ডিয়ান পোলিটিকসে চোস্ত ইংরেজি বলিয়ে স্মার্ট সোসিয়েলেট পুত্রবধূ একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং স্থায়ী অ্যাসেট।

এই সব দেখে শুনে আইডিয়াটা মাথার ভেতর বসে যায় ত্রিকূটনারায়ণের। তাঁকেও একটি ঝকঝকে উৎকৃষ্ট পুত্রবধূ যোগাড় করতে হবে। কিন্তু তখন তাঁর ছেলে হরীশের বয়স সবে এগারো, ক্লাস ফাইভে পড়ছে। ছেলে বড়ো হবে, দু একটা পাস করবে, তবে তো বিয়ে, তবে তো পুতহু! ততদিন তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ঠিক এই সময় বা কিছু পরে এক আত্মীয়ের বাড়ি 'শুভ বিবাহ'-র নিমন্ত্রণে গিয়ে হঠাৎ কিরণকে দেখে তাক লেগে যায় ত্রিকূটনারায়ণের। তৎক্ষণাৎ খোঁজ-খবর নিয়ে মুকুটনাথকে বার করে ফেলেন। মুকুটনাথকে আগে থেকেই চিনতেন। সেই বিয়ের আসরেই তিনি সরাসরি প্রস্তাব দেন, কিরণকে পুতহু করতে চান। কিরণ হবে তাঁর মকানের শ্রেষ্ঠ অলংকার, ঘরের শোভা।

মুকুটনাথও ত্রিকূটনারায়ণকে চিনতেন। এমন একটা বিরাট মানুষ, যাঁর অগাধ টাকা, বিশাল ল্যাণ্ড প্রোপার্টি, রাজনীতিতে আসার কারণে বিপুল প্রতিপত্তি এবং দীর্ঘকালের আভিজাত্য—মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ের বাপকেই চিরকাল জোড়হাতে ছেলের বাড়িতে প্রার্থী হয়ে যেতে হয়, এটাই এ অঞ্চলের প্রথা। কিন্তু ত্রিকূটনারায়ণ যা করেছিলেন তা একেবারে অভাবনীয়। চমকটা থিতিয়ে এলে গভীর আবেগে তাঁর একটা হাত ধরে মুকুটনাথ বলেছেন, 'এ ত আমার বড়ো সৌভাগ।'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেছিলেন, 'সৌভাগ আমারও। দু' একদিনের ভেতর আমি আপনার মকানে বাত পাক্কা করতে যাচ্ছি।'

দিন তিনেক বাদে পুরানো মডেলের ঢাউস ফোর্ড গাড়িতে চড়ে সত্যিই এসেছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ, সঙ্গে স্ত্রী রোহিণী এবং জনপাঁচেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

যথেষ্ট খাতিরদারি করে তাঁদের দোতলায় নিয়ে বসানো হয়েছিল। মুকুটনাথের মা মহেশ্বরীর শরীর স্বাস্থ্য তখনও মোটামুটি ভালই ছিল অর্থাৎ কাশীতে গঙ্গাযাত্রা করার মতো অবস্থা হয়নি। তিনি কাছে বসে নতুন রিস্তেদারদের আদর-যত্নে যাতে কোনোরকম ত্রুটি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন আর অনর্গল কথা বলছিলেন। মিশ্ররা এবং দুবেরা পাহাড়ের এপারে এবং ওপারে পঁচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে যদিও পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছে, তবু তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। এত কাল পর ত্রিকূটনারায়ণের আগ্রহে এবং

মহত্বে দুই বংশের যে গাঁট-বন্ধন হতে যাচ্ছে সে জন্য মহেশ্বরী খুব খুশি। 'মনমে বহুত সন্তোষ হুয়া, আউর পরমাত্মাকা বহুত শান্তি। শিউশংকরজি আউর মা লছমীকা কিরপাসে এ নাতেদারি আচ্ছাই হোগা।'

খাঁটি ভৈসা ঘিয়ে তৈরি মুগের লাড্ডু, গুলাবজামুন, কলাকন্দ, প্যাঁড়া, রাবড়ি ইত্যাদি দিয়ে উৎকৃষ্ট ভোজন করতে করতে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আমি ত 'সাদিকা বাত' পাক্কা করতে এসেছি। আপনাদের মেয়ে আমার দেখা, লেকেন আমার ছেলেকে আপনারা দেখেননি। তার সম্বন্ধে আপনাদের সব কিছু জানা দরকার। তাকে আপনাদের দেখা উচিত।'

মুকুটনাথ রেবতী এবং মহেশ্বরী একসঙ্গে প্রবলবেগে মাথা এবং হাত নেড়েছেন। এমন অবিশ্বাস্য কথা আগে আর কখনও শোনেননি তাঁরা। বিয়ের কথা হবে দুই পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে। মেয়ে দেখাটা অবশ্যই চলতে পারে কিন্তু ছেলে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। এমন রেওয়াজ এদিকে চালু নেই।

মুকুটনাথ বলেছেন, 'ছেলেকে দেখার জরুরত নেই, আপনাকেই ত দেখছি।'

'নেহী নেহী'— আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে ত্রিকূটনারায়ণ বলেছেন, 'ইয়ে ঠিক নেহী। আমি আপনি চিরকাল থাকব না। কানা খোঁড়া আন্ধা—কার হাতে আপনি ফুল বরাবর লেড়কিকে দিয়ে গেলেন, একবারও দেখবেন না? ভারতীয় সংবিধানে পুরুষ আউর আওরতের সমান রাইট দিয়েছে। লেড়কি পসন্দ হ'লেই হবে না, লেড়কাকেও মনের মতো হ'তে হবে। নইলে এই সাদিতে বরাবর খিঁচ লেগেই থাকবে।'

এই সব লিবারেল কথাবার্তা যে একেবারেই অনাবশ্যক, ত্রিকূটনারায়ণ খুব ভালো করেই জানতেন। তাঁকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য মুকুটনাথের নেই। তবু এগুলো বলার উদ্দেশ্য একটাই, মুকুটনাথদের কাছে নিজের প্রোগ্রেসিভ ইমেজ বা ভাবমূর্তি চমকদার করে তোলা।

মুকুটনাথরা আরো একবার তাজ্জব বনে যান। পরে ভাবী দামাদ এগারো বছরের বালককে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন শ্রীমানজিকে একবার দেখে আসব।'

ত্রিকূটনারায়ণের মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। বলেছেন, 'এবার তা হ'লে আরেকটা জরুরি কথা সেরে নেওয়া যাক।'

একটু অবাকই হয়েছেন মুকুটনাথ। পাকা কথা হয়ে যাবার পর জরুরি কথা

কী থাকতে পারে ? পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে পড়েছে। বলেছেন, 'দহেজের ব্যাপারে কিছু বলবেন ?'

'নেহী, নেহী । আমরা চামারিয়া নই, ও আপনি যা ভালো বুঝবেন তা-ই হবে ।'

'তব্ ?'

'আপনার লেড়কিকে লেখাপড়া শেখাতে হবে ।'

'তা তো শেখাচ্ছিই। একজন মাস্টারজি রেখে দিয়েছি—'

'ওতে হবে না, হাইলি এডুকেটেড হ'তে হবে ।'

মুকুটনাথ আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন, 'চিন্তা মাত করনা দ্বুবেজি। এক মাস্টারের জায়গায় দশ মাস্টার লাগিয়ে দেব ।'

মহেশ্বরী বেশ মজার গলায় বলেছেন, 'নাতনীকে পণ্ডিতাইন করেই তোমাদের ঘরে পাঠাব ।'

ত্রিকূটনারায়ণ হেসে হেসে জানিয়েছেন, তিনি পুতহু হিসেবে একটি স্মার্ট মডার্ন লেডি চান। এখানকার ধুসো কোট পরা, নাকের ডগায় নিকেলের গোল চশমা লাগানো, চামড়া ঘেঁষে চুল ছাঁটা, মোটা টিকিওলা, কাঁচা চামড়ার চপ্পল পরা, টিপিক্যাল আধা শহুরে আধা গাঁইয়া মাস্টারদের সাধ্য নেই কিরণকে একটি ঝকঝকে সফিস্টিকেটেড আধুনিকা বানিয়ে তুলতে পারে। বড়ো জোর প্রাচীন ভারতের মৈত্রেয়ী এবং অরুন্ধতীদের মডেলে ফেলে কিরণকে তাদের একটি ডুপ্লিকেট বানানো এই মাস্টারজিদের পক্ষে সম্ভব। তার বেশি কিছু নয়।

বিমূঢ়ের মতো মুকুটনাথরা জিজ্ঞেস করেছেন, 'তব্ ?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেছেন, 'লেড়কিকে দিল্লির কনভেণ্টে পাঠিয়ে দিন। আংরেজি ভাষা, বিলাইতি চাল, রাহান সাহান, এটিকেট, এ সবে দুরস্ত হয়ে আসুক।' তিনি আরও বলেছেন, আজকের ফ্রী ইণ্ডিয়ায় সোসাইটি, পোলিটিকস বা জীবনের যে কোনো জায়গায় উঁচু লেভেলে চড়তে গেলে 'ইংলিশ'টা খুবই জরুরি, ওটা ছাড়া একটি কদমও ফেলা যাবে না।

তিন তিন বার ইণ্টারমিডিয়েট ফেল ত্রিকূটনারায়ণের ইংরেজি ভাষা এবং 'বিলাইতি' চালের ওপর অসীম দুর্বলতা। নিজে ভালো ইংরেজি বলতে পারেন না। অজস্র ভুলভাল তো বলেনই, তাঁর উচ্চারণে ধরমপুরা কামতিগঞ্জ গোলগোলি এবং বইহারির দেহাতী গন্ধ আর ঢং মিশে আছে। তাঁর আংরেজি যে অত্যন্ত বিদঘুটে এবং কিম্ভূতকিমাকার, সেটা নিজেও কিছু কিছু টের পান।

যে ত্রিকূটনারায়ণ ইংরেজি ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না, যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন জুড়ে শুধুই ইংরেজি, তিনিই কিনা এক সময় 'আংরেজি হটাও' আন্দোলনে নেমে গোটা আর্যাবর্ত চষে বেড়িয়েছেন। পোলিটিকসে এলে এরকম উলটো-পালটা কাজ করতেই হয়। ভারতবর্ষের মানুষের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, এসব ঘটনা তারা মনে করে রাখে না।

ত্রিকূটনারায়ণের কথাগুলো সবটা না পারলেও খানিকটা খানিকটা ধরতে পেরেছিলেন মহেশ্বরী। তিনি বলেছেন, 'পুতহুকে মেমসাহেব বানাতে চাও বেটা?'

'তা বলতে পারেন।' —ত্রিকূটনারায়ণ হেসেছেন।

'লেকেন বেটা, একটা কথা বলব। বুরা না সমঝো—'

'না না, আমি কিছুই ভাবব না, আপনি বলুন মা'জি।'

মহেশ্বরী যা বলেছেন তা এইরকম। দুবে এবং মিশ্রদের পারিবারিক আবহাওয়া চালচলন এবং রাহান সাহান অবিকল এক ধাঁচের। মেয়েরা বাড়ি থেকে কদাচিৎ বাইরে বেরোয়। বংশানুক্রমে জীবনযাত্রার যে প্যাটার্ন তৈরি হয়ে আছে তা ভাঙার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাড়িতেই যখন গোঁড়ামি সংস্কার পূজা তৌহার কুলদেওতা ইত্যাদির মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে, তখন মেমসাহেব পুত্রবধূর প্রয়োজনটা কোথায়?

এবার ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও তিনি এম. এল. এ হননি, তবে খুব শিগগিরই যে হয়ে যাবেন এবং তারপর মন্ত্রী হওয়াও যে অবধারিত, এ নিয়ে আদৌ সংশয় নেই। তখন সঙ্গী সেক্রেটারি এবং গাইড হিসেবে একজন সোসিয়েলাইট পুত্রবধূ ছাড়া এক সেকেণ্ডও চলে না। মজা করে বলেছেন, 'ইণ্ডিয়ান পোলিটিকসের ফর্টি পার-সেণ্ট এখন কনট্রোল করছে পুতহুরা।'

মহেশ্বরী খুঁতখুঁত করছিলেন। নাতনীকে সোসিয়েলাইট বানাবার প্রস্তাবে তাঁর আত্মা এতটুকু সায় দেয়নি। রক্তে ভাসমান বহুকালের সংস্কার কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ! তিনি বলেছেন, 'আমাদের বাড়ির মেয়েরা কেউ লেখাপড়া শেখার জন্য বাইরে গিয়ে থাকেনি।'

'মা'-জি, জমানা বিলকুল বদল গিয়া। আজকাল মেয়েরা চাকরি করছে, বড়ো বড়ো কোম্পানি চালাচ্ছে, আকাশে হাওয়াই'জাহাজ ওড়াচ্ছে, এম. এল. এ বনছে, মন্ত্রী হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউসান পুরুষ আউর আওরতকে বরাবর করে দিয়েছে। দু'জনের ইকোয়েল রাইটস—সমান অধিকার।'

তবু কিরণকে 'আংরেজি' স্কুলে পাঠিয়ে বিলাইতি চাল শেখানোর ব্যাপারে একেবারেই রাজি হচ্ছিলেন না মহেশ্বরী। কিন্তু এই সময় কিঞ্চিৎ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণকে সমধী হিসেবে পেলে নানাদিক থেকে লাভ। কিছুদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা একটা লোহার কারখানা বসাবেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই বড়ো বড়ো জমিমালিক, ল্যাণ্ডেড অ্যারিস্টোক্রাট। এরা কেউ কেউ ধানবাদে আর আদিত্যপুরে ফ্যাক্টরি বসিয়েছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়ায় তাঁদের চালচলন, পোশাক, লাইফ স্টাইল রাতারাতি বদলে গেছে। কেউ আর এখন দেহাতী ঢংয়ে ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি বা নাগরা পরে না, কলকাতা বা পাটনার নামকরা টেলরদের দিয়ে স্যুট বানিয়ে আনে। চুলের ছাঁটও অন্যরকম হয়ে গেছে। এদের আফিসের চেহারা দেখে তাক লেগে গেছে মুকুটনাথের। আজন্ম তিল তিসি ধান গেঁহু কিষাণ সার চাষবাস কুলগুরু কুলদেওতা জমিজমা, এসব নিয়েই আছেন। শেষ বয়সে কারখানা-টারখানা বসিয়ে একটু আলাদা স্টাইলে জীবনটা যদি কাটানো যায়, মন্দ কি!

অর্থাৎ জমিমালিক থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হ'তে চান মুকুটনাথ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন, তাঁর যা-ই থাক, হুট করে কারখানা বসানো খুব সোজা ব্যাপার নয়। পেছনে যদি ত্রিকূটনারায়ণের মতো জবরদস্ত পোলিটিক্যাল লিডারকে সমধী হিসেবে পাওয়া যায়, সব কিছু জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। তা ছাড়া পালামৌ ভোজ-পুরের দিকে ভূমিহীন বান্ধুয়া কিষাণরা যে ধরনের ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছে তার আগুন যদি এধারে কোনোভাবে ঠিকরে আসে, ত্রিকূটনারায়ণের সাহায্য তখন অত্যন্ত দরকার।

সাত বছরের কিরণকে নিয়ে তার বাবা এবং ভাবী শ্বশুর, দু'জনেই দু'দিক থেকে অতি চতুর এবং চিকন পরিকল্পনা করেছিলেন। তার ওপর ভর করেই দু'জনে কয়েক স্তর ওপরে উঠতে চান।

মুকুটনাথ ঝানু ডিপ্লোম্যাটদের মতো হেসে হেসে মহেশ্বরীকে বলেছেন, 'মা, কিরণ এখন ওদের জিনিস। আমরা পরায়া ধন পালপোষ করছি। ত্রিকূট-নারায়ণজি যদি চান তাঁদের পুতহু আংরেজি শিখবে ত শিখবে, বিলাইতি চাল রপ্ত করবে ত করবে। আমরা কেন বাধা দেব? সত্যিই ত, দিনকাল বদলে গেছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন মহেশ্বরী।

আরো খানিকটা সময় এ নিয়ে কথাবার্তার পর ত্রিকূটনারায়ণ বলেছেন,

'অনেকক্ষণ এসেছি, এবার আমাদের উঠতে হবে। যাবার আগে একবার আমার 'ঘরকা রোশনি'কে দেখে যাই।'

'ঘরকা রোশনি' অর্থাৎ কিরণ। তাকে তখনই ডেকে আনা হয়। ত্রিকূট-নারায়ণ তার কাঁধে একটা হাত রেখে কোমল স্বরে বলেন, 'ছোটি মা, তোমার সব ব্যওস্থা পাক্কা হয়ে গেল। দু-এক মাসের মধ্যে তোমাকে কনভেণ্টে পাঠানো হবে। কোশি নদীতে বর্ষায় যেমন কারেণ্ট খেলে ওইরকম স্পীডে আংরেজি বলতে শিখবে।' বলেই তাঁর মনে হয়েছে কোশি নদীর কারেণ্টের উপমাটা খুব জুতসই হয়নি। তিনি এবার বলেছেন, 'আংরেজিটা এমনভাবে বলতে শিখবে যাতে মনে হবে, মেমসাহেবের গলার নলিয়া থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বাধীন ভারতে ইংলিশটা ইমপর্ট্যাণ্ট চীজ।'

তখন অনেক কিছুই বোঝার বয়স নয় কিরণের। চোখ বড়ো বড়ো করে সে তাকিয়ে থেকেছে। ত্রিকূটনারায়ণ নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে এবার বলেছেন, 'ঘরের লছমীকে আশীর্বাদ করো।'

ত্রিকূটনারায়ণের স্ত্রী রোহিণী বিপুল চেহারার থলথলে মহিলা। সর্বাঙ্গে পর্যাপ্ত মেদ। কপালের মাঝামাঝি তাঁর ঘোমটা টানা। সিঁথি থেকে পা পর্যন্ত হীরে মোতি সোনা চাঁদিতে মোড়া। এতক্ষণ রোহিণী চুপচাপ বসে ছিলেন, হঠাৎ শশব্যস্তে আঁচলের তলা থেকে একটা চাঁদির বাক্স বার করে খুলে ফেলেন। সেটার ভেতরে রয়েছে প্রচুর জড়োয়া গয়না। কিরণকে কোলে বসিয়ে নিজের হাতে সেগুলো একটা একটা করে তাকে পরিয়ে দেন, তারপর আদর ক'রে তার মাথায় কপালে চুমু খান।

ত্রিকূটনারায়ণরা চলে যাবার আধ ঘণ্টা বাদে আচমকা কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় মহেশ্বরী প্রায় শিউরেই ওঠেন, 'মেয়েটার সর্বনাশ করে ফেললাম রে মুকুট—' তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল একেবারে ভেঙে পড়েছেন, তাঁর সর্বস্ব খোয়া গেছে।

মিশ্র বাড়ির সবাই ভয়ানক চমকে উঠেছিল। মুকুটনাথ বলেছেন, 'কী হয়েছে মা?'

দুবেদের ঘরে মেয়ে পাঠানো ঠিক হবে না। ইয়ে সাদি নেহী হোনা চাহিয়ে! দুবেরা যে জেবর দিয়ে গেছে, কালই সেগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিবি।'

বিমূঢ়ের মতো মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন মুকুটনাথ। বলেছেন, 'এ তুমি কী বলছ মা! অত বড়ো একটা আদমী নিজের থেকে এসে কিরণকে

আশীর্বাদ করে গেলেন, তখন ত কিছু বললে না ! এখন কিভাবে বিয়ে ভাঙব ? তা ছাড়া —'জোরে শ্বাস টেনে ফের বলতে থাকেন, 'ত্রিকূটনারায়ণজির কাছে তখন নিজেই বললে দুবেদের ঘরে কন্যাদান করাটা আমাদের পক্ষে বহুত সৌভাগ্য !'

মহেশ্বরী বলেছেন, 'তখন মনে পড়েনি যে। তারপর অচানক সব খেয়াল হ'ল। ওদের বংশটা কেমন জানিস তো —'

মা কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, সঠিক ধরতে না পেরে তাকিয়েই থাকেন মুকুটনাথ।

মহেশ্বরী সমস্ত ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ অঞ্চলের কারো জানতে বাকি নেই যে, দুবেদের বংশটা খুবই দাগী। পুতহু পোড়াবার জন্য তারা বিখ্যাত। তিন তিনটে 'বহু'কে তারা পুড়িয়ে মেরেছে। এমন খুনীদের ঘরে কিরণকে পাঠানো কোনোভাবেই সমীচীন নয়। এ হ'ল সব জেনেশুনে, হাত-পা বেঁধে একটা মেয়েকে সোজা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া।

এতক্ষণে মুকুটনাথেরও মনে পড়ে গেছে। তিনি বলেছেন, 'সে সব পনদ্র বিশ সাল আগের কথা। তারপরে তো আর কিছু শুনিনি। তাছাড়া —'

'কী ?'

মুকুটনাথ জানান, ত্রিকূটনারায়ণজি উদার, মহানুভব এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ। বড়ো 'মহত্ত্বপূর্ণ আদমি'। তার ওপর পোলিটিকসে নেমেছেন। তিনি এখন পাবলিক ফিগার। ইচ্ছা থাকলেও এমন কিছুই বলতে বা করতে পারেন না যাতে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস হয়ে যায়। পোলিটিকস বহুত আজীব চীজ। এম. এল. এ, এম. পি বা মন্ত্রী বনতে হ'লে কিছু কিছু দামও দিতে হয়। মহেশ্বরী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কিরণের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়বে না।

মুকুটনাথ বলেছেন, 'চিন্তা না করনা মা।'

'মিশ্র নিকেত'-এ রেবতীর ভূমিকা পরছাই বা ছায়ার মতো। সারাদিনে দু-চারটের বেশি শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না। সর্বক্ষণ চুপচাপ, নিঃশব্দে চলেন ফেরেন, নৌকর-নৌকরানীদের কাজকর্ম তদারক করেন। কিন্তু মহেশ্বরী উত্তর দেবার আগে হঠাৎ বলে ফেলেছেন, 'খরবুজাসে খরবুজা রং পাকড়তা হ্যায়। ওদের গায়ে হত্যারার খুন। আমার ডর লাগছে।'

মুকুটনাথের চোখে মুখে এবার অসহিষ্ণুতা ফুটে বেরিয়েছিল। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলেছেন, 'পরছাইসে ডরনা মাত। ওরা কি ভিখমাঙোয়ার ঘর থেকে পুতহু নিচ্ছে ? দুবেরা না চাইলেও দহেজ আমি ঠিকই দেব। কমসে কম শ'ও বিঘা জমিন, হীরা মোতির জেবর, নগদ পঁচিশ হাজার রুপাইয়া। দুবেরা কিরণকে মাথায়

চড়িয়ে রাখবে।' একটু থেমে বলেন, 'তাছাড়া আমাদের সঙ্গে রিস্তেদারি করলে আখেরে ত্রিকূটনারায়ণজির ফায়দাই হবে। এতে তাঁর স্বার্থ রয়েছে।'

'কিসের স্বার্থ?'

'শুনেছি, এবার যে চুনাও আসছে, তাতে কামতিগঞ্জের চুনাও কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের গোলগোলি মৌজার অনেকটা জায়গা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লগভগ গোলগোলিতে দশ হাজার ভোটার রয়েছে। আমি যাকে দিতে বলব, এই দশ হাজার ভোটে তার নামেই মোহর পড়বে। চুনাওতে জিততে হ'লে আমার পায়ে ত্রিকূটনারায়ণ দুবেকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। সমঝি?'

রেবতী কিছু বলার সুযোগ পাননি, তার আগেই মুকুটনাথ আবার শুরু করেছেন, 'আমার মেয়ের গায়ে আগুন ধরিয়ে আপনা ভবিষ্যের সত্যনাশ করবেন, ত্রিকূটজি এতটা বেওকুফ নিশ্চয়ই হবেন না।'

তবু দ্বিধাটা পুরোপুরি কাটেনি রেবতীর। বলেছেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে তিন তিনটে পুতহু পুড়িয়েছে, এটা তো মিথ্যে নয়।

মহেশ্বরীও মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন, 'ঠিক, ঠিক বাত।'

এবার বেশ রেগেই গেছেন মুকুটনাথ. 'কেন, কেন ওরা পুতহু পুড়িয়েছে, তোমাদের মনে নেই? যা দহেজ দেবার কথা ছিল তা ওই তিন পুতহুর বাপেরা দেয়নি। তাতেই ত দুবেদের মাথায় খুন চড়ে যায়। এই যে আমি সাদি করেছি, আমার শ্বশুর যদি কথা দিয়ে দো শ' বিঘে জমিন না দিত, তোমরা কী করতে মা?' রেবতীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছেন, 'একে কি টিকতে দিতে?'

সামনে পেছনে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন মহেশ্বরী। পুত্রবধূ পোড়াবার এমন নিশ্ছিদ্র সলিড যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। রেবতীও আর কিছু বলেননি। যারা ছেলেদের শ্বশুরবাড়ি থেকে পর্যাপ্ত দহেজ পায় না, নিশ্চিতভাবেই তাদের পুতহু পোড়াবার অধিকার আছে।

কণ্ঠস্বর নমনীয় করে মুকুটনাথ বলেছেন, 'তোমাদের তো বলেছিই, দুবেরা ভিখমাঙোয়ার ঘর থেকে মেয়ে নিচ্ছে না। কিরণের কিছু হ'লে আমি ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

'সাদিকা বাত' পাকা হয়ে যাবার মাস দুই বাদে কিরণকে দিল্লির কনভেণ্টে পাঠানো হয়েছিল। ওখানে থেকেই তাঁকে পড়তে হবে।

কনভেণ্টের ব্যবস্থা করেছিলেন স্বয়ং ত্রিকূটনারায়ণ। তিনি এবং মুকুটনাথ

প্রথম বার কিরণকে দিল্লি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। কিরণ কিছুতেই ওই অজানা অনাত্মীয় পরিবেশে থাকবে না, খুব কান্নাকাটি করেছিল সে। মুকুটনাথ অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে শান্ত করেছেন। কথা দিতে হয়েছে, বছরে তিন বার—এক্স মাসের ছুটিতে, দেওয়ালীর সময় এবং সামার ভ্যাকেসানে মুকুটনাথ নিজে এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন।

কনভেণ্টটা প্রায় চার একর জায়গা জুড়ে। কমপাউণ্ডের ভেতর দু দুটো খেলার মাঠ, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন আর বাস্কেটবলের কোর্ট। তাছাড়া এখানে ওখানে চমৎকার বাগান, প্রচুর গাছপালা, ফুল, অজস্র পাখি। একটা ভাল সুইমিং পুলও আছে। সামনের দিকে তকতকে স্কুল বিল্ডিং, একেবারে পেছনে ছাত্রী এবং টীচারদের জন্য কটেজ টাইপের হস্টেল।

ইণ্ডিয়ার প্রায় সব প্রভিন্স থেকেই মেয়েরা এখানে পড়তে এসেছে। এদের বেশির ভাগই পার্শী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, কুর্গী, বাঙালী আর সাউথ ইণ্ডিয়ান। প্রতিটি মেয়েই দারুণ স্মার্ট এবং প্রাণবন্ত, সারাক্ষণ টগবগ করে যেন ফুটছে। সব ক'টি মেয়েকেই 'চুন চুনকে' অর্থাৎ কিনা চুলচেরা বিচারের পর বেছে নেওয়া হয়েছে। কিরণই শুধু বাদ। তার মতো প্রায় গাঁইয়া একটি মেয়ের অ্যাডমিসন সম্ভব হয়েছে ত্রিকূটনারায়ণের রাজনৈতিক কনট্যাক্টের জোরে।

'মিশ্র নিকেত'-এর পর্দা-ঢাকা, হাজার বছরের প্রাচীন গোঁড়ামি এবং সংস্কারে ঠাসা অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অচেনা এক সৌরলোকে যেন চলে এসেছে কিরণ। সে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। গোড়ায় গোড়ায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কুঁকড়ে থাকত। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন এই পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে। দু' বছরের মধ্যে সে কনভেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল।

প্রথম দিকে বছরে তিন বার এসে কিরণকে বাড়ি নিয়ে যেতেন মুকুটনাথ। পরে অবশ্য খুবলালকে পাঠাতেন। প্রতি বারই ধরমপুরায় এসে কিরণের মনে হয়েছে, 'মিশ্র নিকেত' ক্রমশ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ বাড়িতে সে জন্মেছে, তার রক্তে এবং ফুসফুসে জীবনের প্রথম সাতটা বছর মিশ্র বংশের গোঁড়ামির সমস্ত ভাইরাস ঢুকে গেছে, তবু মনে হ'ত, সে এখানকার কেউ না। ভাবনা চিন্তা, লাইফ স্টাইল—সব দিক থেকেই ধরমপুরার সঙ্গে তার যোগাযোগ ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছিল।

ছুটিতে বাড়ি এলেই ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর ঢাউস ফোর্ড গাড়িতে চেপে চলে

আসতেন। দু' একবার ছেলেকেও নিয়ে এসেছেন। ছেলের পুরো নাম হরীশ নারায়ণ, সংক্ষেপে হরীশ—কিরণের ভাবী স্বামী।

হরীশ আদৌ তার বাবার মতো নয়। ঘিউ-ননী খাওয়া গোলগাল শান্তশিষ্ট ভালমানুষ চেহারা। তাকেও বিলাইতি এটিকেট, চোস্ত ইংরেজি এবং রাহানসাহান শেখাবার জন্য পাটনার এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কিরণ শুনেছে হরীশের মাথাটি একেবারেই নিরেট, একেবারেই নিশ্ছিদ্র পাথরের স্ল্যাব, কিছুই ঢোকে না, বেরোয়ও না। একেকটা ক্লাসে প্রোমোসান পেতে তার কম করে দু-তিন বছর লেগে যায়।

অকর্মার ধাড়ি, অপদার্থ এই ছেলেটা কিরণদের বাড়ি এলে ত্রিকূটনারায়ণের গা ঘেঁষে, মুখ নামিয়ে এমনভাবে বসে থাকত যাতে থুতনিটা সোজা বুকে গিয়ে ঠেকত। একটি কথাও বলত না সে, কারো দিকে তাকাত না পর্যন্ত।

ত্রিকূটনারায়ণ কিরণকে বলতেন, 'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?'

কিরণ বলত, 'ভাল।'

এরপর কনভেন্ট সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতেন ত্রিকূট-নারায়ণ। টীচাররা কেমন পড়ায়, অন্য মেয়েরা তাকে বিরক্ত করে কিনা, বিলাইতি চাল কেমন শেখানো হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর অনিবার্য নিয়মে এই কথাটা বলতেন, 'ইংলিশটা কিরকম শিখলে, থোড়া কুছ শোনাও ত মা।' ইংরেজির প্রতি তাঁর আজন্মের দুর্বলতা এবং নৌকরসুলভ বশ্যতা।

প্রথম প্রথম লজ্জা পেত কিরণ। পরে অবশ্য বুঝেছে, সে বাড়ি এলেই ত্রিকূট-নারায়ণ যে ছুটে আসেন তার কারণ একটাই। সে কতটা বিলিতি এটিকেটে চৌকস হয়েছে, জলের মতো ইংরেজি বলতে পারে কিনা, এ সব জানাই তাঁর উদ্দেশ্য।

পরে কিরণের বেশ মজাই লেগেছে, সে গড়গড়িয়ে যা হোক কিছু বলে যেত! শুনতে শুনতে ত্রিকূটনারায়ণের চোখে মুখে একটা আঠালো গ্যাদগেদে তৃপ্তির জেল্লা ফুটে বেরুত। ভবিষ্যতে তিনি যখন মন্ত্রী হবেন, অল ইণ্ডিয়া ফিগার হয়ে যখন তাঁর 'ভাবমূরত' শানদার হয়ে উঠবে, সেই অনাগত ঝকমকানো ভবিষ্যতের জন্য এইরকম একটি সর্বক্ষণের সঙ্গিনী এবং সেক্রেটারি একান্ত জরুরি। কিরণ অবিকল তাঁর মনের মতো হয়ে উঠছে। তাঁর পুতহু নির্বাচন যে আগাগোড়া অভ্রান্ত, এতে তিনি খুবই খুশি।

সে ধরমপুরায় এলে বাড়ির লোকেরা—মা বাবা থেকে শুরু করে নৌকর-নৌকরানীরা পর্যন্ত—অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। কয়েক মাস পর

পর সে যখন বাড়ি আসে, এর মধ্যে আগের বারের থেকে কতটা বদলে যায়, সেটা হয়তো তারা বুঝতে চেষ্টা করত।

মহেশ্বরী কিরণকে কাছে বসিয়ে প্রগাঢ় স্নেহে বলতেন, 'হাঁ রে মুন্নুয়া, তুই কি সচমুচ মেমসাহেব বনে যাবি !'

কিরণের আদরের নাম মুন্নুয়া। সে মাথা হেলিয়ে দিয়ে মজা করে হাসত 'ব'নে যাব কী, ব'নে গেছিই ত।'

'তোদের ইস্কুলে যারা রসুই করে তাদের কী জাত ? ব্রাহ্মণ না অন্য কিছু ?'

কেমন করে কিরণ ঠাকুমাকে জানায়, খ্রিস্টান মিশনারিদের কনভেণ্টে যারা খানা পাকিয়ে টেবলে সার্ভ করে তারা বেশির ভাগই গোয়াঞ্চি পিদ্রু আর লক্ষ্ণৌ-এর মুসলমান। এসব শোনার সঙ্গে সঙ্গে দমবন্ধ হয়ে তাঁর দেহান্ত ঘটে যাবে। মুসলমান আর খ্রিস্টানের হাতে খাওয়া শুদ্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে ঘোর অধর্ম। কিরণ বলত, 'আমাদের কুকরা, মতলব রসুইকরেরা সবাই শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণ।'

'সচ ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সচ।'

কিরণ জোর দিয়ে বলা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তা কাটত না মহেশ্বরীর। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'ওরা তোকে অখাদ্য খেতে দেয় না ত ?'

মহেশ্বরীর নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকায় রয়েছে মাংস ডিম এবং মছলি। এই বস্তুগুলো 'মিশ্র নিকেত'-এর বাউণ্ডারি ওয়াল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পায় না। মহেশ্বরীর চোখে এসব ভোজন পবিত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে অতীব গর্হিত কাজ। ঠাকুমাকে জানানো অসম্ভব যে দিল্লিতে গিয়ে কিরণ মাছ মাংস খেতে শিখেছে। যদিও ওখানে বিশুদ্ধ ভেজিটারিয়ানদের জন্যও ব্যবস্থা আছে তবু হ্যাম পর্ক মাটন তার অত্যন্ত প্রিয়। শাক্যদ্বীপি মিশ্র বংশের মেয়ে কুখাদ্য খেয়ে পাকস্থলী অপবিত্র করেছে, এ খবরটা কানে গেলে মহেশ্বরীর হাল কী হবে, কিরণ তা জানত। হেসে হেসে সে বলত, 'কী যে বল দাদী, তোমার নাতনী হয়ে ওসব খেতে পারি ! স্ট্রেট নরকে চলে যাব না ! আমি সেণ্ট পারসেণ্ট ভেজিটারিয়ানই আছি।'

'সেটা কী ?'

'পবিত্র শাকাহারী।'

পরে উঁচু ক্লাসে কিরণ যখন পড়ছে, তখন বাড়ি এলে জিজ্ঞেস করতেন, 'কি রে মুন্নুয়া, যেরকম চমকদার জোয়ানী লেড়কি হয়ে উঠেছিস তাতে দিল্লির ছোকরাদের মুণ্ডুতে চক্কর লেগে যাচ্ছে না ?'

চোখ কুঁচকে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিরণ বলত, 'যাচ্ছে আবার না !'

'কারো পাল্লায় পড়িসনি ত ?'

যদিও তামাসার ঢংয়ে, হালকা চালে প্রশ্নগুলো করতেন, তবু এর পেছনে যে মহেশ্বরীর গভীর দুর্ভাবনা রয়েছে, তা টের পেতে অসুবিধা হ'ত না। ঠাকুমাকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য কিরণ ঘাড় হেলিয়ে বলত, 'যদি পড়ে থাকি !' বলে ঠোঁট টিপে হাসত।

মহেশ্বরী আঁতকে উঠতেন, 'মাত্ কহো, মাত্ কহো। এমন বুরা কথা মুখ থেকে আর কখনও বার করবে না। কভী নেহী। অ্যায়সা বুরা জবানমে লাগাম হোনা চাহিয়ে।'

মহেশ্বরীর গলার ভেতর একটা দম দেওয়া স্বয়ংক্রিয় রেকর্ড আছে। এরপর সেটা অনেকক্ষণ একটানা বেজে যেত। ব্রাহ্মণ কুঁয়ারীকে বিয়ের আগে দেহমনে গঙ্গাজলের মতো শুদ্ধ থাকতে হয়। বিশেষ করে কিরণের মতো মেয়েকে। যার সগাই হয়ে গেছে তার পক্ষে ভাবী স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করাও জঘন্য পাপ, ভ্রষ্টাচার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ কুঁয়ারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের তালিকা শুনতে শুনতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যেত কিরণের। দু' হাতে কান চাপা দিয়ে সে বলত, 'প্লীজ দাদী, আর না। অন্য ছেলের দিকে তাকাব না, হরীশনারায়ণ দুবে ছাড়া আর কারো কথা ভাবব না, গঙ্গাপানি বরাবর শুধ্ থাকব—বিলকুল পিওর। ঠিক হ্যায় ?'

'হাঁ।'

'মনমে শান্তি হুয়া ত ?'

'হাঁ, পরমাত্মাকা শান্তি। পিছলা জন্মে বহুত 'পুণ' করেছিলি, তাই এবার মিশ্রর বংশে জন্মেছিস। এমন কিছু ভাববি না, এমন কিছু করবি না যাতে এই বংশে কলংক লাগে, এর পবিত্রতা নাশ হয়ে যায়। হোঁশিয়ার।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করতেন মহেশ্বরী, 'মনে করিস না দিল্লিতে গিয়ে আমার চোখের বাইরে যা খুশি করে বেড়াবি। আমি এখানে বসেও তুই কী করছিস না করছিস—সব টের পাই।'

কিরণ বুঝতে পারত, হাজার মাইল দূরে 'মিশ্র নিকেত'-এর চৌহদ্দি থেকে সোজা দিল্লি পর্যন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন মহেশ্বরী। নাতনীর দেহের শুদ্ধতা এবং মনের শুচিতা বজায় থাকাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরি।

কিরণ বাড়ি এলে মায়ের মুখ আলো হয়ে যেত। তাঁর চলায় ফেরায় আনন্দের

আভা যেন ছড়িয়ে পড়ত। কথা ত তিনি কম বলেন, তবু সময় পেলেই তাকে কাছে নিয়ে বসতেন। পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করতেন, সে দিল্লিতে ঠিকমতো খায় কিনা, সময়মতো ঘুমোয় কিনা, কোনোরকম অনিয়ম করে কিনা, এই সব।

যে ক'টা দিন সে বাড়িতে থাকত, রেবতী কখনও ঠাণ্ডাই বানিয়ে মেয়ের মুখের সামনে ধরতেন, কখনও নিয়ে আসতেন নিজের হাতে তৈরি নিমকিন, গুলাবজামুন, মুগের লাড্ডু, দেওঘরের পেঁড়া বা মোতিচুর কিংবা কলাকন্দ। মায়ের স্নেহ যে কত গভীর, কত দূরপ্রসারী, অন্য সবার থেকে সেটা কত আলাদা তা কয়েক দিনেই টের পাওয়া যেত।

মুকুটনাথ বেশি কিছু বলতেন না। শুধু পরিতৃপ্ত চোখে মিশ্র বংশের একটি মেয়ের আশ্চর্য ইভোলিউসান দেখে যেতেন। কিরণ একশ' বিঘে জমি, প্রচুর জেবর এবং অজস্র টাকার দহেজ নিয়ে দুবেদের বাড়ি চলে যাবে ঠিকই কিন্তু এইসব জমি-টমি একেবারে জলে যাবে না, বরং কুলদেবী মহালছমীর কৃপা হ'লে এর একশ' গুণ উঠে আসবে। এই মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি গিয়েও ভবিষ্যতে তাঁর জন্য অনেক কিছু করতে পারবে। সচমুচ ত্রিকূটনারায়ণজি যদি মন্ত্রী হ'ন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পোলিটিক্যাল সার্কেলে মিশবার সুযোগ পাবে কিরণ। তার এই সব যোগাযোগ থেকে ত্রিকূটনারায়ণজিই শুধু ফায়দা ওঠাবেন না, ছিটেফোঁটা তাঁর ভাগেও পড়বে। কিরণকে ঘিরে মুকুটনাথের মনেও উচ্চাশার 'মুরত' টা ক্রমশ লম্বা হ'তে শুরু করেছে।

এদিকে কিরণ যখন প্রথম দিল্লির কনভেণ্টে যায় সুষ্‌মা তখন খুবই ছোটো। সে যত বড়ো হচ্ছিল ততই কুচুটে এবং হিংসুক হয়ে উঠছিল। সুষ্‌মার ধারণা হয়েছিল এবং এখনও সে ধারণা অটুট—জগতে তার যা কিছু প্রাপ্য, যা কিছু কাম্য, সব কিরণ জোর করে কেড়ে নিয়েছে।

ছুটিতে কিরণ বাড়ি এলে সবাই ছুটে আসত, শুধু সুষ্‌মা বাদ। দূর থেকে কোঁচকানো হিংস্র চোখে সে শুধু ওকে লক্ষ করত। অগত্যা কিরণকেই ছোটো বোনের কাছে এগিয়ে যেতে হ'ত। তার হাত ধরে কোমল গলায় বলত, 'কেমন আছিস বুন্নুয়া?

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সুষ্‌মা হঠাৎ গলার শির ছিঁড়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিত, 'তোর জন্যে আমি কি সারা জীওন ভাল থাকতে পারব? চুহি কাঁহিকা!'

মুখটা কালো হয়ে যেত কিরণের। সে বলত, 'গুস্‌সা হচ্ছিস কেন? এই দ্যাখ তোর জন্যে কী এনেছি।'

ফি বারই সুষ্মার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসত কিরণ। কোনো বার কড়ির হার, কোনো বার দামী সেণ্ট বা পেন বা চামড়ার ফ্যাশনেবল ব্যাগ। সে সব ওর হাতে দিলেই ছুঁড়ে ফেলে দিত। চিৎকার করে বলত, 'নেহী' চাহিয়ে, নেহী' চাহিয়ে—'

সুষ্মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে চাইত কিরণ। কিন্তু সে অত্যন্ত অবুঝ, তার মধ্যে নানা ধরনের কমপ্লেক্স। নিতান্ত অকারণেই সে চেঁচাতে থাকত, এলো-পাতাড়ি বলে যেত, 'বাঁদরী কাঁহিকা, দিল্লিতে মেমসাহেব বনে সাপের পা দেখেছিস!'

তার দিল্লি যাওয়াটা যে সুষ্মার কষ্ট এবং কমপ্লেক্সের একটা বড়ো কারণ, সেটুকু বুঝতে আদৌ অসুবিধে হয়নি কিরণের। মুকুটনাথকে সে বহুবার বলেছে, সুষ্মাকেও যেন কোনো একটা কনভেণ্টে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু বাবা তা কানেও তোলেননি। যে মেয়েকে পুতহু করার জন্য ত্রিকূটনারায়ণের মতো বিখ্যাত 'বড়ে আদমী' দৌড়ে আসবেন না, তাকে কনভেণ্টে পাঠিয়ে বিলাইতি চাল শেখাবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। বংশধারা অনুযায়ী মান্ধাতার বাপের বয়সী পিঠ-বাঁকা কোমর-ভাঙা বুড়ো মাস্টারজিদের কাছে দু' চার পাতা যা পারে, শিখে নিক সুষ্মা। তা হ'লেই তার জীবন কেটে যাবে।

বাড়ির চেহারা ত এইরকম। কনভেণ্টের ক'টা বছর কিন্তু চমৎকার কেটেছে কিরণের। খ্রিস্টান মিশনারিদের ম্যানেজমেণ্ট, তাই হোলি বাইবেলটা পড়তেই হ'ত। তাতে তার আপত্তি ছিল না, বরং একটা নতুন জিনিস শেখায় আনন্দ ছিল।

কনভেণ্ট কিরণের সামনে হাজারটা দরজা খুলে দিয়েছিল যেন। নিয়মিত ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে ডিবেট, স্পোর্টস, এক্স-মাসে হোস্টেল সাজানো, পিকনিক, সেমিনার, মাঝে মাঝে নামকরা অধ্যাপক বা বিজ্ঞানীদের নিয়ে এসে তাঁদের কথা শোনা, নাটক করা, ভাল এডুকেসানাল ফিল্ম দেখা, এক্সকারসান, প্রায় ফি মাসেই এরকম কিছু না কিছু প্রোগ্রাম থাকতই। সারা ইণ্ডিয়া থেকে মেয়েরা পড়তে এসেছিল। তাদের কালচার, ভাষা বা ফুড-হ্যাবিট সবই আলাদা আলাদা। একটা সত্যিকারের কসমোপলিটান আবহাওয়ায় বছরের পর বছর থাকার জন্য কিরণের পৃথিবী দ্রুত বড়ো হয়ে যাচ্ছিল। শাক্যদ্বীপি মিশ্র বংশ তার ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তার ওপর গোঁড়ামি এবং সংস্কারের যে শক্ত স্থায়ী কোটিং চাপিয়ে

দিয়েছিল সেটা ভেঙে পড়ছিল। একটা খাপের ভেতর থেকে নিজের অস্তিত্বকে টেনে বার করে আনতে শুরু করেছিল সে।

কিরণ যখন হায়ার ক্লাসে পড়ছে, সেই সময় হঠাৎ আবছাভাবে মনে হয়েছিল, একজন ভাবী মন্ত্রীর সেক্রেটারি এবং একটা অত্যন্ত অপদার্থ ঘি-মাখন খাওয়া ছোকরার স্ত্রী হওয়ার চেয়েও আরো অনেক কিছু করার আছে। অনেক মীনিংফুল এবং দরকারী। হয়ত সেদিন থেকেই নিজের অজান্তে নিজস্ব একটা আইডেন্টিটির কথা ভাবতে শুরু করেছিল সে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে দিল্লিরই এক বিখ্যাত উইমেনস কলেজে ভর্তি হয়েছিল কিরণ। এই কলেজে মেয়ে পাঠাবার জন্য সারা দেশের নিও-অ্যারিস্টোক্র্যাটরা স্বাধীনতার পর থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে। প্রতি বছরই এখানে দিল্লি ছাড়াও বাকি স্টেটগুলো থেকে অ্যাপ্লিকেশন আসে পঁচিশ ত্রিশ হাজার। তার ভেতর থেকে সেই একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ 'চুন চুনকে' অর্থাৎ ঝাড়াই-বাছাই করে মাত্র চার শ' মেয়ে নেওয়া হয়।

ভালো রেজাল্ট করলেই এখানে অ্যাডমিসান পাওয়া যায় না। পারিবারিক ব্যাকগ্রাউণ্ড, সামাজিক এবং আর্থিক স্টেটাস, ভর্তি হওয়ার পেছনে এগুলো অনেক বেশি জরুরি। অলিখিত একটা শর্তই আছে, কলেজ ফাণ্ডে মোটা অংকের ডোনেসানও দিতে হবে।

আসলে দিল্লির এই কলেজটা হ'ল ভবিষ্যতের এম. পি, পলিটিক্যাল লীডার, ডিপ্লোম্যাট, আই. এ. এস, আই. এফ. এস, আই. পি. এস, বিগ বিজনেস হাউসের টপ এক্‌জিকিউটিভ বা ইণ্ডাসট্রিয়ালিস্টদের উপযুক্ত 'ধর্মপত্নী' অথবা জীবনসঙ্গিনী বানাবার ওয়ার্কশপ। এখানে ভর্তি হবার জন্যে তাই গোটা ইণ্ডিয়া জুড়ে প্রবল প্রতিযোগিতা।

এই কলেজেও কিরণের অ্যাডমিসানের ব্যবস্থা করেছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ। কনভেন্টের মতো এখানেও তাঁকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে হয়েছে। অবশ্য ততদিনে তিনি একটি নির্বাচনে জিতে এম. এল. এ হয়ে গেছেন। এবং রাজনীতিতে তাঁর সত্যিকারের এই জাতে ওঠার পেছনে মুকুটনাথের যথেষ্ট হাত আছে।

এখানে মেয়েদের পাঠানো হয়, ভবিষ্যতের দামী অফিসার টফিসারদের স্ত্রী করে তোলার কারণে। কিন্তু কিরণকে ভর্তি করা হয়েছিল একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতার পুত্রবধূ এবং যোগ্য সহকারিণী বানাবার উদ্দেশ্যে।

যে কনভেণ্টে কিরণ অনেকগুলো বছর কাটিয়ে এসেছে, তার তুলনায় কলেজ কম্পাউণ্ডটা অনেক বড়ো, প্রায় চার গুণ। সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্স স্ট্রীমের জন্য আলাদা আলাদা বিশাল বিল্ডিং। এ ছাড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, অডিটোরিয়াম, অনেকগুলো বাগান, খেলার মাঠ, তিনটে স্যুইমিং পুল—এসব আছেই। একধারে মেয়েদের হোস্টেল, টীচারদের জন্য কটেজ। হোস্টেলে দামী হোটেলে থাকার সুখ এবং আরাম।

কিরণদের কনভেণ্ট থেকে আরও চারটি মেয়ে, এই কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তারা পাঁচ জন ছাড়া ফার্স্ট ইয়ারের তিন শ' পঁচানব্বইটি নতুন মেয়ে একেবারেই অচেনা। এদের অনেকেই দিল্লির নানা কনভেণ্ট এবং স্কুল থেকে এসেছে। বাদ বাকিরা এসেছে কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ ব্যাঙ্গালোর আমেদাবাদ-টামেদাবাদ থেকে। অবশ্য যারা সিনিয়র, সেকেণ্ড থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারে তখন পড়ছে—তাদের কাউকে চিনত না কিরণ।

সে আগেই শুনেছিল, দিল্লির এই কলেজটায় মারাত্মক র‍্যাগিং চলে। ভয়ে ভয়েই সে প্রথম দিন বাবা এবং ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে এখানে এসেছিল। অফিসে খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, আর্টসের ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হোস্টেলের চারতলার বাইশ নম্বর রুমে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

মুকুটনাথরা কিরণকে পৌঁছে দিয়ে বেশিক্ষণ বসেননি, ছোটখাট কিছু সদুপদেশ দিয়ে চলে গেছেন। আর সে আস্তে আস্তে দুটো খেলার মাঠ এবং অনেকগুলো ফুলের বাগান পেরিয়ে চলে এসেছিল আর্টসের ছাত্রীদের হোস্টেলে।

পাঁচতলা হোস্টেল বিল্ডিংটায় দুটো অটোমেটিক লিফ্‌ট। ওপরে উঠে নিজের ঘরে এসে দারুণ খুশি হয়ে গিয়েছিল কিরণ। কার্পেটে মোড়া বিশাল ঘরের দু'ধারে দুটো সিঙ্গল-বেড, খাটে দুধের মতো ধবধবে বিছানা পাতা। একটা বেডে বসে আছে ললিতা—ললিতা নায়ার।

ললিতা কেরালার মেয়ে, তবে দিল্লিতেই জন্ম, ওর বাবা মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সে বিরাট অফিসার। ললিতা কনভেণ্টে কিরণের সঙ্গে পড়ত। সে ওর সব চাইতে প্রিয় বন্ধু।

কিরণকে দেখে লাফিয়ে উঠেছিল ললিতা, 'হাই কিরণ, তোর জন্য কতক্ষণ বসে আছি! অফিসে খোঁজ করে জানলাম, তোকে আর আমাকে একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। হাউ নাইস!'

কিরণের প্রায় নাচতে ইচ্ছা করছিল। একই ঘরে ললিতার সঙ্গে ক'টা বছর

থাকতে পারবে, এটা একটা দুর্দান্ত ব্যাপার। চোখ বড়ো বড়ো ক'রে, সে ছুটে এসে ললিতাকে জড়িয়ে ধরেছিল, 'রীয়েলি নাইস। কবে এসেছিস এখানে ?'

'আজই। দু'ঘণ্টা আগে।'

'প্রীতি, সুমন, সুলভাকে দেখেছিস ? শুনেছি ওরাও এখানে ভর্তি হয়েছে—'

এই মেয়ে তিনটিও কিরণদের কনভেণ্ট থেকেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে। ললিতা বলেছিল, 'সুমনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর ঘর ফার্স্ট ফ্লোরে। তবে প্রীতি আর সুলভাকে দেখিনি।'

কিরণ বলেছে, 'চল, ওদের খুঁজে বার করি। হোস্টেলটাও ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।'

পাখির মতো উড়তে উড়তে দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিল। লিফ্টে করে না, সিঁড়ি ভেঙে তর তর করে প্রথমে নেমে এসেছে দোতলায়। সুমনকে তার ঘর থেকে টেনে এনেছিল একতলায়। তারপর আবার উঠে এসেছিল ওপরে। তিনজনে প্রতিটি রুমে হানা দিয়ে যাচ্ছিল এবং ফোর্থ ফ্লোরে এসে প্রীতি এবং সুলভাকে পেয়ে গিয়েছিল।

নতুন জায়গায় পুরনো বন্ধুদের পেয়ে পাঁচ জনেরই ভীষণ ভালো লাগছিল। এক মিনিটও কেউ ঘরে থাকেনি, গোটা হোস্টেল জুড়ে তারা অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করেছে। শুধু তারাই নয়, যে সব নতুন মেয়ে ইণ্ডিয়ার নানা শহর থেকে এসেছে তারাও ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ছিল। করিডরে ঘুরতে ঘুরতে তাদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ করে নিয়েছে কিরণরা, তারাও এগিয়ে এসে আলাপ করছিল।

পাঁচটা ফ্লোরে অনবরত ছোটাছুটি করতে করতে কিরণরা জেনে গিয়েছিল, আধখানা বৃত্তের মতো এই হোস্টেল বিল্ডিংটার সবসুদ্ধু দু'শ ঘর। বড়ো ঘরগুলোয় তিন জন করে থাকার ব্যবস্থা, তুলনায় ছোট ঘরগুলো দু'জনের জন্য। একতলায় রয়েছে কিচেন, বিশাল ডাইনিং রুম। তেতলায় আছে বড়ো হল, সেখানে ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা ছাড়াও একটা মাঝারি স্টেজ এবং রঙিন টি. ভি রয়েছে। আর ছাদে সুপারিনটেনডেণ্ট প্রফেসর মিস হরজিৎ কাউরের কোয়ার্টার্স। এক ঘণ্টার মধ্যেই কিরণরা জেনে গেল, প্রফেসর মিস হরজিৎ কাউর দু' বারের ডিভোর্সী। একবার তাঁর পদবী হয়েছিল সিং, একবার সোন্ধি। দুই স্বামীকে একটি করে ছেলে উপহার দেবার পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি তাঁর কুমারী জীবনের পুরনো পৈতৃক পদবীটি আবার নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দেন।

কিরণ নতুন কলেজে এসেছিল বেলা দশটায়। ঘণ্টা দেড়-দুই ঘোরাঘুরির পর অ্যাটাচড্ বাথে স্নান-টান সেরে নিচের ডাইনিং হল-এ গিয়ে লাঞ্চ সেরে এসেছিল। তারপর সুলভার ঘরে শুরু হয়েছিল আড্ডা, হৈ চৈ, ফোয়ারার মতো হঠাৎ হঠাৎ হাসি।

সেদিন কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো ছিল না, সমস্ত দিনটাই হালকা, ফুর-ফুরে। কেননা ক্লাস শুরু হবে পরের দিন থেকে। হোস্টেলে প্রথম দিনটা 'কেয়ার-ফ্রি মুডে' যা খুশি করে নাও, এইরকম একটা ভাব আর কি।

হুল্লোড় যখন জমে উঠেছে, সেই সময় একটা বেয়ারা এসে খবর দিয়েছিল, সুপারিনটেনডেণ্ট হরজিৎ কাউর নতুন মেয়েদের নিচের বড়ো হল্-এ যেতে বলেছেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেছে, ফাস্ট ইয়ার আর্টস-এ যে এক শ' পঁচিশটি মেয়ে ভর্তি হয়েছিল, সব একতলার হল্-এ স্টেজের সামনের চেয়ারগুলোতে এসে বসেছে। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন হরজিৎ। তিনি ঢুকতেই মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'সিট ডাউন গার্লস' বলতে বলতে হরজিৎ উঁচু মঞ্চে গিয়ে একটা বড়ো গদি-মোড়া চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার শরীরে পর্যাপ্ত মেদ। কোমর বা গলা বলে কোনো বিভাজিকা রেখা নেই, সর্বাঙ্গ জুড়ে তাল তাল চর্বি এবং মাংস, ওয়েট হয়ত এক কুইণ্টালের বেশি। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। পরনে শাড়ি ব্লাউজ, পায়ে পুরু সোলের স্লিপার, ডান হাতের কবজিতে চওড়া স্টীল ব্যাণ্ডে বাঁধা বড়ো চৌকো ঘড়ি।

হরজিৎ কাউরের গলার স্বর তাঁর বিপুল শরীরের তুলনায় বেজায় সরু। মনে হয় অগুনতি চর্বির থাক ঠেলে সেটাকে রাস্তা করে বেরুতে হয়। তিনি প্রথমে এক শ' পঁচিশটি মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। কে কোন প্রভিন্স থেকে এসেছে, তাদের বাবারা কে কী করেন, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড কী ধরনের, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এ সব জেনে নেবার পর বলেছেন, 'আমি তোমাদের দেশের সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস বিদ্যামন্দিরে 'স্বাগত' জানাচ্ছি। তবে এক সপ্তাহ পরে কলেজের তরফ থেকে প্রিন্সিপ্যাল তোমাদের ফর্মাল 'স্বাগত' জানাবেন।

'তোমরা হয়ত শুনেছ, আমি এই হোস্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট। ক'টা বছর আমরা একসঙ্গে থাকব। আশা করি এই কলেজের দেশজোড়া সুনাম এবং মর্যাদার কথা মনে রেখে তোমরা এমন কিছু করবে না যাতে এখানকার শান্তি নষ্ট হয়। তোমরা সবাই রেসপেক্টেব্‌ল ফ্যামিলি থেকে এসেছ। এই কলেজ তোমাদের কাছ থেকে সংযত ভদ্র মধুর আচরণ প্রত্যাশা করে। বাইরের জগতে

তোমরা এই মহান ঐতিহ্যসম্পন্ন কলেজের এক একজন প্রতিনিধি। অ্যামবে-সেডরস অফ দিস গ্রেট ইনস্টিটিউসান। আমার বিশ্বাস এই কথাটা তোমরা সর্বক্ষণ মনে রাখবে। এখানে তোমাদের আরো একবার 'স্বাগত' জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ গালর্স।'

বক্তৃতার স্টাইলে হরজিৎ কাউরের উপদেশমূলক কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ মুকুটনাথের কথা মনে পড়ে গেছে কিরণের। পরিবারের প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর কড়া নির্দেশ, কেউ এমন কিছু করবে না যাতে শান্তি বিপন্ন হয়, পারিবারিক স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়ে। তবে কনভেণ্টে ভর্তি হ'বার সময় সেখানকার মাদার সুপিরিয়র এবং হেডমিস্ট্রেস এ জাতীয় কিছু বলেছিলেন কিনা, কিরণের মনে নেই, কেননা তখন সে খুবই ছোট।

হরজিৎ কাউরের আনুষ্ঠানিক 'স্বাগত' ভাষণের ঠিক পাঁচ ঘণ্টা বাদে এই কলেজের শান্তি এবং স্থিতিবস্থায় মারাত্মক ধাক্কা লাগে। পরে কিরণ শুনেছে এমন ঘটনা কলেজের তিরিশ বছরের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি।

সাড়ে আটটার ডিনার খেয়ে কিরণরা যে যার ঘরে চলে গিয়েছিল। সারা দিন দারুণ উত্তেজনায় কেটেছে। রাতের খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই ঘুম পাচ্ছিল।

ললিতা আর কিরণ আলো নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের হালকা নাইট ল্যাম্প জ্বেলে শুতে যাবে, সেই সময় একটি মেয়ে—পরনে টাইট জিন্স আর শার্ট, চুলে বয়েজ কাট—দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'ফ্রেশার ?'

কিরণরা বলেছে, 'ইয়া। ইউ ?'

'তিন বছর আগে ফ্রেশার ছিলাম। নাউ কাম অন—'

'অর্থাৎ মেয়েটা ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। কিরণরা জানতে চেয়েছে, 'কোথায় যেতে হবে ?'

মেয়েটা বলেছে, 'সেকেণ্ড ফ্লোরে।'

'কেন ?'

'সুপারিনটেনডেন্ট তোমাদের 'স্বাগত' জানিয়েছেন। আমরা সিনিয়ররা এখন তোমাদের 'ওয়েলকাম' জানাব। হারি আপ।'

'এত রাত্রে !'

'নো মোর কোশ্চেন। কাম, কুইক-' মেয়েটা গলার স্বর চড়িয়ে হুকুমের ভঙ্গিতে এবার বলেছে।

আবছাভাবে কিছু একটা টের পেতে শুরু করেছিল কিরণ, হয়ত ললিতাও। একবার ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু বুঝতে পারছিল, না গিয়ে উপায় নেই।

ভয়ে ভয়েই তারা ওই মেয়েটির সঙ্গে সেকেণ্ড ফ্লোরের একটা বিশাল ঘরে এসেছে। এখানে তাদের চেয়ে বড়ো চোদ্দ-পনেরোটা মেয়ে চেয়ারে সোফায় বা বিছানায় বসে ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল তারা সিনিয়র—সেকেণ্ড থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারের। এরা ছাড়া আরো সাত আটটি মেয়ে, কিরণদের বয়সী অর্থাৎ 'ফ্রেশার', একধারে আড়ষ্টের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছে, ওরা খুবই নার্ভাস। সম্ভবত কিরণদের মতোই ওদেরও ঘর থেকে ডেকে আনা হয়েছে।

এই ঘরে সব চেয়ে বেশি করে যাকে চোখে পড়েছে তার পরনে চাপা হট প্যাণ্ট আর স্লীভলেস টাইট শার্ট। প্যাণ্ট এবং শার্ট ফাটিয়ে তার প্রচণ্ড মাংসল উরু এবং বুক যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ডাই-করা লালচে চুল কাঁধের দু'ধারে ঝুলছে, কিছু কিছু এসে পড়েছে মুখের ওপর। চোখে বিরাট এবং গোলাকার ধোঁয়াটে চশমা। হাতে লম্বা সিগারেট।

মেয়েটা কিরণদের চেয়ে অনেক বড়ো। পায়ের ওপর পা তুলে সে বসে ছিল একটা বড়ো সোফায়। চশমার আবছা কাচের ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছিল তার চোখ আরক্ত এবং ঢুলুঢুলু। তার চোখমুখ জানিয়ে দিচ্ছিল সে ড্রাগের শিকার। তার সিগারেট থেকে যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তাতে টোবাকোর গন্ধ ছিল না। অন্য ধরনের অচেনা উগ্র ঝাঁঝালো একটা গন্ধ কিরণের নাকের ভেতর ঢুকে তার স্নায়ু গুলোকে বিকল করে দিচ্ছিল। পরে সে জেনেছে ওটা গাঁজার গন্ধ। সিগারেটের ভেতরকার তামাক বার করে গাঁজা পুরে নেওয়াটা নাকি ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের ভীষণ পছন্দ।

কিরণ এবার লক্ষ করেছে, শুধু ওই মেয়েটাই না, আরো কয়েকটি মেয়ের হাতেও সিগারেট জ্বলছে। ধরমপুরার অচ্ছুত বয়স্ক আওরতেরা যারা খেতে-খামারে কাজ করে, রাস্তা বানায় বা মাটি কাটে তাদের আকছার বিড়ি-টিড়ি খেতে দেখা যায়। কিন্তু কোনো ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, বিশেষ করে ছাত্রীদের এর আগে সিগারেট খেতে দেখেনি কিরণ। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া সে খুব গর্হিত কাজ ব'লে মনে করে না। তবু এমন দৃশ্য তার অনভ্যস্ত চোখ এবং আজন্মের সংস্কারকে ঝাঁকুনি দিয়ে গিয়েছিল।

মেয়েটার বসার উদ্ধত ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টিতে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব—এ সব দেখে মনে হচ্ছিল সে সিনিয়র মেয়েদের লীডার।

সোফার মেয়েটা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে

ঈষৎ জড়ানো গলায় বলেছিল, 'ওয়েলকাম ডার্লিংস। তোমাদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করার জন্য ডেকে এনেছি। কিছু মনে করো না। একসঙ্গে তো সবার সঙ্গে আলাপ করা যাবে না। রোজ দশ জন দশ জন করে ডাকব। আমার নাম শারণ—শারণ বেদী, ফোর্থ ইয়ার।'

তারপরেই একটি নতুন মেয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে, 'য়ু, য়ু—ইওর নেম?' তার কণ্ঠস্বর খসখসে, হাস্কি ধরনের।

যার দিকে কম্পাসের কাঁটার মতো আঙুলটি স্থির হয়ে ছিল সে ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'শমিতা বাসু।'

'বাসু? আই মীন বেঙ্গলি?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্রম ক্যালকাটা?'

'হ্যাঁ?'

'রবীন্দ্রনাথ টেগোর! য়ু—' বলতে বলতে শারণের গলা বুজে এসেছিল, চোখ আরও ঢুলুঢুলু। সে হয়ত বলতে চাইছিল, রবীন্দ্রনাথের শহর থেকে এসেছ? বা ওই জাতীয় একটা কিছু।

শমিতা উত্তর দেয়নি।

একটু পরে রক্তিম চোখ ভালো করে মেলে, যেন এক ঝটকায় গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে শারণ বলেছে, 'স্টার্ট ডান্সিং—ওয়ালজ—'

শমিতা এবং নতুন মেয়েরা সবাই চমকে উঠেছিল। শমিতা ঢোক গিলে বলেছে, 'আমি নাচতে জানি না—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই শারণ চেঁচিয়ে উঠেছে, 'স্টার্ট—'

অগত্যা শমিতা নিজের অজান্তে, প্রচণ্ড ভয়ে এবং যান্ত্রিক কোনো তাড়নায় এলোপাতাড়ি বেতালা পা ছুঁড়তে শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সিনিয়র মেয়েরা হাতে হাতে তালি বাজাচ্ছিল।

শারণ কখনও শমিতাকে কোমর বাঁকাতে, কখনও হাঁটু ভেঙে, পিঠ হেলিয়ে শরীর ঝাঁকাতে, কখনও হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করেছিল। শুধু তা-ই নয়, আরো তিনটে মেয়ের দিকে ফিরে বলেছিল, 'জয়েন হার—'

চারটি মেয়েকে নিয়ে যা খুশি করছিল শারণরা। হঠাৎ একটা লম্বামতো মেয়ে তালি বাজানো থামিয়ে জীনসের পকেট থেকে ছোট কাঁচি বার করে যাদের নাচানো হচ্ছিল তাদের একজনের একগোছা চুল কচাকচ কেটে দিয়েছে।

আরেকটি বড়ো মেয়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে অন্য একটি নতুন মেয়ের জামা পুড়িয়ে ফুটো ফুটো দাগ করে দিচ্ছিল। সিগারেটটা দু-একবার তার কপালে এবং হাতে চেপেও ধরেছে। মেয়েটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়রদের তালি বাজানো, হুল্লোড়বাজি এবং চিৎকার মাত্রা ছাড়া উদ্দাম হয়ে উঠছিল। তারা প্রবল হিস্টিরিয়ার ঘোরে ছিল যেন।

র‍্যাগিং সম্পর্কে আগে কিছু কিছু শুনেছে কিরণ, কিন্তু সেসব পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। এখন চোখের সামনে এই নিষ্ঠুরতা দেখে আতঙ্কে তার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছিল, শিরদাঁড়া বেয়ে গল গল করে ঘাম ছুটছিল। কেননা এটা খুবই স্পষ্ট, শারণরা তাদের ছেড়ে দেবে না। ওই চারটে মেয়ের পর তাদের ওপরও র‍্যাগিং চালানো হবে এবং সেই নিষ্ঠুরতা কী ধরনের হতে পারে, বুঝতে না পেরে তার শ্বাস আটকে আসছিল। মেয়েরা যে এই ধরনের স্যাডিস্ট হ'তে পারে, তার ধারণা ছিল না। অবশ্য এই টরচারের মধ্যে জঘন্য কুৎসিত সেক্সের ব্যাপারটা ছিল না।

কিরণ এবং অন্য নতুন মেয়েরা যখন কুঁকড়ে যাচ্ছে সেই সময় তাদের ভেতর থেকেই কেউ তালির শব্দ এবং হুল্লোড়ের আওয়াজের ওপর গলা চড়িয়ে চিৎকার করেছিল, 'স্টপ, স্টপ দিস ক্রুয়েলটি।'

মুহূর্তে হিস্টিরিয়ার ঘোর থেমে গিয়েছিল। চমকে সবাই যে মেয়েটির দিকে ঘুরে তাকিয়েছে তার টান টান, সতেজ চেহারা স্পোর্টস গার্লদের মতো। নাক মুখ কাটা কাটা, ধারালো। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো হাইট। অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় তার নীলচে চোখের তারা জ্বলছিল। শারণদের দিকে সটান হাত বাড়িয়ে, আঙুল নাচাতে নাচাতে সে বলেছে, 'য়ু আর নো হিউম্যান বীয়িংস, সিম্পলি বীস্টস্।'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর কিছুক্ষণের জন্য বিশাল হোস্টেল বাড়িটায় যেন অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তারপর শারণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। সোজা সেই মেয়েটির চোখের ভেতর তাকিয়ে বলেছে, 'হু আর য়ু? ইওর নেম?' তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, গাঁজার নেশা খানিকটা ছুটে গিয়ে চোখ থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছিল যেন। একটি ফ্রেশার এখানে প্রথম দিন এসেই যে এমন বেপরোয়া ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে, গালাগাল ক'রে সিনিয়রদের বেইজ্জত এবং নাজেহাল করার মতো স্পর্ধা বা দুঃসাহস দেখাতে পারে, কলেজের তিরিশ চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এ জাতীয় আর কোনো রেকর্ড নেই।

মেয়েটি জানিয়েছে তার নাম সুনীতা কুলকার্নি, আসছে বম্বে থেকে।

শারণ বলেছিল, 'মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা দিল্লি।'

'থ্যাংক য়ু ফর দ্য ইনফরমেশন। আমি ভারতের বাইরে থেকে আসছি না। আই অ্যাম অ্যান ইণ্ডিয়ান সিটিজেন। আই হ্যাভ গট এভরি রাইট টু কাম হিয়ার। দিস কলেজ ইজ নট ইওর পেটার্নাল প্রোপার্টি।'

শারণ দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছে, 'কার প্রোপার্টি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আই উড থ্রো ইউ আউট অফ দিস কলেজ।'

সুনীতা বলেছিল, 'য়ু মে ট্রাই।'

শারণ এবং তার সঙ্গিনীদের চোখেমুখে জান্তব রাগ ফুটে বেরিয়েছিল। প্রথমত, র‍্যাগিংয়ে বাধা পড়ায় ক্ষেপে গেছে। নতুন মেয়েগুলোকে নিয়ে সারা রাত দারুণ একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে রেখেছিল তারা, সেটা তো হ'লই না, তার ওপর বম্বের এই মেয়েটা একেবারে চূড়ান্ত নাস্তানাবুদ ক'রে ছেড়েছে।

হিংস্র ভঙ্গিতে শারণরা সুনীতার দিকে এগিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল তারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সুনীতা আদৌ ভয় পায়নি, তার চোখে মুখে নার্ভাসনেসের এতটুকু ছাপ নেই। শরীরটাকে শক্ত করে সে যেন আক্রমণ ঠেকাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এমন কি তেমন কিছু হ'লে সে হয়তো পাল্টা আঘাতও করবে।

একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল কিরণ। তার হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি থমকে গেছে। তবু তারই মধ্যে অসীম বিস্ময়ে সে সুনীতার দিকে তাকিয়ে ছিল। এই মেয়েটার অনমনীয়তা সাহস এবং ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে এক ধরনের অচেনা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিচ্ছিল। নিজের অজান্তে অস্পষ্টভাবে একটা বোধ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। পরে জেনেছে সেটার নাম শ্রদ্ধা।

মারাত্মক কিছু ঘটার আগেই কী এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আচমকা স্থলভার গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা জোরালো সংক্রামক রোগের মতো নতুন মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এতগুলো মেয়ের মিলিত চেঁচামেচিতে হোস্টেলের ভিত নড়ে গিয়েছিল যেন।

শারণরা ভাবতে পারেনি এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে। তারা হকচকিয়ে যায়, কিন্তু নতুনদের চিৎকার থামে না। ফলে এক সময় হরজিৎ কাউরের ঘুম ভেঙে যায় এবং একশ' কিলোগ্রাম ওজনের বিপুল শরীর টানতে টানতে নিচে নেমে আসেন তিনি।

পনেরো বছর তিনি এই হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট। কিন্তু রাত ন'টার পর কোনোদিন তাঁকে নিচে নামতে হয়নি। অত্যন্ত বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট মুখে হরজিৎ কাউর জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কী হয়েছে, কী ব্যাপার? এত গোলমাল কিসের?'

গোলমালের কারণটা জানিয়ে দিয়েছিল সুনীতা।

হরজিৎ কাউরের বিরক্তি তিন চারটে লেভেল পেরিয়ে রাগের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি খুবই উত্তেজিত এবং চড়া গলায় জানিয়েছেন, এই সামান্য 'ইনসিগনিফিকান্ট' ব্যাপার নিয়ে কলেজের 'ডিগনিটি' নষ্ট করা ঠিক নয়। এটা স্লাম নয়। তাছাড়া সিনিয়ররা হয়ত একটু মজা করতে চেয়েছে। তাদের রেসপেক্ট দেওয়া নতুনদের কর্তব্য।

'যাও, নিজের নিজের ঘরে চলে যাও। আর যেন কোনোরকম হৈচৈ না হয়।' বলে ফের ছাদে উঠে গেছেন হরজিৎ।

সুনীতা কিন্তু নিজের ঘরে যায়নি। কিরণরা ক'জন ত সঙ্গে ছিলই, প্রতিটি ফ্লোর থেকে নতুন মেয়েদের ডেকে নিচের হল্-এ চলে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'শারণদের নামে কমপ্লেন ক'রে কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। সুপারিনটেনডেন্ট ওই বীস্টগুলোকে রেসপেক্ট দেখাতে বললেন। কিন্তু আমি ছাড়ছি না। একটা প্রোটেস্ট করতেই হবে। তোমরা আমার সঙ্গে থাকছ ত?'

কয়েকটি মেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু কলেজ অথরিটি যে চটে যাবে?'

'যায় যাবে। কিন্তু এরকম একটা ডার্টি গেম চুপচাপ মেনে নেওয়া যায় না।'

সবাই চুপ। অনেকক্ষণ বাদে একটি মেয়ে হঠাৎ বলেছিল, 'যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'থ্যাংক য়ু।'

'কিন্তু কী করতে চাও তুমি?'

সুনীতা এবার তার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। পরের দিন তাদের নতুন সেশান শুরু হবে। কিন্তু কেউ ক্লাসে না গিয়ে র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে ক'টা পোস্টার লিখে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের সামনে 'সিট-ইন' স্ট্রাইক করবে।

আরো ক'টি মেয়ে এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তারাও 'অবস্থান ধর্মঘটে'র সময় সুনীতার পাশে থাকতে রাজী। ক্রমে আরো অনেকের সাহস বাড়ছিল। তা ছাড়া একসঙ্গে নতুন কিছু একটা করার উত্তেজনাও আছে। সবসুদ্ধ সত্তর আশিটি

মেয়ে পেয়ে গিয়েছিল সুনীতি। বাকিরা তখনও দ্বিধান্বিত এবং বেশ ভীতও। স্ট্রাইকের ফলাফল কতটা বিপজ্জনক হ'তে পারে, তারা ভেবে উঠতে পারছিল না।

প্রথম থেকেই সুনীতা চোরা স্রোতের মতো প্রবল আকর্ষণে কিরণকে তার দিকে টানছিল। এই জেদী অদম্য একগুঁয়ে মেয়েটাকে যত দেখছিল ততই আকর্ষণটা তীব্র হচ্ছিল। সে-ও জানিয়ে দিয়েছে, 'সিট-ইন' স্ট্রাইকে থাকবে।

সেই রাতে পনেরো কুড়িটা পোস্টার লিখে ফেলা হয়েছিল। তাতে ইংরেজিতে লেখা : র‍্যাগিং বন্ধ করতে হবে, র‍্যাগিং এক ধরনের অমানুষিক বর্বরতা, ইত্যাদি।

পরের দিন দশটা বাজতে না বাজতেই দেখা গিয়েছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের গেটের উলটোদিকে সবুজ ঘাসের জমিতে একশ' পঁচিশটি মেয়েই পোস্টার নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আগের দিন রাতেও যে ক'টি মেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল, পরের দিন সকালে তাদের দ্বিধা কেটে গেছে। 'সবার যা হবে, আমারও তা-ই হবে'—এরকম একটা মনোভাব তাদের।

সুনীতার মধ্যে কোথাও একটা ম্যাজিক ছিল। নইলে দেশের নানা প্রভিন্স থেকে যে সব মেয়ে সবে এখানে এসেছে, কেউ কাউকে আগে গ্যাখেনি পর্যন্ত, তারা ওর ডাকে 'সিট-ইন স্ট্রাইক' করতে আসবে কেন? খুব সম্ভব এটাই স্বাভাবিক এবং সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা।

সামনের রাস্তা দিয়ে অফিসের লোকজন, অধ্যাপিকা এবং পুরনো ছাত্রীরা নানা কাজে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। তাদের কারো কপাল বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে, কারো চোখে ছিল অপার বিস্ময়। কেননা, এই কলেজের একটানা চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এমন দৃশ্য কখনও দেখা যায়নি।

ঘণ্টাখানেক বাদে ধবধবে ইউনিফর্ম পরা একটি বেয়ারা শশব্যস্তে এসে বলেছিল, 'প্রিন্সিপ্যাল আপনাদের ডাকছেন।'

তখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের দোতলায় তাঁর নিজস্ব স্পেশাল চেম্বারেই ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। বেয়ারা একশ' পঁচিশটি আনকোরা মেয়েকে সোজা সেখানে পৌঁছে দিয়েছে, 'ভেতরে যান।'

কার্পেটে-মোড়া চেম্বারটি বিশাল, দুই দেয়ালে এয়ার-কুলার বসানো। মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে প্রকাণ্ড গ্লাস-টপ টেবল। টেবলের ওপর এক ধারে চার পাঁচটা রঙিন টেলিফোন, আরেক ধারে স্তূপাকার ফাইল। পেছনে গোটা দেয়াল কেটে ভেতরে বইয়ের র‍্যাক বসানো, সামনে কাচ। এনসাইক্লো-

পিডিয়া থেকে শুরু করে হিস্ট্রি সোসিওলজি পলিটিকস ফিলজফি, এমন নানা বিষয়ের দামী দামী অসংখ্য বই সাজানো।

টেবলের ওপাশে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল, এপাশে অনেকগুলো সুদৃশ্য চেয়ার।

প্রিন্সিপ্যালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে জবরদস্ত পুরুষালী চেহারা। কাঁচা পাকা চুলের ছাঁটও পুরুষদের মতোই। চওড়া কাঁধ, ভারী মাংসল মুখ, জোড়া ভুরু। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

তাঁর নাম মধুর খান্না। পরনে যদিও ধবধবে শাড়ি-ব্লাউজ, তবু মহিলাসুলভ মাধুর্যের ছিটেফোঁটাও নেই তাঁর স্বভাব বা আকৃতিতে। তিনি যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তাকানো মাত্র স্নায়ুগুলো তা টের পেয়ে যায়।

মেয়েরা অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। সবাই না, তিরিশ চল্লিশ জন। বাকিরা দরজার বাইরে করিডরে শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছিল। কেননা, চেম্বারটা বড়ো হলেও একশ' পঁচিশ জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

প্রিন্সিপ্যাল মধুর খান্না থমথমে মুখে, মোটা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, 'হু ইজ সুনীতা কুলকার্ণি ?'

সবার সামনে, প্রিন্সিপ্যালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল সুনীতা। সে বিনীত ভঙ্গিতে বলেছে, 'আমি ম্যাডাম।'

বোঝাই যাচ্ছিল, র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে নতুন মেয়েদের উস্‌কে দিয়ে এবং তাদের জড়ো করে সুনীতাই যে মুভমেণ্ট শুরু করেছে, এ খবর প্রিন্সিপ্যালের কাছে পৌঁছে গেছে।

প্রিন্সিপ্যাল এবার বলেছেন, 'দিস ইজ দা বেস্ট এডুকেসনাল ইনষ্টিটিউসান ইন দা কাণ্ট্রি, সেরা বিদ্যামন্দির। এটা ট্রেড ইউনিয়ন শেখার ট্রেনিং সেণ্টার নয়। আমি ভাবতে পারি না, এখানকার স্টুডেণ্টরা কারখানার ওয়ার্কারদের মতো পোস্টার নিয়ে 'সিট-ইন' স্ট্রাইক করছে!' একটু থেমে রুমালে চশমার কাচ মুছে ফের চোখে লাগাতে লাগাতে বলেছেন, 'তোমরা এবারের নিউ-কামাররা ট্রাব্‌ল-মেকার হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি কিছুতেই এ সব সহ্য করব না।' মধুর খান্নার গলার স্বর সারা চেম্বারে গম গম করছিল।

সুনীতাদের সঙ্গে কিরণও ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। মধুর খান্নার মতো এমন প্রবল ব্যক্তিত্ব অন্য কোনো মহিলার মধ্যে ত নয়ই, কোনো পুরুষের মধ্যেও আগে দ্যাখেনি সে। ভয়ে বুকের ভেতরটা জমাট বেঁধে যাচ্ছিল। মনে হয়েছে

ঝোঁকের মাথায় স্থনীতার সঙ্গে মুভমেণ্টে নেমে পড়া ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন আর ফেরা যায় না। স্থনীতা বলেছিল, 'আমরা যা করেছি তার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক নেই। শুধু র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট জানাতে চেয়েছি।'

কিরণ এবার স্থনীতার দিকে তাকিয়েছে। মনেই হয়নি, দেশের সব চেয়ে বিখ্যাত সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস কলেজের দুর্ধর্ষ প্রিন্সিপ্যালের সামনে দাঁড়িয়ে সে আদৌ নার্ভাস হ'য়ে পড়েছে। তার কণ্ঠস্বর স্বচ্ছন্দ, আচরণ স্বাভাবিক। যথেষ্ট বিনীত হ'লেও তার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যা নোয়ানো প্রায় অসম্ভব। স্থনীতাকে দেখতে দেখতে কিরণ আবার হারানো সাহস ফিরে পাচ্ছিল।

স্থির চোখে অনেকক্ষণ স্থনীতাকে লক্ষ করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। তারপর হঠাৎ অবিশ্বাস্য একটি প্রশ্ন করেছেন, 'তোমার বাবা কী করেন?'

একটি বিখ্যাত পোলিটিক্যাল উইকলি'র নাম করে স্থনীতা জানিয়েছে তার বাবা স্থরেশ কুলকার্ণি এর সম্পাদক এবং প্রকাশক।

গোটা দেশ জুড়ে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব। এর প্রতিটি সংখ্যায় এমন সব চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনার খবর, অন্তর্তদন্ত এবং বিশ্লেষণ থাকে যা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। বারুদে বোঝাই এই সব তথ্য এক-একদিন লোকসভা রাজ্যসভা বা কোনো কোনো প্রদেশের বিধানসভার আবহাওয়া সরগরম করে তোলে। তার উত্তাপ ছড়িয়ে যায় গোটা দেশে।

স্থরেশ কুলকার্ণি খ্যাতিমান এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ। পোলিটিক্যাল সার্কেলে যথেষ্ট প্রভাবশালীও।

সাপ্তাহিকটি এবং তার সম্পাদকের নাম শুনে প্রিন্সিপ্যালের মুখের কাঠিন্য অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে। শক্ত পেশীগুলিতে দেখা দিয়েছে নমনীয়তা। ঈষৎ নরম গলায় এবার তিনি বলেছেন, 'তোমাদের হয়ত বুঝতে ভুল হয়েছে। আমার ধারণা, থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের মেয়েরা তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করেছে। প্রতি বছরই নতুন মেয়েদের সঙ্গে ওরা আনন্দ-টানন্দ ক'রে থাকে। এটাকে 'জোক' বলে ধরে নাও।'

'জোক না, এটা টরচার। আপনাকে একটা ব্যাপার দেখাই।' সেই মেয়েটিকে—যার নাম চিত্রা রত্নম. যার জামায় এবং গায়ে আগের রাত্তিরে অগুনতি সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে—প্রিন্সিপ্যালের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল স্থনীতা। বলেছিল, 'এগুলো নিশ্চয়ই আনন্দের চিহ্ন নয়।'

স্থনীতাকে যত দেখছিল, বিস্ময় এবং বিমূঢ়তা ততই বেড়ে যাচ্ছিল কিরণের।

বেশির ভাগ মানুষেরই শিরদাঁড়া বলতে কিছু থাকে না। কেঁচো বা কেন্নোর মতো আজন্ম মাটিতে মিশেই আছে, কিন্তু এই মেয়েটা একেবারেই আলাদা। শক্ত ধাতুতে তৈরি তার মেরুদণ্ডটি খুবই জোরালো।

সুনীতা আবার বলেছে, 'এই কলেজের সিনিয়র মেয়েরা এক একটি জন্তু। বয়েসে যারা ছোট তাদের সম্বন্ধে এক ফোঁটা সিমপ্যাথি নেই। ম্যাডাম, আপনি হয়ত জানেন না এদের বেশির ভাগই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, কাল রাত্তিরে সিগারেটের ভেতর গাঁজা পুরে খাচ্ছিল।'

প্রিন্সিপ্যালের মুখে আগের সেই কঠোরতা ফিরে আসছিল। গমগমে গলায় তিনি বলেছেন, 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু মনে রেখো, তোমাদের কোনোরকম ইনডিসিপ্লিন বরদাস্ত করব না। এরপর এরকম কিছু করলে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হবে।

কিরণ লক্ষ করেছে, র‍্যাগিং বন্ধ করার কথা একবারও বলেননি প্রিন্সিপ্যাল। পরে সে জেনেছে, তাঁর পক্ষে এটা একেবারেই সম্ভব না। হয়ত নিজের চাকরির নিরাপত্তার জন্যও র‍্যাগিংয়ের ব্যাপারে তাঁকে চোখ বুজে থাকতে হয়েছে।

কিরণ পরে জেনেছে, সেই মেয়েটি অর্থাৎ শারণ বেদি, পাঞ্জাবের এক মন্ত্রীর শালী। র‍্যাগিংয়ের অন্য নাটের গুরুরা কেউ বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের নাতনী, কেউ এম. পি'র মেয়ে, কেউ টপ পুলিশ অফিসার বা লেফটেনাণ্ট কর্ণেল কিংবা কোনো গভর্নরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এদের গায়ে টোকা দিলে নিজের চামড়া বাঁচানো যাবে না।

প্রিন্সিপ্যাল এবার বলেছেন, 'তোমরা এখন যেতে পার। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, এই ইনস্টিটিউসানের শান্তি কখনও কোনো কারণেই নষ্ট হয়নি, ভবিষ্যতেও যেন না হয়।

ক'দিন বাদে নবাগত ছাত্রীদের কলেজের তরফ থেকে যে আনুষ্ঠানিক 'ওয়েল-কাম' জানানো হয়েছিল, তার স্বাগত ভাষণে প্রিন্সিপ্যাল এই 'শান্তি' ব্যাপারটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কোনো কারণেই যাতে শান্তিভঙ্গ না ঘটে, সে বিষয়ে প্রতিটি নতুন মেয়েকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। শুনতে শুনতে বাবার কথা মনে পড়ে গেছে কিরণের। প্রিন্সিপ্যালের গলার ভেতর থেকে মুকুটনাথের কণ্ঠস্বর যেন বেরিয়ে আসছিল। শান্তি যাতে অটুট থাকে সে জন্য এঁদের সতর্কতা এবং উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

পরে কিরণ জেনেছে এবং বুঝতে শিখেছে বিশেষ কোনো কোনো ক্লাসের

স্বার্থে এবং দীর্ঘকালের সযত্ন ও স্থচারু অভ্যাসে যা কিছু এস্টাব্লিশড্ বা প্রতিষ্ঠিত, যেমন সংস্কার, নিয়ম, পলিসি, কালচার অথবা বানানো মূল্যবোধ—এসবের গায়ে হাত পড়ুক স্থবিধাভোগীরা তা একেবারেই চায় না। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ যা চলছে চলুক, স্থিতাবস্থা বজায় থাক, এস্টাব্লিশমেণ্টের বিশাল চিরস্থায়ী সৌধে যেন আঁচড় না লাগে। অশান্তি উত্তেজনা আন্দোলন, এ সব বাঞ্ছনীয় নয়। চিরকাল অপার প্রশান্তি বিরাজমান থাকুক।

একটা ব্যাপার কিরণ এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারে, সিনিয়র মেয়েরা তাদের আর মধ্যরাতে টানাটনি করেনি। সে বছর নিউ-কামাররা র‍্যাগিংয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। হয়ত প্রিন্সিপ্যাল ওদের ডেকে কিছু বলেছিলেন।

তবে র‍্যাগিং বন্ধ করলেও দেখা হলেই সিনিয়র মেয়েরা দাঁতে দাঁত চেপে ইয়াংকি উচ্চারণে নোংরা খিস্তি করে যেত। কিরণরা অবশ্য উত্তর দিত না।

সেদিনের 'সিট-ইন স্ট্রাইকে'র পর স্থনীতার মুগ্ধ ফ্যান হয়ে উঠেছিল কিরণ। সময় পেলেই সে স্থনীতার ঘরে চলে যেত। ওর সঙ্গ কী ভাল যে লাগত! ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবাক বিস্ময়ে আচ্ছন্নের মতো তার কথা শুনে যেত। স্থনীতার প্রতি তার আনুগত্য ছিল পুরোপুরি শর্তহীন।

স্থনীতা প্রায়ই তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলত। ইকনমিকসে ডিগ্রি নিয়ে সে আমেরিকায় যাবে। সেখানে রীসার্চ করার ইচ্ছা। তারপর দেশে ফিরে বাবার পোলিটিক্যাল উইকলিতে জয়েন করবে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে বাবার। তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর পাশে দাঁড়ানো খুবই জরুরি, কেননা স্থনীতাই তাঁর একমাত্র সন্তান। সে কাগজের দায়িত্ব না নিলে ওটা অবশ্যই উঠে যাবে। শুধু দায়িত্ব নেওয়াই না, উইকলিটা আরো বড়ো করতে হবে, এজন্য ব্যাপক প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন। স্বাধীনতার পরও অর্থনৈতিক শোষণ চলছে দেশ জুড়ে, সামাজিক স্তরে চলছে বিরাট বৈষম্য। তাদের সাপ্তাহিক ব্যাপকভাবে এসব তুলে ধরবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক খবর ত থাকবেই। জোরটা বেশি দেওয়া হবে রুরাল ইণ্ডিয়া বা গ্রামীণ ভারতের ওপর, যেখানে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। গ্রামীণ অর্থনীতি, সেখানকার ভূমি সমস্যা, বণ্ডেড লেবারার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অনিশ্চিত জীবিকার লোকজন, এমনি নানা বিষয়ের ওপর প্রচুর কাজ করতে হবে। সত্যিকারের দেশ এবং তার রুট সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন।

শুনতে শুনতে কিরণ একেবারে হাঁ। স্থনীতার কথাগুলো তার মাথার কয়েক

মাইল ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেত। এসব যেন কোন সুদূর অচেনা গ্রহের সাংকেতিক ভাষা—দুর্জ্ঞেয় এবং বিভ্রান্তিকর।

এই মেয়েটা, তারই সমবয়েসী, অথচ দেশকাল এবং মানুষ সম্পর্কে কত কিছু জানে, কত কিছু ভাবে। আর কিরণ যেন এক চিরকালীন গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে।

একদিন সুনীতা হেসে হেসে বলেছে, 'সারাক্ষণ আমি একাই ত বকে যাই। তোমার কথা কিছু বল। এম. এ করার পর রীসার্চ করবে নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ গভীর বিষাদে মন ভরে যেত কিরণের। কী করে সে বলে, একটি ঘি-মাখন খাওয়া নশ্বর অপদার্থ ছোকরার স্ত্রী এবং একজন ভাবী মন্ত্রীর উপযুক্ত পুত্রবধূ বানাবার জন্য তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। বলা যায়নি, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণাই তার নেই। আবছা গলায় সে শুধু বলেছে, 'দেখা যাক।' বলতে বলতে হঠাৎ মনে হয়েছে, মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ তাকে মাঝখানে রেখে যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিটা করেছেন তার মতো অসম্মানজনক ব্যাপার কিছু হ'তে পারে না। যেন তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ব্যক্তিত্ব নেই, তার সমস্ত কিছুই দু'টি স্বার্থপর মানুষ এবং দু'টি পরিবারের খেয়ালখুশিতে নিয়ন্ত্রিত। তার স্নায়ু ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। আর সেই মুহূর্তে নিজের অজান্তে তার অস্তিত্বের গভীরে কিসের যেন একটা বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল।

এই কলেজে নিয়মিত ক্লাস করা ছাড়াও এলিট সোসাইটিতে মেলামেশা এবং কথা বলার কৌশল শেখানো হ'ত। যাদের ইংরেজি উচ্চারণে কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে তা শুধরে দেওয়া হ'ত। মাঝে মাঝে পপ্ সং. পপ্ মিউজিকের আসর বসানো হ'ত। বাইরে থেকে ফ্যাশান এক্সপার্টদের এনে কোন ঋতুতে, কোন পার্টিতে বা পরিবেশে কী জাতীয় পোশাক পরা বাঞ্ছনীয়, বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সবের সঙ্গে সিলেবাসের সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যতে স্বামীদের সঙ্গে যাদের বিরাট বিরাট পার্টিতে যেতে হবে, থাকতে হবে বিদেশের দূতাবাসে, ক্যান্টনমেণ্টে কিংবা মিশতে হবে দেশবিদেশের সুউচ্চ সোসাইটিতে, তাদের নিখুঁত সোসিয়েলাইট বানাবার জন্য সব দিক থেকে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

সব কিছুই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলছিল। তার পাশাপাশি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের মেয়েরা রাত ন'টার পর হোস্টেলে গাঁজা, হেরোইন, স্ম্যাক এসব খেয়ে

যাচ্ছিল এবং বেশ কিছু নতুন মেয়ে তাদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছিল।

কিরণ একদিন বলেছে, 'জানো, ওরা ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েদের ব্রাউন স্যুগার খেতে শেখাচ্ছে। কিছু করা দরকার।' তাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

সুনীতা কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয়নি। সে বলেছে, 'যারা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হচ্ছে তারা জেনেশুনেই হচ্ছে। কেউ বাচ্চা নয়, তুমি আমি কী করতে পারি!'

কিরণের কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সুনীতা পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় এবং নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু ওর উত্তরটা তাকে কিছুটা হতাশই করেছে।

কিরণের মনোভাব চট করে বুঝে নিয়ে সুনীতা এবার বলেছে, 'সেদিন শুনলে ত, প্রিন্সিপ্যালকে সিনিয়রদের গাঁজা খাওয়ার কথা বলেছিলাম। উনি সে সম্পর্কে একটি কথাও না বলে উলটে আমাদেরই ধমকালেন। এখন ড্রাগের ব্যাপার নিয়ে যদি হৈ চৈ করি, উনি বলবেন, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্টের মতো ঝামেলা পাকাচ্ছি। কোনো লাভ নেই—বুঝলে?'

সুনীতাকে দেখার পর থেকে কিরণের মধ্যে সারাক্ষণ একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে টের পাচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে তার অনেক ভাঙচুর এবং পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছুদিন আগেও সে সব কিছুকে ভয় পেত। তার ভয় ঠাকু-মাকে, পারিবারিক ডিকটেটর মুকুটনাথকে, বংশানুক্রমিক সংস্কারকে, শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণত্বের অনড় গোঁড়ামিকে। এই ভয়টা তার কাছে, শুধু তার কাছেই না, মিশ্র বংশের মেয়েদের চোখে একটা ধর্মবিশ্বাসের মতো ব্যাপার। বলা যায়, ভয়ের 'কাল্ট'-এর মধ্যেই তার জন্ম এবং সেই আবহাওয়াতেই সে বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু সুনীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে তার চারপাশ থেকে ভয়ের শক্ত খোলাটা ভেঙে যাচ্ছিল।

কিরণ বলেছে, 'কিন্তু কিছু ত করা দরকার।'

সুনীতা কিছুক্ষণ ভেবে বলেছে, 'যারা ড্রাগ অ্যাডিকসানের বিরুদ্ধে, তাদের সিগনেচার নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠাতে পারি।'

'গুড আইডিয়া।'

সেদিনই 'সিগনেচার ক্যামপেন' শুরু হয়েছিল এবং প্রচুর সই-টই যোগাড় করে প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠানো হয়েছে। পরের দিন প্রিন্সিপ্যাল তাদের ডাকিয়ে বলে দিয়েছেন, নিজেদের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারেই তারা

যেন মাথা না ঘামায়। কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেসান্ যা ভাবার ভাববে, যা করার করবে। ছাত্রীদের একমাত্র করণীয়, নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা। সিনিয়র মেয়েরা কিরণদের যাতে উত্যক্ত না করে সেটা তিনি দেখবেন।

কিন্তু স্থিতাবস্থা এবং শান্তিতে বিশ্বাসী কলেজ প্রশাসন আর প্রিন্সিপ্যাল ড্রাগ অ্যাডিকসানের বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তোলেননি। সুতরাং রাত ন'টার পর হোস্টেল বিল্ডিংগুলো স্ম্যাক হেরোইন এবং গাঁজার দখলেই থেকে যাচ্ছিল।

সুনীতা বলেছিল, 'দেখলে ত, প্রিন্সিপ্যাল কোনো স্টেপই নিলেন না। আমি একটা কথা ভাবছিলাম, তাতে অবশ্য রিস্ক আছে।'

কিরণ জিজ্ঞেস করেছে, 'কী ভাবছ?'

সুনীতা বলেছে, 'কলেজের অবস্থা ডিটেলে জানিয়ে বাবাকে চিঠি লিখব কিনা। এখানকার খবর তাঁর কাগজে বেরুলে কিছু একটা হ'তে পারে। তবে প্রিন্সিপ্যাল আমাকে নিশ্চয়ই কলেজ থেকে বার করে দেবেন।' একটু থেমে বলেছে, 'আর কিছুদিন দেখাই যাক, কী বল?'

সুনীতা কলেজ ছেড়ে চলে যাবে, এটা ভাবতে পারছিল না কিরণ। সে তক্ষুণি বলেছে, 'সেই ভালো।'

কিরণরা সেই যে 'সিট-ইন স্ট্রাইক' করেছিল তার কয়েক মাস বাদে আবার শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটল। ওদের কলেজের পাঁচশ' গজের মধ্যে ছেলেদের একটা কলেজ আছে। দেশ জুড়ে সেটারও খুব নাম, প্রচুর গ্ল্যামার। সারা ইণ্ডিয়ার বিরাট বিরাট ফ্যামিলির ছেলেদের ওখানে পাঠানো হয়।

স্বাধীনতার আগে কঠোর ডিসিপ্লিন, শিষ্টাচার এবং ভালো রেজাল্টের জন্য এই কলেজ ছিল দেশের সেরা ইনস্টিটিউসানগুলোর একটা। স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েক বছর এই ট্রাডিসান বজায় ছিল। কিন্তু ততদিনে পোস্ট ইণ্ডিপেনডেন্স দেশপ্রেমিকদের একটা জেনারেসন তৈরি হয়ে গেছে, যাদের ত্যাগ বা স্যাক্রিফাইস বলতে কিছুই নেই। রাজনীতি স্বাধীন ভারতের সব চেয়ে লাভজনক 'ইণ্ডাস্ট্রি' বলে এরা এদিকে ঝুঁকছে। এই ইণ্ডাস্ট্রি উৎপাদন করেছে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, কালো টাকার প্যারালাল ইকনমি। এই সব নতুন দেশসেবী এবং তাদের সঙ্গীরা, রাতা-রাতি এক জেনারেসনেই টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে। আজকাল এদের ফ্যামিলি থেকে ছেলেরা আসছে ওই কলেজে। ফলে আগেকার পুরনো আবহাওয়া পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। গ্ল্যামার অনেক গুণ বেড়েছে ঠিকই, রেজাল্টও হয়ত

ভালই হয়, কিন্তু ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। ড্রাগ-অ্যাডিক্ট নয়, এমন একটি যুবককে খুব সম্ভব ওখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওখানকারই ক'টা ছেলেকে পুলিশ ব্রথেলে মারামারি করার জন্য একবার ধরে নিয়ে যায়। আরেক বার কলগার্ল নিয়ে কী একটা কেলেঙ্কারিতে ওদের কয়েকজন জড়িয়ে পড়ে। আরেক বার ওই কলেজের চারটি ছেলে রাস্তা থেকে জোর ক'রে দুটো মেয়েকে গাড়িতে তুলতে গিয়ে লোকজনের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। একটি ছেলে নাকি রেপ এবং মার্ডার কেসেও ফেঁসে গিয়েছিল। এই নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালিখি, হৈচৈ হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্য কোনো আঙুলের ইঙ্গিতে সব চাপা পড়ে যায়।

হঠাৎ একদিন রাতে এই কলেজের ছেলেরা বেদম ড্রিংক ক'রে, পুরোপুরি উলঙ্গ হ'য়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে কিরণদের কলেজের গেট টপকে ঢুকে পড়েছিল। এই ছেলেদের ক'জন এমনই বজ্জাত, এমনই নটোরিয়াস যে সারা দিল্লি তাদের চেনে। শুধু মাতাল ড্রাগ-অ্যাডিক্টই না, ছুরি এবং রিভলবার চালাতেও তারা ওস্তাদ।

ওদের দেখামাত্র দারোয়ান-টারোয়ানরা পালিয়ে গিয়েছিল। বেয়ারাগুলো ঝাঁক বেঁধে কলেজ কমপাউণ্ড থেকে কোথায় উধাও হয়েছিল, কে জানে।

ছেলেগুলোর টার্গেট মেয়েদের হোস্টেল। অন্য বিল্ডিং-এ কী হয়েছিল কিরণ জানে না। তবে তাদের ব্লকের মেয়েরা চিৎকার এবং ড্রামের কান ফাটানো আওয়াজে উঠে পড়েছিল এবং মাঝরাতে এতগুলো মাতাল নেকেড হিংস্র নেকড়েকে দেখে মারাত্মক ভয়ে প্রথমটা একেবারে সিঁটিয়ে যায়, তারপরই বেশির ভাগ মেয়ে কাঁদতে শুরু করে। শুধু দু-চারটে সিনিয়র মেয়ে স্ম্যাকের নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে অদ্ভুত হেসে বলেছে, 'ডরনেকা ক্যা হায়? আনে দো শালে লোগকো। 'ফান' বহুত জমেগা।' ইংরেজির পাশাপাশি এখানে হিন্দিটাও চলে।

সেক্সি মেয়েগুলোকে সুনীতা প্রচণ্ড ধমকে দেয়, 'শাট আপ বিচ। বিলকুল মুহ্ বন্ধ্।'

তারপরেই কিরণ এবং আরো ক'টি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি ফ্লোরের সিঁড়ির মুখে ভারী ভারী তালা ঝুলিয়ে চলে যায় ছাদে। কিন্তু একটানা মিনিট তিনেক কলিং বেলের সুইচ টিপে এবং গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি ক'রেও সুপারিন-টেনডেণ্ট হরজিৎ কাউরের ঘুম ভাঙাতে পারে না।

অগত্যা সুনীতা থানায় ফোন করার জন্য কিরণকে নিচে পাঠিয়ে দেয়। পাঁচ মিনিট পর ফের ছাদে এসে কিরণ দেখতে পায় সুনীতারা কার্নিসের ওপর দিয়ে

ঝুঁকে আছে। সেখানে আসতেই রাস্তার জোরালো ফ্লুয়োরেসেণ্ট আলোয় যে দৃশ্যটি চোখে পড়ে তাতে তার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যাট ফুট নিচে বারো চোদ্দটি ছেলে সিটি দিয়ে দিয়ে এবং ড্রাম বাজিয়ে, অশ্লীল কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে নেচে চলেছে। বাকি হোস্টেল বিল্ডিংগুলোর সামনেও সেই একই দৃশ্য।

একেবারে থ হয়ে যায় কিরণ। এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ দিকে একটি স্বাধীন দেশের (যে দেশের পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সিভিলাইজেসনের একটা পশ্চাৎপট আছে) ক'টি ছাত্র মেয়েদের হোস্টেলের সামনে এভাবে নাচতে পারে, এ যেন ভাবা যায় না। মনে হচ্ছিল, সেই রাত্রে দিল্লি শহর কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে আদিম বর্বর যুগে ফিরে গেছে।

কদর্য হুল্লোড় করতে করতে হঠাৎ ছোকরাগুলো কিরণদের দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো বেপরোয়া হ'য়ে ওঠে। দু'হাত তুলে তারা জড়ানো মাতাল গলায় চেঁচাতে থাকে, 'জাম্প ডারলিং, জাম্প।' বলতে বলতেই একটা ছোকরা টলতে টলতে রেন-ওয়াটার পাইপের কাছে ছুটে আসে। উদ্দেশ্য, পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে আসবে।

কিরণরা ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সুনীতাকে বলে, 'কী হবে এবার ?'

সুনীতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখের তারা স্থির। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলেছে, 'নিচ থেকে চেয়ার টেবল যা পাও নিয়ে এস।'

তক্ষুণি অনেকগুলো চেয়ার টেবল সোফা ইত্যাদি ছাদে চলে আসে। সেই ছোকরাটা পাইপ বেয়ে কয়েক ফুট উঠে এসেছে। সুনীতা একটা চেয়ার তুলে তার দিকে ছোঁড়ে কিন্তু তাকটা ফসকে যায়। না লাগাতে পারলেও এতে ম্যাজিকের কাজ হয়। ছোকরার মাতলামি তৎক্ষণাৎ অনেকখানি ছুটে যায় এবং এরপর তার মাথাটাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আরো কিছু পড়তে পারে এই অনুমানশক্তি কাজে লাগিয়ে পলকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। আর তখনই একটা পুলিশ ভ্যান গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে কলেজ কমপাউণ্ডে ঢোকে। কারা ভ্যানটার জন্য গেট খুলে দিয়েছিল, কে জানে।

পুলিশ দেখামাত্র মাতাল উলঙ্গ ছোকরাগুলো নর্দমার ভীতু ইঁদুরের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগিয়েছে এবং যে যেদিক দিয়ে পারে বাউণ্ডারি ওয়াল টপকে উধাও হ'য়ে গেছে।

পুলিশের গন্ধ পেয়ে এবার প্রিন্সিপ্যাল আর তিনটে হোস্টেলের সুপারিন-টেনডেণ্টদের দেখা গিয়েছিল। ছাত্রীরাও হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। গোটা

কলেজ জুড়ে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা, চাঞ্চল্য। একজন মধ্যবয়সী পুলিশ অফিসার ভ্যান থেকে নেমে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে পনেরো ষোল জন আর্মড পুলিশ এসেছে তারা আগেই মাতাল ছোকরাগুলোকে তাড়া করে গিয়েছিল কিন্তু একটাকেও ধরতে না পেরে ফিরে এসেছে।

অফিসার জানিয়েছিলেন, মাঝরাতে ফোন পেয়ে তাঁরা ছুটে এসেছেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনারা কি ওই বদমাস ড্রাংকার্ডগুলোকে চিনতে পেরেছেন? তা হ'লে অ্যারেস্ট করতে সুবিধা হবে।'

প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন, 'আমার বাংলোয় চলুন, সব বলছি।'

এই সময় সুনীতা কিরণ এবং আরো অনেক মেয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করেছিল। তারা জানিয়েছে, ওই নেকেড মাতালগুলো কোন কলেজের ছাত্র এবং মাঝরাতে কী মহান উদ্দেশ্যে তারা মেয়েদের হোস্টেলে হানা দিয়েছে।

অফিসার চমকে উঠেছিলেন। ঢোক গিলে বলেছেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই ওদের নামে ডায়েরি করবেন। কোথাও বসতে পারলে আপনাদের অভিযোগ লিখে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই প্রিন্সিপ্যাল অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, 'যা বলার আমিই বলব, আপনি লিখে নেবেন। আসুন আমার সঙ্গে।' একরকম জোর ক'রেই মেয়েদের হোস্টেলে পাঠিয়ে পুলিশ অফিসারকে নিয়ে নিজের বাংলোয় চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মেয়েরা ওই অবাঞ্ছিত জঘন্য ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুলুক, এটা তিনি চাননি।

পরের দিন সকালেই বেয়ারা পাঠিয়ে সুনীতাদের নিজের বাংলোয় ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। সেদিন তাঁকে আদৌ কড়া বা ভীতিকর মনে হয়নি। তাঁর মুখে চিরস্থায়ী কঠোরতার চিহ্নমাত্রও ছিল না। বরং তাঁকে খুবই কোমল এবং স্নেহপ্রবণ দেখাচ্ছিল—অনেকটা মায়ের মতো।

প্রিন্সিপ্যাল তাদের বসিয়ে বেয়ারাকে সবার জন্য কোকো আর বিস্কুট আনতে বলেছিলেন।

কোকোর কাপে আলতো একটি চুমুক দিয়ে নরম গলায় প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন, 'পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কাল কথা বলতে দিইনি বলে নিশ্চয়ই তোমরা রাগ করেছ। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

কেন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে মেয়েদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এর পর তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। পুলিশের কাছে ডায়েরি করলে পরে তা নিয়ে ক্রিমিনাল কেস উঠবে। সাক্ষি, জেরা ইত্যাদি কারণে অনবরত মেয়েদের কোর্টে

দৌড়তে হবে। তা ছাড়া বিরুদ্ধ পক্ষের ল'ইয়াররা জেরার মুখে এমন কিছু প্রশ্ন করতে পারেন যা মেয়েদের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।

কোর্টে কেস উঠলেই খবরের কাগজের আইন আদালত কলমে ছাপা হবে। তাতে এই কলেজের আর এখানকার ছাত্রীদের সুনাম এবং মর্যাদা নষ্ট হবে। কেননা, সাধারণ মানুষ ত কাল রাতের এই কদর্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়। আদালতের মুখরোচক রিপোর্টটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তারা ভাবতে পারে এক হাতে কখনও তালি বাজে না, ইত্যাদি। আর যাদের মাছির মতো ব্রণ খোঁটার অভ্যাস তারা ভাববে, মেয়েদের দিক থেকেও পর্যাপ্ত উসকানি ছিল, নইলে মাঝরাতে ওভাবে কেউ হানা দিতে পারে!

প্রিন্সিপ্যাল জানিয়েছিলেন, সারা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গভীর বিশ্বাসে তাঁর হাতে নিজের নিজের মেয়েদের মর্যাদা এবং সুরক্ষার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। কোর্ট তাদের টানাটানি করুক, তারা স্ক্যাণ্ডালের শিকার হোক—এ তিনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না। সুনীতা হঠাৎ বলে ফেলেছে, 'তা হ'লে যা-ই ঘটুক না, আমাদের মুখ বুজে থাকতে হবে? কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করব না?'

প্রিন্সিপ্যাল রেগে যাননি। পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে স্থির চোখে সুনীতাকে দেখতে দেখতে বলেছেন, 'তোমাদের বয়স এখনও কম, এক্সপিরিয়েন্সও কিছুই হয়নি। আমাদের দেশে নারী-পুরুষের ইকোয়াল রাইটসের কথা বলা হ'য়ে থাকে ঠিকই কিন্তু এখনও এ দেশ মেল-ডমিনেটেড। এখানে মেয়েদের অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট ক'রে চলতে হয়।'

সুনীতার পাশে বসে কিরণ সেই প্রথম মেল-ডমিনেটেড বা পুরুষ-শাসিত ইণ্ডিয়ার কথা শুনেছিল।

শান্তিভঙ্গের যে তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে তাতে প্রিন্সিপ্যালকে কয়েক পা পিছু হটতে হয়েছিল।

প্রতি বছরই শীতে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় তুমুল হৈচৈ করে। মীডিয়া অর্থাৎ খবরের কাগজ, টিভি এবং রেডিওকে এ ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এমন সব জমকালো অনুষ্ঠান করা হয় যাতে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

এই উপলক্ষে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের কোনো নাম-করা স্টারকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়। শুধু প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানেই না, কলেজের যে কোনো ফাংসানে

'গ্ল্যামার' থাকা চাই-ই, বিশেষ ক'রে চিত্রতারকা আনার দিকে ঝোঁকটা প্রচণ্ড। এটাই এই কলেজের রেওয়াজ।

এখানকার প্রথম কথা গ্ল্যামার, শেষ কথাও তা-ই।

সেবার শ'খানেক টেলিগ্রাম ক'রে এবং বম্বেতে চার বার লোক পাঠিয়ে হিন্দি ফিল্মের একজন দামী সুপারস্টারকে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। এটা যেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অ্যাচিভমেণ্ট বা অতুলনীয় কীর্তি, প্রিন্সিপ্যালের মুখচোখ দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে তারকাটি শুধুমাত্র সেলুলয়েডে বিপুল বিক্রমে পিস্তলবাজি করে দাঁত খিঁচিয়ে এবং 'ডামি'-র সাহায্যে অবিরত 'ক্যারাটে কি খেল' বা মারদাঙ্গা চালিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে, দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে এমন একটা অসার ফাঁপা মেকী ব্যক্তির নির্বাচন সুনীতারা মেনে নিতে পারেনি। তারা সোজা প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট জানিয়েছে।

প্রিন্সিপ্যাল অবাক হয়ে বলেছেন, 'এত বছর আমি এই কলেজে আছি। পপ্ ড্যান্সার, মিউজিসিয়ান, নাম-করা টি. ভি আর্টিস্ট—কেউ না কেউ প্রতি বছরই আসেন। এর আগে কোনো ছাত্রী তো প্রতিবাদ করেনি। এই সুপারস্টারটি এলে কাগজে বড়ো করে নিউজ বেরুবে, গ্ল্যামার কত বেড়ে যাবে, ভাবতে পার!' গ্ল্যামার এবং পাবলিসিটির দিকে তাঁর অসীম দুর্বলতা।

সুনীতা জানিয়েছে, মারদাঙ্গা আর নোংরা সেক্সের ছবিতে পঁচিশ বছর অভিনয় ক'রে ক'রে যে দেশের কালচার ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে, নষ্ট ক'রে দিচ্ছে নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের, তাকে এই ইনস্টিটিউসানে খাতির ক'রে আনার মানে হয় না। তাদের মতামত অগ্রাহ্য ক'রে যদি আনাই হয়, মেয়েরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে।

শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম ক'রে 'অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে'—জানিয়ে সুপারস্টারের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। তার বদলে আনা হয়েছে বিখ্যাত এক বিজ্ঞানীকে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে আর জল ঘোলা করেননি প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর কাছে শান্তিই একমাত্র কাম্য বস্তু।

শান্তিভঙ্গের শেষ যে ঘটনাটি ঘটে তাতেই জীবন সম্পর্কে কিরণের ধারণা আগাগোড়া বদলে যায়। শাক্যদ্বীপি মিশ্ররা বাড়ির মেয়েদের জন্য জীবনযাত্রার যে

মডেল এবং ফরমুলা তৈরি করে দিয়েছে তার কাছে সেটা পুরোপুরি অনাবশ্যক এবং অর্থহীন মনে হয়।

ঘটনাটি এইরকম। কিরণরা যেবার থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠল সে বছর সারা দেশ জুড়ে আচমকা বিপুল উদ্যমে পুত্রবধূ পোড়াবার ধুম পড়ে যায়। খুনের প্রতিযোগিতাটা দিল্লিতেই সবচেয়ে বেশি। রোজই কলেজে দু'চারটে ক'রে বউ পোড়ানোর খবর বেরুচ্ছিল। সেই সঙ্গে থাকত অসহায় মেয়েগুলোর ঝলসানো মৃতদেহের ছবি এবং ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। যথেষ্ট পরিমাণে দহেজ বা পণ আদায় করতে না পারায় এই শহরের শ্বশুর-শাশুড়িদের মাথায় উন্মাদ আততায়ী যেন ভর করেছিল। হত্যার নেশা এবং হিস্টিরিয়া আক্রান্ত দিল্লি তখন কোনো আদিম বর্বর যুগে ফিরে গেছে।

এইসময় একদিন দুপুরে অধ্যাপিকারা ক্লাসে ক্লাসে গম্ভীর মুখে যখন লেকচার দিচ্ছেন, মেয়েরা ঘাড় গুঁজে নোট নিচ্ছে, হঠাৎ বাইরে থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের আওয়াজ ভেসে এসেছিল।

গেটের কাছাকাছি আর্টস ডিপার্টমেন্টের বড়ো বিল্ডিংয়ে কিরণদের ক্লাস চলছিল। চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখা গেছে অগুনতি পুরুষ এবং মহিলার বিরাট মিছিল গেট পেরিয়ে স্লোগান দিতে দিতে জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো কলেজ কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তাদের অনেকের হাতেই হিন্দি এবং ইংরেজিতে লেখা পোস্টার।

কাছাকাছি আসতে স্লোগানগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

'দহেজ প্রথা—'

'বন্ধ্ কর।'

'হত্যাকারীদের—'

'শাস্তি চাই—।'

'নারী মুক্তি আন্দোলনে—'

'যোগ দিন।'

প্রিন্সিপ্যালের কড়া নির্দেশ, কোনো মিছিল বা অবাঞ্ছিত লোককে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বিশাল জনতা দেখে দারোয়ানরা এতই ঘাবড়ে যায় যে গলা দিয়ে তাদের আওয়াজ বেরোয়নি, কাঠের পুতুল হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

ততক্ষণে প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপিকা এবং ছাত্রীরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

স্বাধীনতার পর দিল্লিতে অসংখ্য কারণে হাজার মিছিল বেরিয়েছে কিন্তু এই কলেজের কথা তাদের কারো মনে পড়েনি, এখানকার শান্তি ছিল অবাধ এবং নির্বিঘ্ন।

প্রিন্সিপ্যালকে দেখে মনে হয়েছিল খুবই বিচলিত। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ব্যাপার ? আপনারা কী চান এখানে ?'

জনতার একেবার সামনের দিকে যে ঝকঝকে যুবকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে বলেছে, 'আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।' ব'লেই, পাশের বাগানের উঁচু রেলিংয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার গলায় একটা ছোট মাইক ঝুলছিল। সেটা তুলে নিয়ে সে এভাবে শুরু করেছিল :

দেশ জুড়ে, বিশেষ করে দিল্লিতে বধূহত্যার যে মারাত্মক ঘটনাগুলি ক্রমাগত ঘটে চলেছে তাতে সন্দেহ হয় ভারতবর্ষ একটি সভ্য দেশ কিনা, এর পেছনে কয়েক হাজার বছরের গৌরবময় পুরনো কালচার আছে কিনা। নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সম মর্যাদার কথা এখানে অনবরত ঢাক পিটিয়ে বলা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষও ধুমধাম করে কাড়ানাকড়া বাজিয়ে পালনও করা হয়। তার পাশাপাশি ঘরের বউও পোড়ানো হচ্ছে, পণপ্রথাও রয়েছে, বহুবিবাহও চলছে। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্রীতদাসীর মতো। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

যুবকটি জানিয়েছিল, 'মুক্তি' নামে তাদের একটি সংস্থা রয়েছে। তারা মেয়েদের নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। তাদের ইচ্ছা, দেশের যেখানে যেখানে মেয়েদের ওপর—তাদের ধর্মমত জাত বা ভাষা যাই হোক না—জুলুম শোষণ অত্যাচার চলছে, সেখানেই ছুটে যাওয়া এবং নিগৃহীত মেয়েদের সংগঠিত করা। কিন্তু সত্তর কোটি মানুষের দেশে সমস্যাটা এমনই ব্যাপক এবং জটিল যে অসংখ্য কর্মী দরকার, বিশেষত শিক্ষিত সচেতন সহানুভূতিসম্পন্ন মহিলা কর্মী। কেননা মেয়েদের সমস্যা মেয়েরাই ভাল বুঝতে পারে। এ কাজে কিরণদের কলেজের মেয়েদের এগিয়ে আসা দরকার। কিন্তু সেসব পরের কথা। আপাতত তাদের সংগঠন 'মুক্তি' বধূহত্যা এবং দহেজপ্রথার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা অফিসকর্মী এবং গৃহবধূদের নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে চলেছে লোকসভা ভবনের দিকে। যুবকটির আবেদন, কিরণদের কলেজের ছাত্রী আর অধ্যাপিকারাও যেন মিছিলে যোগ দেন।

যুবকটির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকম ভরাট গম্ভীর এবং আবেগময়। তার বলার

ভঙ্গিতে এমন একটা জাদুকরী ব্যাপার আছে যে সারা কলেজে উন্মাদনা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

এই সব মিছিল, আন্দোলন প্রিন্সিপ্যালের ঘোর অপছন্দ। কিন্তু তিনি বাধা দেবার আগেই স্থনীতা কিরণ এবং আরো বেশ কিছু মেয়ে মিছিলে মিশে গিয়েছিল। এমন কি দু' তিন জন অধ্যাপিকাও তাদের সঙ্গে গেছেন।

সেদিন পার্লামেণ্ট ভবনের সামনে থেকে কিরণরা ফিরে আসার পর প্রিন্সিপ্যাল ভীষণ রাগারাগি করেছিলেন, প্রচুর তর্জন-গর্জন ক'রে বলেছেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া কেন তোমরা প্রসেসানে গেলে? এতটা সাহস কী ক'রে হ'ল?'

যে অধ্যাপিকারা কিরণদের সঙ্গে গিয়েছিল তাঁরা কাচুমাচু মুখে, মিনমিনে গলায় বলেছেন, 'এমন সব সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটছে, কিছু একটা প্রোটেস্ট করা তো দরকার। তাই—'

এক ধমকে তাঁদের থামিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল, 'চুপ করুন। এই কলেজের টীচার আর স্টুডেণ্টরা পোলিটিক্যাল ধাপ্পাবাজদের পাল্লায় পড়ুক, এ আমি চাই না—'

স্থনীতা এই সময় বলে উঠেছে, 'ম্যাডাম, ওরা কেউ পোলিটিকস করে না। ওদের সোসাল অরগনাইজেসন 'মুক্তি'র—'

তার কথা শেষ হয়নি, কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে প্রিন্সিপ্যাল রূঢ়ভাবে বলেছিলেন, 'তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। প্রথম দিন থেকে দেখছি, তুমি অত্যন্ত ইমপার্টিনেণ্ট। আমার ইচ্ছে নয়, এ জাতীয় কোনো ব্যাপারের সঙ্গে এই কলেজের কেউ সম্পর্ক রাখে।'

স্থনীতা অসীম দুঃসাহসে এবার বলেছে, 'মেয়েদের ওভাবে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, আর আমরা মুখ বুজে থাকব!'

'হ্যাঁ, থাকবে।' প্রিন্সিপ্যাল এবার ক্ষেপে উঠেছেন, 'দেশে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে। পার্লামেণ্ট, কোর্ট, পুলিশ, মিলিটারি, পোলিটিক্যাল পার্টি, সমাজসেবী—কোনো কিছুর অভাব নেই। যা করার তারা করবে। এ নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। যাও, যে যার হোস্টেলে চলে যাও।'

প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করতে পারত স্থনীতা। বলতে পারত, এই কলেজের মেয়েরা যখন এই দেশেরই মানুষ তখন তাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে। কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথাও বলতে ইচ্ছা হয়নি তার। হোস্টলের দিকে ফিরতে ফিরতে সে শুধু কিরণকে বলেছে, 'কাল একবার

'মুক্তি'-র অফিসে যেতে হবে। ভদ্রলোক তখন যা বলে গেলেন, তার অর্ধেকেও যদি ঠিক হয়, তা হ'লে বলতে হবে ওরা বিরাট কাজ করছে।'

কিরণ বলেছিল, 'আমাকে নেবে তোমার সঙ্গে ?'

'সাহস থাকলে আসতে পার।'

আরো ক'টি মেয়েও তাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল।

পরের দিন কলেজের ছুটির পর খুঁজে খুঁজে আনসারি রোডে 'মুক্তি'-র অফিসটা বার করেছিল কিরণরা। কলেজের নিয়ম, মেয়েরা বাইরে বেরুতে পারে, তবে সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।

তিনটে মাঝারি ঘর নিয়ে 'মুক্তি'-র অফিস। বেশ কিছু পুরুষ এবং মহিলাকে সেখানে দেখা গিয়েছিল। সবাই দারুণ ব্যস্ত। কেউ টাইপ করছিল, দু'তিন জন একটা বড়ো খাতায় খবরের কাগজের কাটিং পেস্ট ক'রে রাখছিল। একটি মধ্যবয়সী মজুর শ্রেণীর মেয়েমানুষ কেঁদে কেঁদে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কী সব বলে যাচ্ছিল, একটি তরুণী তা টুকে নিচ্ছিল। এদের মধ্যে কালকের সেই ঝকঝকে যুবকটিকে দেখা গিয়েছিল। প্রথমটা সে কিরণদের চিনতে পারেনি। আগের দিন অত মানুষের ভিড়ে এবং ওই রকম উত্তেজনার মধ্যে একটি কলেজের ক'জন মেয়েকে আলাদা ক'রে মনে রাখা সম্ভব না। যুবকটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনারা ?'

সুনীতা জানিয়েছিল তারা কোত্থেকে আসছে এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যই বা কী।

যুবকটি খুব খুশি। সে কিরণদের বসিয়ে তাদের নাম-টাম, কার কোন ইয়ার জিজ্ঞেস করেছে, নিজেরও পরিচয় দিয়েছে। তার নাম প্রভাকর আম্বেদকর, দিল্লিরই একটা কলেজে ইংরেজির লেকচারার এবং 'মুক্তি'-র সেক্রেটারি। অন্য যে মহিলা এবং পুরুষ সহকর্মীরা তখন ওখানে ছিল তাদের সঙ্গেও কিরণদের আলাপ করিয়ে দিয়েছে প্রভাকর। এদের কেউ সরকারি অফিস বা প্রাইভেট ফার্মের বড়ো অফিসার কিংবা খুব সাধারণ এমপ্লয়ী, কেউ স্কুলে পড়ায়, কেউ নিছকই গৃহবধূ। নিজস্ব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সময় বার ক'রে 'মুক্তি'-র জন্য সবাই প্রচুর খাটে।

প্রভাকর একজন মারাঠী হরিজন। শুধু হরিজনই না, খ্রিস্টানও। শুনে চমকে উঠেছে কিরণ, তার আজন্মের সংস্কারে কোথায় যেন ধাক্কা লেগেছিল। পরক্ষণেই মনে পড়েছে, দেশটা একমাত্র আপার কাস্ট হিন্দুদের নয়। উঁচু-জাতের হিন্দু মেয়েদেরই শুধু পুড়িয়ে মারা হচ্ছে না বা তারাই নানা অমানুষিক প্রথার শিকার

নয়। কাগজে মাঝে মাঝে যে সব খবর বেরোয় তা থেকে কিরণ জেনেছে, অন্য জাতের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়ের অবস্থা ক্রীতদাসীর মতো, তাদের ওপর নির্যাতন চলে আসছে আবহমান কাল। তবে কিরণের এই জানাটা অনেক দূর থেকে এবং খুবই ভাসা ভাসা।

এদিকে নানা প্রসঙ্গে টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে ভারতীয় নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, ইত্যাদি বিষয়ে 'মুক্তি' তখন পর্যন্ত যা যা করেছে এবং ক'রে যাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী—সব বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল প্রভাকর। নির্যাতিত অসহায় মেয়েদের জন্য আর্থিক এবং আইনঘটিত সাহায্যের কিছু কিছু ব্যবস্থা তারা করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় সে সব যৎসামান্য। সব চেয়ে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে দেশের মানুষকে মেয়েদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলা, তাদের কাছে বিপজ্জনক ভয়াবহ অবস্থার আসল ছবি তুলে ধরা। 'মুক্তি'-র বিপুল কর্মসূচির মধ্যে এসবও রয়েছে।

কথায় কথায় ছ'টা বেজে গিয়েছিল। সুনীতা বলেছে, 'এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

কিরণ এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে বলেছে, 'আমরা যদি মাঝে মাঝে আসি—'

প্রভাকর বলেছে, 'মোস্ট ওয়েলকাম। এখানকার দরজা সবার জন্যে খোলা।'

প্রথম প্রথম কিরণরা সপ্তাহে এক-আধদিন এসে ছোটখাট কিছু কাজ ক'রে দিয়ে যেত। পরে নিয়মিত আসতে শুরু করে। বিকেল হ'লেই আনসারি রোড বিপুল আকর্ষণে তাদের যেন টেনে নিয়ে যেতে থাকে, বিশেষ ক'রে কিরণকে। 'মুক্তি'র কাজ ত আছেই, তার আসল আকর্ষণটা ছিল প্রভাকরকে ঘিরে।

প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা এবং একসঙ্গে কাজ করতে করতে প্রভাকরকে নানা দিক থেকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল কিরণ। এমন সংস্কারমুক্ত উদার হৃদয়বান মানুষ আগে আর কখনও ছাখেনি সে। প্রভাকরকে দেখে ক্রমে সে বুঝতে পারছিল, সারা জীবনের জন্য তার নিজস্ব কাম্য পুরুষটি কী ধরনের হওয়া উচিত।

প্রভাকরের মূল কাজটা গ্রামের গোঁড়া হিন্দু মুসলিম মেয়েদের নিয়ে। দীর্ঘ-কালের সংস্কার এবং গোঁড়ামি থেকে তাদের বার ক'রে আনতে হবে। তাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে আধুনিক শিক্ষা, তাদের বোঝাতে হবে স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্মার্থ। এই নিয়েই প্রভাকর মেতে ছিল। তার আরো একটা বড়ো কাজ, বহু-

বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ। এতে বিরাট ঝুঁকি ছিল। কেননা গোঁড়া কট্টরপন্থীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভাকর এসব গ্রাহ্য করত না। সে প্রচণ্ড সাহসী জেদী এবং একরোখা।

কিরণ টের পাচ্ছিল, প্রভাকর তাকে পছন্দ করে। কোনো কারণে দু'একদিন না এলে জানতে চাইত, কেন আসেনি।

প্রথম প্রথম আনসারি রোডে 'মুক্তি'-র অফিসে এসে টুকটাক কিছু ক'রে যেত কিরণরা। পরে তাদের বড়ো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দু-তিন জনের এক একটা গ্রুপ বানিয়ে ওদের নানা জায়গায় পাঠানো হ'ত। কোনো দল যেত শ্রমিক বস্তিতে, কোনোটা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে, কোনোটা বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলাদের খোঁজে। উদ্দেশ্য, এইসব মেয়েদের সঙ্গে কথা ব'লে তাদের অর্থনৈতিক পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যাগুলি লিখে এনে রিপোর্ট তৈরি করা। এই গ্রুপগুলোর কোনো একটার সঙ্গে প্রভাকরও বেরিয়ে পড়ত। তবে কিরণ যে গ্রুপে থাকত, বেশির ভাগ দিন তাদের সঙ্গেই যেত প্রভাকর।

সুনীতা কিরণের ভেতর থেকে ঘুমন্ত আগুন খুঁড়ে বার করেছিল আর প্রভাকর চারপাশের সব মজবুত দেয়াল ভেঙে তাকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল যেন।

মাস কয়েক এভাবে চলার পর ঠিক হয়েছিল, এক ছুটির দিনের সকালে একটা গ্রুপ হরিয়ানার এক কৃষাণ গ্রামে যাবে। সেখানে নির্যাতিত মেয়েদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য যোগাড় করাই ছিল যাওয়ার উদ্দেশ্য।

এই গ্রুপটায় ছিল তিনজন। কিরণ সুল্‌ভা এবং প্রভাকর। কিন্তু যাওয়ার দিন সুল্‌ভা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিরণ আর প্রভাকরকেই যেতে হয়। ভাবা গিয়েছিল, বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে, কিন্তু হরিয়ানায় কাজ সারতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে যখন ওরা পৌঁছোয় তখন অনেক রাত এবং তখন কিরণের পক্ষে হোস্টেলে ফেরা অসম্ভব।

প্রভাকর বেশ বিপন্ন বোধ করেছিল। সে বলেছে, 'আজ রাতে তোমাকে কোনো ভাল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। সকালে কলেজে চলে যেও।'

কোনোদিন একা হোটেলে থাকেনি কিরণ। সে ভয় পেয়ে বলেছে, 'না, না—'

'তা হ'লে?'

একটু ভেবে কিরণ এবার বলেছে, 'আপনার ফ্ল্যাটে থাকলে অসুবিধা আছে?'

চমকে উঠেছিল প্রভাকর, 'কিন্তু আমি ত একা থাকি।'

'তাতে কী।'

কিরণের নিষ্পাপ মুখে কোনোরকম অবিশ্বাস বা সংশয় ছিল না। ছিল প্রভাকরের ওপর গভীর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা।

প্রভাকর কিরণকে নিজের ফ্ল্যাটেই শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সেই প্রথম তাকে একা কাছে পায় কিরণ। আর তখনই অনুভব করে, এই মানুষটিকে ছাড়া তার জীবন অসম্পূর্ণ, একে বাদ দিয়ে তার একটা দিনও চলবে না। হয়ত তার সম্পর্কেও এই রকমই কিছু ভেবে থাকবে প্রভাকর।

সেদিন মধ্যরাতে সাউথ দিল্লির একটি ফ্ল্যাটে গোঁড়া শাক্যদ্বীপি মিশ্র বংশের পরম্পরা থেকে কিরণ যেন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধরমপুরার 'মিশ্র নিকেত'-এ তার অস্তিত্বের যে শিকড়গুলি আজন্ম ছড়িয়ে ছিল, সব যেন কোনো অলৌকিক প্রবল টানে উপড়ে আসে। ত্রিকূটনারায়ণ হরীশ, এমন কি মুকুটনাথ মহেশ্বরী সুষ্‌মা রেবতী, এদের মুখগুলি পর্যন্ত সুদূর এবং অস্পষ্ট হয়ে যায়।

পরের দিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে কিরণ লক্ষ করে, প্রভাকরের বুকের কাছে শুয়ে আছে। সে চোখ নামিয়ে আরক্ত লাজুক মুখে হেসেছিল।

প্রভাকরের চোখেমুখে গ্লানির চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে। সে বলেছে, 'তোমার খুব ক্ষতি ক'রে ফেললাম কিরণ। কাল জোর ক'রে হোটেলে রেখে এলেই ভাল হ'ত।

মুখ না তুলে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে কিরণ। বোঝাতে চেয়েছে ক্ষতি হয়নি।

প্রভাকর বলেছে, 'কিন্তু তোমার সাগাই ঠিক হয়ে আছে। এখন কী হবে?'

নিজেদের পারিবারিক কাঠামো, গোঁড়ামি ইত্যাদি থেকে শুরু ক'রে তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে থাকা পর্যন্ত যাবতীয় খবর আগেই প্রভাকরকে জানিয়ে দিয়েছিল কিরণ। সে আধফোটা গলায় বলেছে, 'আমি জানি না।' অর্থাৎ যা ভাবার প্রভাকর ভাববে. নিজেকে প্রভাকরের কাছে সঁপে দিয়েই তার সব কাজ যেন শেষ।

প্রভাকব বলেছে, 'আচ্ছা, এখন তুমি হোস্টেলে ফিরে যাও। পরে এ নিয়ে ভেবে দেখব।'

হোস্টেলে সুনীতা তার জন্য শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছিল, তার মুখে

গভীর উৎকণ্ঠা। সে জানিয়েছিল, রাত্তিরে সুপারিনটেনডেণ্ট কিরণের খোঁজ নিয়েছিলেন। ন'টায় ঘুমোতে যাবার আগে ফ্লোরে ঘুরে প্রতিদিন তিনি একবার মেয়েদের দেখে যান। যাই হোক, কোনোরকমে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছে সুনীতা। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হয়েছিল কাল ? কোথায় ছিলে ?'

কিরণ শুধু জানিয়েছিল, হরিয়ানা থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় রাতে তাকে কোথায় থাকতে হয়েছে।

সুনীতার ঘ্যানঘেনে মেয়েলি কৌতূহল নেই। সে এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি।

এর দিনকয়েক বাদে প্রভাকর কিরণকে বলেছিল, সেই রাতে যা ঘটে গেছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। কিরণের আপত্তি না থাকলে তাদের বিয়ে হ'তে পারে। তার সংস্কার নেই, গোঁড়ামির কথা সে ভাবতে পারে না। তবে কোনোদিনই কিরণের জন্মগত ধর্মবিশ্বাসকে অসম্মান করবে না। ইচ্ছা করলে বিয়ের পরও সে তার পারিবারিক আচারগুলি পালন করতে পারে।

ঠিক হয়েছিল, সুবিধামতো একটা দিন দেখে তারা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে চলে যাবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

আরো দু'তিন মাস বাদে সুনীতা কিরণ এবং আর দু'একজন ছাড়া 'মুক্তি' সম্পর্কে অন্য মেয়েদের উৎসাহ একেবারেই কমে যায়। সাময়িক উন্মাদনা কেটে গেছে। তারা আনসারি রোডে যাওয়া বন্ধ ক'রে দেয়।

এদিকে কিরণ হঠাৎ একদিন টের পায় তার শরীরের অভ্যন্তরে বিপুল তোল-পাড় শুরু হ'য়ে গেছে। বুঝতে পারে সে প্রেগনাণ্ট।

ঠিক এই সময় প্রিন্সিপ্যাল মধুর খান্না খবর পান, তাঁর কলেজের ক'টি মেয়ে ছুটির পর 'মুক্তি'-র জন্য কাজ করছে। তিনি শুনেছেন, এদের মধ্যে কেউ বা কয়েকজন মাঝে মাঝেই বাইরে রাত কাটিয়ে আসছে। ভবিষ্যতে যারা এলিট সোসাইটির শোভা হয়ে উঠবে তাদের পক্ষে এসব খারাপ দৃষ্টান্ত। দাগী আম-গুলিকে তিনি আর ঝুড়িতে রাখতে চাননি। অভিভাবকদের তৎক্ষণাৎ লম্বা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মেয়েরা যেভাবে চলছে তাতে এদের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, কোনো স্ক্যাণ্ডালে এরা জড়িয়ে পড়বে কিনা, তিনি জানেন না। অভিভাবকরা যেন দ্রুত এর ব্যবস্থা নেন।

এই চিঠি পেয়েই মুকুটনাথ ভকিল খুবলাল সহায়কে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন।

আর গোঁড়া শাক্যদ্বীপি ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে কিরণ পেটে অচ্ছুৎ ও খ্রিস্টানের বীজ থেকে জাত একটি ভ্রূণ নিয়ে ফিরে এসেছে 'মিশ্র নিকেত'-এ, যেখানে আবহমান কাল ধরে স্থিতাবস্থা এবং চিরশান্তি বিরাজমান।

চার

দুপুরে পুরনো রসুইকর বুড়ো নন্দলাল ঝা কিরণের ঘরেই ভাত এবং পুরী-টুরী দিয়ে গিয়েছিল। খেয়েই শুয়ে পড়েছে সে। তখনও মুকুটনাথরা কাশী থেকে ফেরেননি। তাঁরা এলে বাড়ির আবহাওয়া তার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক হ'য়ে উঠবে, যদিও এ নিয়ে প্রচুর দুশ্চিন্তা ছিল কিরণের তবু শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসে, অগাধ ঘুমে ডুবে যায় কিরণ। আগের দু' রাত মুকুটনাথের স্ট্রোকের কথা শুনে অসহ্য উৎকণ্ঠায় একটুও ঘুমোতে পারেনি। একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুম তার পক্ষে ছিল খুবই জরুরি। ভয়ে টেনসানে এবং উত্তেজনায় মাথার ভেতরটা দপ দপ করছিল, মনে হচ্ছিল তার নিজেরই কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে।

ঘুম ভাঙে সাগিয়ার ডাকাডাকিতে। সে ব্ল্যাক কফি নিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বাথরুমে মুখ-টুখ ধুয়ে এসে কফির কাপটা নিতে নিতে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'দাদীরা এসেছে?'

সাগিয়া মাথা নাড়ে, 'না।'

কিরণ আর কোনো প্রশ্ন করে না।

বাইরে ফাল্গুনের বিকেল গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। রোদের রং টাটকা হলুদের মতো। গাছপালার ছায়া দ্রুত দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে রোদের লম্বা লম্বা ক'টা লাইন ঘরের ভেতর কার্পেটের ওপর এসে পড়েছে।

কফির কাপটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় চলে আসে কিরণ, সাগিয়াও আসে তার সঙ্গে সঙ্গে।

এখনও সারা বাড়ি ঘষা-মাজা ধোয়াধুয়ি চলছে। কিরণ নৌকর নৌকরানীদের লক্ষ করে না, সোজা রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কর মতো কফিতে আলতো চুমুক দিতে দিতে দূরে হাইওয়ের দিকে তাকায়।

হাইওয়েটা ধরমপুরার কাছে এসে এমনভাবে কোমর বাঁকিয়ে ঘুরে গেছে যাতে

কিরণদের বাড়ির সামনে এবং পেছনে, দু'দিক থেকেই ওটা চোখে পড়ে। পাকা সড়কে এখন প্রচুর মানুষ, ট্রাক, বাস, সাইকেল রিকশা, গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি।

মাথার ওপর দিয়ে মরশুমী পাখির ঝাঁক উড়ে চলেছে দিগন্তের দিকে। অনেক দূরে আকাশের গা ঘেঁষে সকালের মতোই পাতলা তুলোর মতো আবছা কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। গোটা ফাল্গুন মাস জুড়ে সকাল বিকেল এই কুয়াশাটা পড়তে থাকবে।

হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের কথাই ঘুরে ঘুরে মনে হচ্ছে। অন্য বার বাড়ি এলে মা এতক্ষণে পঁচিশ বার তার ঘরে চলে আসতেন। আজ একবারও আসেননি, এমন কি তার খাওয়ার সময়ও নয়। বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে কিরণ।

হঠাৎ পেছন থেকে সাগিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, 'আ গিয়া, আ গিয়া—'

কিরণ চমকে ওঠে এবং তখনই দেখতে পায়, বিরাট বিরাট চাকাওলা একটা চেনা মোটর হাইওয়ে থেকে এধারের রাস্তায় নেমে বাড়ির দিকে আসছে। গাড়ি-টার ফ্রন্ট সীটে বসে আছেন মুকুটনাথ, কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণের ছেলে হেমগিরি-নারায়ণ এবং ড্রাইভার ঠাণ্ডি সিং। পেছনের সীটে মহেশ্বরী, তাঁর খাস নৌকরানী মধ্যবয়সী হট্টাকট্টা চেহারার কুঁদরী এবং একজন বৈদ (কবিরাজ) চন্দ্রকান্ত ঝা।

কিরণদের একই মডেলের একজোড়া গাড়ি আর দু'জন ড্রাইভার। একটা গাড়ি নিয়ে চৌধারী সিং তাকে আর খুবলালকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল। এই গাড়িটা গিয়েছিল মহেশ্বরীদের আনতে।

একটু পর মোটরটা সামান্য ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। এখান থেকে সেটাকে আর দেখা যায় না।

সাগিয়া বলে, 'দিদি, দাদীজিকে দেখতে যাব?'

মুকুটনাথকে দেখামাত্র প্রবল ভয়ের চাপে ফুসফুস যেন ফেটে যেতে থাকে কিরণের। হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি হঠাৎ এত বেড়ে যায় যে তার আওয়াজ পর্যন্ত সে শুনতে পায়। ঝাপসা গলায় কিরণ বলে, 'যা।'

সাগিয়া সিঁড়ির দিকে দৌড়য়।

কিছুক্ষণ পর নিচে হৈচৈ চেঁচামেচি শুরু হ'য়ে যায়। পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়েও কিরণ টের পায়, নৌকর নৌকরানীরা শশব্যস্তে ছোটাছুটি করছে।

দ্বিধান্বিতের মতো আরো খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থাকে কিরণ। সে ছাড়া

দোতলায় বা তেতলায় আর কেউ নেই, সবাই নিচে নেমে গেছে। কখন যেন, নিজের অজান্তে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামতে থাকে কিরণ।

উলটো দিক থেকে সাগিয়া উঠে আসছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, 'দাদীজি তোমাকে ডাকছে—'

উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে শিথিল পায়ে কিরণ নেমে আসে। আর তখনই দেখতে পায় একটা ফিতের খাটিয়ায় নরম বিছানা পেতে, মহেশ্বরীকে তার ওপর শুইয়ে নৌকররা নতুন শিব মন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাশে পাশে চলেছেন মুকুটনাথ, রেবতী, সুষ্‌মা, বৈদ চন্দ্রকান্ত ঝা, কুলগুরুর ছেলে যুবক হেমগিরি এবং খুবলাল। এরা এবং খাটিয়াবাহক ক'টি নৌকর বাদেও অন্য নৌকর নৌকরানীরা।

খুবলাল কখন যে আবার 'মিশ্র নিকেত'-এ ফিরে এসেছে, টের পায়নি কিরণ। এই মুহূর্তে তার কী করণীয়, বুঝতে পারে না। অনেকটা স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার মতো, মহেশ্বরীকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে সে।

চলতে চলতে শীতল কঠিন চোখে একবার কিরণকে দেখে নেন মুকুটনাথ, কিন্তু একটি কথাও বলেন না।

বাবার দিকে তাকিয়ে কিরণ বুঝে ফেলে, পরে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। মুখ ফিরিয়ে এবার মাকে লক্ষ করে সে। রেবতীর মুখের কঠোরতা সেই সকালের মতোই, নমনীয়তার কোনো লক্ষণই নেই।

এদিকে খাটিয়ায় শুয়ে মহেশ্বরী মাথা ঘুরিয়ে কিরণকে খুঁজছিলেন, দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলেন, 'ইধাঁ আ—'

মহেশ্বরীর বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি। গায়ে শাঁস বলতে কিছু নেই, সরু সরু পলকা হাড়ের ওপর শুধুই জালি জালি, কোঁচকানো, কালচে চামড়া জড়ানো। শরীর শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ঘোলাটে চোখ দু-ইঞ্চি গর্তের ভেতর। তোবড়ানো গাল এবং মুখে অজস্র ভাঙচুর। মাথায় চুল নেই বললেই হয়, পাটের ফেঁসোর মতো এখানে ওখানে কিছু কিছু ঝুলছে। লিকলিকে সরু গলা। হঠাৎ দেখলে বুড়ো গিধের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যদিও নিজের ঠাকুরমা সম্পর্কে এ সব ভাবতে নেই।

কিরণ মহেশ্বরীর কাছে এগিয়ে আসে। একটু ইতস্তত করে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

মহেশ্বরী রোগা শীর্ণ দুটো হাত বাড়িয়ে কিরণের মুখটা নামিয়ে একটি চুমু খান। বলেন, 'ভাল আছিস দিদি ?'

কিরণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়।

মহেশ্বরী আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলেন, 'ভগোয়ান শিউশঙ্করজি তোকে সুমতি দিন।'

সকালে অবিকল এইরকম কিছু বলেই আশীর্বাদ করেছিলেন কুলগুরু বশিষ্ঠ-নারায়ণ। নিশ্চয়ই মহেশ্বরীকেও তার সম্পর্কে কিছু বলে থাকবেন মুকুটনাথ। এঁরা কি ধরেই নিয়েছেন তার 'মতি' খারাপ পথেই চলেছে ?

একসময় শোভাযাত্রা শিবমন্দিরের কাছে চলে আসে। সামনের চবুতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। স্বর্গীয় হেসে তিনি বলেন, 'দেখ মহেশ্বরী, আমার কথায় তোমার জন্যে মুকুট নতুন শিবমন্দির বানিয়ে দিয়েছে। তোমাকে বার বার কাশী যেতে হবে না। বাড়ির ভেতরেই বিশ্বনাথ-ধাম পেয়ে যাবে।' পাশের বিশাল চৌবাচ্চাটা দেখিয়ে বলেন, 'ওটা শুধ্ (বিশুদ্ধ) গঙ্গাপানিতে বোঝাই। মনে মনে একে গঙ্গাজি ভাববে।' মহেশ্বরী তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়ো, কিন্তু যেহেতু তিনি সম্মানিত গুরু, 'তুমি' করে বলার জন্মগত অধিকার তাঁর। অন্যের বয়স, সামাজিক প্রতিষ্ঠা যা-ই হোক, তাকে সম্মান দেবার কোনো প্রয়োজনই নেই। গুরু সবার ওপরে।

সব ব্যাপারেরই কোনো না কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে বাড়িতে। কুলদেবী মহালছমী থাকা সত্ত্বেও হুট ক'রে নতুন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যায় কিরণের কাছে।

ক'বছর ধরেই বাত শ্বাসকষ্ট এবং আরো হাজার রকমের রোগে ভয়ানক কাবু হ'য়ে পড়েছেন মহেশ্বরী, বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না। অ্যালোপ্যাথ ওষুধে গোমাংসের রস বা গোরক্ত থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার-দের 'মিশ্র নিকেত'-এর চৌকাঠ মাড়াতে দেওয়া হয় না। হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে অতটা জোরালো আপত্তি না থাকলেও মহেশ্বরী রীতিমত শুচিবায়ুগ্রস্তা, এই ওষুধও তিনি ছোঁন না। কাজেই একমাত্র ভরসা কবিরাজি।

ধরমপুরার বৈদরা যখন মহেশ্বরীর শরীরে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো এনার্জি যোগাতে পারল না, তখন কলকাতা এবং পাটনা থেকে বিস্তর খরচ করে দু'জন নাম-করা কবিরাজ আনিয়েছিলেন মুকুটনাথ। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে গেছেন, কিছুই করার নেই তাঁদের। স্বয়ং চরক এসে নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে গেলেও মহেশ্বরীর শরীরে সার আর তৈরি হবে না। ভেতরের সব কিছু ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে।

বৈদরা দু'বছর আগে জবাব দিয়ে গেলে কী হবে, মহেশ্বরীর পরমাত্মা তাঁর রুগ্ণ পঙ্গু শরীর ছেড়ে যেতে একেবারই অনিচ্ছুক। তবু মৃত্যু এসে মাঝেমাঝেই দরজায় টোকা দেয়। ফলে গত দু'বছরে চার-চারবার কাশীতে গঙ্গাযাত্রা করতে পাঠানো হয়েছে মহেশ্বরীকে।

মিশ্রদের পরিবারে কয়েক জেনারেসন ধরে এই গঙ্গাযাত্রার প্রথাটা চলে আসছে। গঙ্গার পাড়ে কারো মৃত্যু ঘটলে মোক্ষলাভ নাকি অবধারিত। বিশেষ করে কাশীতে মারা গেলে ত কথাই নেই। ওখানকার আকাশে 'পুণ' (পুণ্য), বাতাসে 'পুণ', প্রতিটি ধুলোর দানায় 'পুণ'। স্বয়ং গঙ্গাজিও পাশ দিয়ে নিরবধি বয়ে চলেছেন। আর আছেন স্বয়ং বিশ্বনাথ। ওখানে স্বর্গের অগুনতি স্পেশাল গাইড থিক থিক করছে। আবহমান কাল ধরে তারা দিবারাত্রি শিরদাঁড়া টান টান ক'রে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেহ থেকে আত্মাটি খসবার সঙ্গে সঙ্গে খপ ক'রে সেটিকে ধরে তারা সোনার কৌটোয় পুরে সোজা বিষ্ণুলোকে বা শৈবলোকে নিয়ে যায়। এরপর আর পুনর্জন্ম নেই, অনন্ত মোক্ষ।

মুকুটনাথের ঠাকুরদার বাবা চতুরনাথ ছিলেন খুবই দূরদর্শী এবং বিবেচক। নিজের এবং স্ত্রীর জন্য ত বটেই, তাঁর পরবর্তী জেনারেসনের বংশধরদের পুণ্যসঞ্চয় ও মোক্ষলাভের জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে গেছেন। আশি বছর আগে এই সেঞ্চুরির একেবারে গোড়ায় কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের পাশে শ্মশানের কাছাকাছি একটা দোতলা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে পুরুষানুক্রমে কাশীরই একটি ব্রাহ্মণ পরিবার কেয়ারটেকার হিসেবে বাড়িটা দেখাশোনা ক'রে আসছে। ধরমপুরা থেকে মিশ্ররা প্রতি মাসে নিয়মিত মাইনে পাঠিয়ে যান। পরকাল এবং মোক্ষের জন্য এই খরচটুকু কিছুই না।

চতুরনাথের পর মিশ্র বংশের কারো মৃত্যু ঘনিয়ে এলেই কুলগুরু বা তাঁর কোনো প্রতিনিধি, ভজন গাইয়ের একটি দল এবং নৌকর নৌকরানী সঙ্গে দিয়ে কাশীতে গঙ্গাযাত্রা করতে পাঠানো হচ্ছে।

আগে গঙ্গাযাত্রার জন্য সারা ভারত থেকে প্রচুর লোক কাশী যেত। কিন্তু ইদানীং ব্রাহ্মণের ছেলে গোমাংস খেয়ে, উচ্চবর্ণের কায়াথের মেয়ে মুচির গলায় মালা দিয়ে যখন পবিত্র হিন্দুধর্মের ভিত আলগা ক'রে দিচ্ছে, তখনও মৃত্যুর ওপারের পরকালের জন্য ভিড় খুব কম হয় না। এদের জন্য বড়ো বিজনেসম্যান আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ক'টা 'গঙ্গালাভ' ভবন বানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু গঙ্গাযাত্রার ব্যাপারে মিশ্রদের মতো প্রায় এক সেঞ্চুরি ধরে এমন নিষ্ঠা এবং গোঁ গোটা দেশের আর কোনো পরিবারে আছে কিনা, বলা মুশকিল।

গত দু'বছরে চারবার মহেশ্বরীকে কাশীতে রেখে আসা হয়েছে কিন্তু ওখানকার আবহাওয়ায় এমন কিছু আছে যাতে মহেশ্বরীর নির্জীব শরীর এবং ঘুণে-খাওয়া হৃৎপিণ্ড চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাঁর দেহান্ত কোনোভাবেই আর ঘটে ওঠেনি। শৈবলোক আর বিষ্ণুলোকের দূতেরা বৃথাই তাঁর আত্মাটির জন্য সোনার কৌটো হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি ক'রে শেষ পর্যন্ত চার-চারবার হতাশ হয়ে অন্য কারো আত্মার খোঁজে চলে গেছে। আর মহেশ্বরীকে ধরমপুরায় ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। তাঁর কপালে কাশীতে মৃত্যু নেই। তাই ধরমপুরায় 'মিশ্র নিকেত'-এই একটি কাশী বানানো হয়েছে।

বশিষ্ঠনারায়ণের নির্দেশে নৌকররা খাটিয়াসুদ্ধু মহেশ্বরীকে শিবমন্দিরের সামনে নামায়। মৃত্যু না ঘটলেও নড়াচাড়ার শক্তি নেই মহেশ্বরীর। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই তিনি কুলগুরুকে বলেন, 'কিরপা করে আপনি একটু কাছে আসুন গুরুদেও—'

বশিষ্ঠনারায়ণ নিচে নেমে আসার ফাঁকে হাতজোড় ক'রে শিবের মূরতকে প্রণাম করেন মহেশ্বরী। তারপর বশিষ্ঠনারায়ণকে বলেন, 'বয়েস আর বুখার আমাকে মেরে রেখেছে। উঠতে পারিনা। আপনার চরণকা ধূল কী ক'রে যে নিই?'

বশিষ্ঠনারায়ণ উত্তর দেবার আগেই রেবতী এত বড়ো সমস্যাটার সন্তোষজনক সমাধান ক'রে দেন। নিজের হাতে কুলগুরুর পা থেকে কয়েক দানা ধুলো তুলে নিয়ে মহেশ্বরীর মাথায় ঠেকান। চোখ বুজে হাতজোড় ক'রে পরম ভক্তিভরে বিড়-বিড় ক'রে মহেশ্বরী বলেন, 'জয় গুরুদেও, জয় গুরুদেও—'

বশিষ্ঠনারায়ণের চোখেমুখে তৃপ্তি এবং সুখের স্বর্গীয় একটি হাসি ফুটে ওঠে। এই বিষাক্ত কলিযুগে অবিশ্বাসী এবং নাস্তিকে যখন দেশ ভরে গেছে তখন এরকম একনিষ্ঠ ভক্তিমতী শিষ্যা পাওয়া কম কথা নয়।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'বনারসধাম থেকে অনেক কষ্ট ক'রে এসেছে মহেশ্বরী। শরীরের ওপর বহুত ধকল গেছে। ওকে আর এখানে রেখো না। খাটিয়া উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাও।'

নৌকরেরা আবার খাটিয়া কাঁধে তোলে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে শ্বেত পাথরের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। শোভাযাত্রাটি খাটিয়ার পেছন পেছন চলতেই থাকে। কিরণও তাদের সঙ্গে অসীম দুশ্চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যায়।

মহেশ্বরী যখন সুস্থ এবং সবল ছিলেন, চলাফেরার শক্তি যখন তাঁর অটুট ছিল সেইসময় তিনি থাকতেন দোতলায়। কিন্তু এবার তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে একতলায়। এমন একটি আলো-হাওয়াওলা প্রকাণ্ড ঘর তাঁর জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেখানে শুয়ে শুয়েই শিয়রের দিকের জানালা দিয়ে শিবমন্দির এবং বিরাট বাঁধানো চৌবাচ্চায় নকল গঙ্গা দেখা যায়। অর্থাৎ মিনিয়েচার বেনারসটি তাঁর চোখের সামনেই থাকবে।

ঘরের একধারে জানালার ধার ঘেঁষে পুরনো আমলের মডেলে মেহগনি কাঠের বিশাল খাট। তা' ছাড়া আলমারি, চেয়ার-টেয়ার এবং ছোট টেবিলও রয়েছে। সিলিং থেকে দুই ব্লেড-ওলা পাখা ঝুলছে।

নৌকরেরা খাটিয়াটিকে বড়ো খাটের পাশে এনে নামায়। মুকুটনাথের নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সন্তর্পণে আর যত্নে মহেশ্বরীকে খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়।

মুকুটনাথ নৌকরদের চলে যেতে বলেন। তারা চলে গেলে ঘরে থাকেন রেবতী, মুকুটনাথ, হেমগিরি, সুষ্‌মা, কিরণ, বৈদ চন্দ্রকান্ত ঝা এবং খুবলাল। আর থাকে মহেশ্বরীর খাস নৌকরানী কুঁদরী।

মুকুটনাথ মহেশ্বরীর উদ্দেশে বলেন, 'শরীর কেমন লাগছে মা ? কুছ তখলিফ ?'

মহেশ্বরী বলেন, 'না, আমি ঠিক আছি।'

তবু মুকুটনাথ চন্দ্রকান্তকে বলেন, 'মাকে একবার পরীকৃষা (পরীক্ষা) ক'রে দেখুন—'

চন্দ্রকান্ত মহেশ্বরীর লিকলিকে একটি হাত তুলে নিয়ে নাড়িটি দেখেন, তারপর বলেন, 'না, ঠিক আছে। চিন্তাকা কুছ নেহীঁ।'

মুকুটনাথ বলেন, 'তা' হ'লে এখন আপনি বাড়ি চলে যান। ট্রেনে রাত জেগে এসেছেন। এখন বিশ্রাম দরকার। তবে রোজ সকালে একবার করে মাকে দেখে যাবেন।'

'হাঁ।'

'মাকে নিয়ে এখন আর দুর্ভাবনা নেই ত ?'

'নেহীঁ। বিশ্বনাথজির কির্‌পায় এখনও তিন চার সাল উনি আমাদের মধ্যে থাকবেন।'

চন্দ্রকান্ত চলে যান। খুবলালের সঙ্গে দু-একটি কথা বলে তাকেও বিদায় করেন মুকুটনাথ। বলেন, 'কাল সুবে একবার এসো। জরুরি কথা আছে।'

এরপর হেমগিরিকে বিশ্রামের জন্য সুষ্‌মার সঙ্গে একতলারই অন্য একটি ঘরে

পাঠিয়ে দেন মুকুটনাথ। কুলগুরু এবং তাঁর বংশের লোকজনদের জন্য একতলায় থাকার চমৎকার বন্দোবস্ত করা আছে। এটা মুকুটনাথ করেননি, তিন পুরুষ আগে চতুরনাথই ক'রে গেছেন।

এখন এ ঘরে মুকুটনাথ, রেবতী, কিরণ, মহেশ্বরী এবং কুঁদরী ছাড়া আর কেউ নেই। কুঁদরী ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাল ধরে মহেশ্বরীর সেবা ক'রে আসছে। সে খুবই বিশ্বাসী। তিন কুলে তার কেউ নেই। সে 'মিশ্র নিকেত'-এর একজন হয়ে গেছে। এ কোঠির গৌরব তার নিজের গৌরব, এই বংশের লজ্জা তার লজ্জা।

কিরণকে কাছে ডেকে খাটের একধারে নিজের পাশে বসতে বলেন মহেশ্বরী। নিজের ইচ্ছায় না, যন্ত্রচালিতের মতোই যেন কিরণ বসে পড়ে। সে টের পায়, তার হৃৎপিণ্ডে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু একটা ঘটে চলেছে। মনে হয় বিস্ফোরণটা এখনই ঘটে যাবে।

কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো মাংসহীন গাঁটপাকানো হাতটা কিরণের কাঁধে রেখে সস্নেহে বলেন, 'তুই বিলকুল মেমসাহেব বনে গেছিস। দিল্লিতে ভালো ছিলি তো?'

কিরণ আস্তে ক'রে বলে, 'হ্যাঁ দাদী—'

'শুনলাম আজই তোকে খুবলাল নিয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ।'

'কখন এসেছিস?'

কিরণ জানিয়ে দেয়, কখন এসেছে।

একটু চুপচাপ।

তারপর মহেশ্বরী বলেন, 'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

মুকুটনাথ কি মহেশ্বরীকে কিছু বলেছেন? কী বলতে পারেন তিনি? সেটা ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কিরণের হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন পলকের জন্য থমকে যায়। পরক্ষণে প্রবল বেগে সেটা লাফাতে থাকে। দ্রুত একবার মা এবং বাবার মুখের দিকে তাকায় কিরণ। মুকুটনাথ এবং রেবতীর কাঠিন্য অটুট রয়েছে। সেখানে কোমলতার এতটুকু আভাস নেই। চোখ ফিরিয়ে আবার সে মহেশ্বরীর দিকে তাকায়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'পরে শুনিস। এই সবে এলাম, তুইও আজই দিল্লি থেকে এসেছিস। তাড়ার কী?' বলে হাসেন মহেশ্বরী।

কিরণ আর কোনো প্রশ্ন করে না। তবে তার মনে হয়, পেটের ভ্রূণটার কথা এখনও বাড়ির কেউ জানে না। জানলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হতো।

কিন্তু কী কারণে হঠাৎ তাকে দিল্লি থেকে আনা হ'ল, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। অসীম উদ্বেগে তার মস্তিষ্কের ভেতরটা যেন ফেটে যেতে থাকে। যতক্ষণ না মা বাবা বা মহেশ্বরী কিছু বলছেন তার উৎকণ্ঠা কাটবে না।

পাঁচ

কিরণকে দিল্লি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে দু'দিন আগে। সে আসার পর দুটো দিন অর্থাৎ আটচল্লিশটি ঘণ্টা একরকম নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে বলা যায়। বিস্ফোরণ এখন পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি, যদিও কিরণের ধারণা যে কোনো মুহূর্তেই মারাত্মক কিছু ঘটে যাবে। এক-একটি মিনিট কাটছে আর কিরণের স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হচ্ছে। ভাল ক'রে সে খেতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না। সর্বক্ষণ প্রচণ্ড অস্বস্তি এবং টেনসানে তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাবে। এর চেয়ে মুকুটনাথ মহেশ্বরী বা রেবতী যদি কিছু বলতেন, সে তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলতে পারত। প্রবল মানসিক চাপ নিয়ে সময় কাটানো যে কতটা কষ্টকর, প্রতি মুহূর্তে কিরণ টের পাচ্ছে।

এই দু'দিন বেশির ভাগ সময়টাই নিজের ঘরে কাটিয়ে দিয়েছে কিরণ। জানালার পাশে বা সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ, পাখি, দূরের হাইওয়ে, ধরমপুরা টাউনের নানা দৃশ্য অথবা আরো দূরের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে বার বার প্রভাকরের মুখ যেন কোনো অদৃশ্য টি. ভি-র পর্দায় ফুটে উঠেছে। দিল্লিতে থাকতে শেষের দিকে রোজই প্রভাকরের সঙ্গে দেখা হ'ত। এটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই দু'দিনেই মনে হচ্ছে, যেন কত বছর কি কত যুগ সে তাকে দেখেনি।

এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় রেবতী বা মুকুটনাথ একবারও তার ঘরে আসেনি। তবে সুষ্মা বার কয়েক দরজার সামনে এসে মুখ বাঁকিয়ে এমনভাবে তাকিয়েছে যাতে তার চোখ থেকে অসীম ঘৃণা ঈর্ষা এবং রাগ ফেটে বেরিয়ে এসেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই এই মেয়েটা তাকে ঈর্ষা করে আসছে। তার সঙ্গে সুষ্মার আজন্মের শত্রুতা। কিরণ যেন তাকে তার সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে অনবরত বঞ্চিত করে চলেছে।

সুষ্মা শুধু কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়েই চলে গেছে, একটি কথাও বলেনি। একমাত্র মহেশ্বরী একবার ক'রে তাকে নিচে ডাকিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যবহার

অত্যন্ত সদয়। কিরণকে কাছে বসিয়ে তার গালে মাথায় এবং পিঠে সস্নেহে শাঁসহীন কঙ্কালসার আঙুল বুলোতে বুলোতে দিল্লির কথা, হোস্টেলের বন্ধুবান্ধব বা অধ্যাপিকাদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু যা শোনার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তার ধারকাছ দিয়েও যাননি। অনাবশ্যক মধুর কথাবার্তাতেই সময় কাটিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুমার ঘরেই অবশ্য রেবতী, বশিষ্ঠনারায়ণ বা মুকুটনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কুলগুরু ছাড়া বাবা-মা কচিৎ দু-একটি কথা বলেছেন। যা বলেছেন তা থেকে আদৌ আঁচ পাওয়া যায়নি, আচমকা কেন, কোন উদ্দেশ্যে কিরণকে তাঁরা ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন।

দুটো দিন মারাত্মক অনিশ্চয়তা এবং টেনসানে কাটাবার পর কিরণ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর অপেক্ষা করবে না। সরাসরি মুকুটনাথকে জিজ্ঞেস করবে, কেন তোমরা কৌশলে, চতুর চাল চেলে এখানে ধরে এনেছ ?

কিরণ জানে, এই প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে মুকুটনাথ রাগে এবং উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন। 'মিশ্র নিকেত'-এর তিনি একমাত্র ডিকটেটর। তাঁর মুখের ওপর এ পর্যন্ত কেউ কখনও কথা বলেনি, তাঁর কাজের প্রতিবাদ কেউ করেনি। এ বাড়িতে একটা অলিখিত নিয়ম আবহমান কাল চালু রয়েছে। সেটা এইরকম— 'মিশ্র নিকেত'-এর প্রধান পুরুষটি যা বলবে যা করবে তাতে নিঃশর্ত সায় দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষানুক্রমে মেয়েরা এখানে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

কিন্তু কিরণ কিছুতেই তা করবে না। এর ফলাফল যা-ই হোক না, কনফ্রনটেসন বা মুখোমুখি সংঘাতের জন্য এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছে সে।

তা ছাড়া এখানে থাকার আর উপায় নেই। দিল্লিতে তার প্রচুর কাজ। পরীক্ষাও এসে যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাবার যে কারণটা সবচেয়ে প্রবল তা হ'ল পেটের সেই ভ্রূণটি। প্রতিদিন সে একটু একটু করে বড়ো হচ্ছে। এক-আধ মাসের ভেতর কিরণের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে, সে গর্ভবতী।

তাড়াহুড়ো ক'রে চলে আসার জন্য প্রভাকরের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত ক'রে আসতে পারেনি কিরণ। তাকে একটা চিঠি লেখা খুবই দরকার। তার থেকেও যেটা বেশি জরুরি তা হ'ল দিল্লিতে ফিরে যাওয়া।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আজ প্রভাকরকে চিঠি লিখতে বসেছে কিরণ।

জানালা দিয়ে আকাশের একটা চৌকো টুকরো চোখে পড়ে। সেখানে ফাল্গুনের ঝলমলে রোদ আর ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশী 'শুগা'। এই বুনো টিয়ারা অঘ্রান পৌষে ধান পাকতে না পাকতেই দিগন্ত পেরিয়ে কোত্থেকে যেন ধরমপুরার চারপাশের শস্যক্ষেত্রগুলোতে চলে আসে। মাঠ থেকে ধান উঠে যাবার পরও কিছুদিন তারা এখানে থেকে যায়। তারপর শীতের দাপট কমে এলে ফাল্গুনের শুরু থেকেই আবার ফিরে যেতে থাকে।

আকাশ, ফাল্গুনের অঢেল রোদ বা বুনো টিয়ার ঝাঁক, কোনো দিকেই লক্ষ ছিল না কিরণের। সে বিছানায় বসেই প্যাডের কাগজে চিঠি লিখে চলেছে, কিন্তু দু-তিনটে লাইন লিখতে না লিখতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সুষ্‌মা। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কুটিল চোখে কিছুক্ষণ কিরণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছাখে। তারপর ডাকে, 'এই যে মেমসাব—'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ। সুষ্‌মাকে এই মুহূর্তে সে এখানে আশা করেনি। মনে মনে নিজের এই ছোট বোনটিকে ভয় করে কিরণ, তাকে দেখলেই এক ধরনের অস্বস্তিতে তার ভেতরটা ভরে যায়।

কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবি ?'

সুষ্‌মা বলে, 'নিচে দাদীর কামরায় তোকে ডাকছে—'

এ বাড়িতে আট-দশটা নৌকর নৌকরানী থাকতে সুষ্‌মা নিজে কেন এই খবরটা দিতে এসেছে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। নিশ্চয়ই মহেশ্বরীর ঘরে গেলে আজ এমন কিছু ঘটবে যার ফলাফল কিরণের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। কিরণের লাঞ্ছনায় যে সব চেয়ে সুখী হয় সে সুষ্‌মা। সেই কারণেই সে এখানে ছুটে এসেছে।

কিরণ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দাদীর ঘরে আমাকে কে যেতে বলেছে ?'

সুষ্‌মা বলে, 'গেলেই দেখতে পাবি।'

একটু চিন্তা ক'রে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কেন ডেকেছে জানিস ?'

'জানি।' সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিয়েই চুপ করে যায় সুষ্‌মা।

'কেন ?'

'বলব না। দের নেহী' করনা মেমসাব। পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি করলে বাবুজি এসে চুলের ঝুঁটি ধরে তোকে নিয়ে যাবে।' ব'লে আর একটি মুহূর্তও দাঁড়ায় না সুষ্‌মা, দরজার কাছ থেকে একতলার সিঁড়ির দিকে চলে যায়।

এটুকু জানা গেল, মহেশ্বরীর ঘরে মুকুটনাথ আছেন। আর কে কে আছে,

অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। যে-ই থাক, মনে হচ্ছে কনফ্রনটেশনটা আজই হয়ে যাবে।

সুষ্মা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে না কিরণ। মনে মনে রণকৌশলটা স্থির করে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে প্যাড এবং কলমটা বিছানাতেই নামিয়ে রেখে সে ঘরের বাইরে চলে আসে। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় মহেশ্বরীর ঘরের দিকে যেতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময়ই নেয়। মহেশ্বরী মুকুটনাথ রেবতী এবং কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ ছাড়া আর কেউ নেই। খানিকটা দূরে বারান্দার এক ধারে সুষ্মা দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই তাকে মহেশ্বরীর ঘরে যেতে বারণ করা হয়েছে। চোখাচোখি হতেই হিংস্র ভঙ্গিতে সে কিরণের দিকে তাকায়, তবে এখন আর কিছু বলে না।

সুষ্মার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিরণ মহেশ্বরীর ঘরের ভেতর চলে আসে। বশিষ্ঠনারায়ণকে বাদ দিলে বাকি তিনজনের মুখ থমথমে, গম্ভীর। সে টের পায়, বিস্ফোরণটা আজ ঘটতে চলেছে।

কিরণ ঢুকতেই বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে কোমল স্বরে বলেন, 'আও বেটী, ইঁহা বৈঠো—' মহেশ্বরীর সুবিশাল খাটের একটি কোণ দেখিয়ে দেন তিনি।

খাটের আরেক ধারে রেবতী বসে আছেন। একটু দূরে দু'টি চেয়ারে বসেছেন বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ। কিরণ খাটের ধারে বসতেই মুকুটনাথ উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আসেন। কিরণ বুঝতে পারে, এই ঘরে যে উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে আনা হয়েছে সেটা বাইরে জানাজানি হোক, সেটা কেউ চান না।

স্নায়ুগুলো টান টান ক'রে এক পলক সবাইকে লক্ষ করে কিরণ, তারপর অপেক্ষা করতে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণকে খুব ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে কিরণ। কোনো কারণেই তিনি উত্তেজিত হ'ন না। পার্থিব সব ব্যাপারেই তাঁর অসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। সর্বক্ষণ তাঁর মুখে স্বর্গীয় মধুর হাসির কোটিং লাগানো। হাত-পা বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই হাসিটি তাঁর জন্মসূত্রেই যেন পাওয়া।

প্রথম দু'তিন মিনিট কেউ একটি কথাও বলেন না। 'মিশ্র নিকেত'-এর এই বিশাল ঘরটিতে অপার নৈঃশব্দ্য নেমে আসে যেন। সমস্ত আবহাওয়াটাই অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

একসময় মুকুটনাথ এভাবে শুরু করেন, 'তোর কলেজ থেকে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।'

পলকের জন্য কিরণের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড জমাট বেধে যায়। তারপর প্রচণ্ড জোরে ধক ধক করতে থাকে। মনে হয়, কয়েক শ' তেজী ঘোড়া সেখানে ছুটে চলেছে।

কিরণ উত্তর দেয় না। সে বুঝতে পারে চিঠিটা লিখছেন তার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কী লিখেছেন তিনি? নিশ্চয়ই এমন কিছু মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে মুকুটনাথ খুবলালকে দিল্লি পাঠিয়ে তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন। যতই বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা করুক কিরণ কিংবা মনে মনে রণকৌশল ঠিক করে রাখুক, সে টের পায়, শ্বাস আটকে আসছে।

মুকুটনাথ ফের বলেন, 'চিঠিতে কী লিখেছে তুই জানিস?'

কিরণ নিচু গলায় বলে, 'না।'

হঠাৎ ডান হাতটা কিরণের দিকে তুলে তর্জনী নাচাতে নাচাতে মুকুটনাথ কর্কশ গলায় বলে ওঠেন, 'মিশ্র বংশকে তুই নরকে নামিয়ে এনেছিস।'

তবে কি পেটের সেই ভ্রূণটার কথা জানিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল? কিন্তু প্রভাকর এবং সে ছাড়া এ খবর পৃথিবীর আর কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। তা হ'লে?

ক্ষীণ গলায় কিরণ বলে, 'তুমি কী বলছ, বুঝতে পারছি না।'

স্বয়ংক্রিয় অদৃশ্য কোনো স্প্রিংয়ের ধাক্কায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। প্রচণ্ড রক্তচাপে তাঁর দুই চোখ যেন ফেটে যাবে। আরক্ত দৃষ্টিতে কিরণকে দেখতে দেখতে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'বুঝতে পারছিস না?'

যে সাহসটুকু একটু আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেটা এবার ফিরে আসে কিরণের মধ্যে। এমনিতে মুকুটনাথের মস্তিষ্ক খুবই ঠাণ্ডা, তার ধাতে অসহিষ্ণুতা বলতে কিছু নেই। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের চিঠিতে বিস্ফোরণের এমন কিছু উপকরণ রয়েছে যাতে তাঁর সংযম বা ধৈর্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

রেবতী পারতপক্ষে সংসারের কোনো ব্যাপারে থাকেন না। 'মিশ্র নিকেত'-এ তাঁর ভূমিকা অনেকটা দর্শকের মতো। তিনি শুধু দেখেই যান, কখনও মন্তব্য করেন না। কিন্তু এবার বাড়ি আসার পর থেকেই কিরণ লক্ষ করেছে মায়ের মুখ সারাক্ষণ পাথরের মতো শক্ত। কিরণের কাছ থেকে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিয়েছেন। তবে এই দু'দিন তাকে কিছুই বলেননি।

এই মুহূর্তে তাঁর চিরকালের শান্ত নির্লিপ্ত স্বভাবটির কথা বুঝিবা ভুলেই গেলেন রেবতী। তীব্র, চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'তুই আমাদের সবার মুখে

চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছিস। এই বংশে যা কোনোদিন ঘটেনি, তুই তাই ক'রে বসলি।'

মায়ের এরকম উগ্র ভয়ঙ্কর চেহারা আগে কখনও দ্যাখেনি কিরণ। উত্তেজিত হ'তে গিয়েও নিজেকে দ্রুত সামলে নেয় সে। শান্ত মুখে বলে, 'তোমরা এভাবে বলছ কেন? আমি অন্যায় কিছু করিনি।'

আরক্ত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মুকুটনাথ। কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে তিনি চেঁচাতে থাকেন, 'বেশরম লেড়কী, বংশের নাম ডুবিয়ে আবার সাফাই গাইছে, কিছু করিনি। তোকে আমি মাটিতে পুঁতে ফেলে দেব। এমন লেড়কীর দরকার নেই আমার।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে কী হবে, মুকুটনাথ যেভাবে চিৎকার করছেন তাতে আধ মাইল দূরের লোকও প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাবে।

এবার হাত তুলে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'শান্ত হো যাও মুকুটনাথ। এত উত্তেজনা তোমার শরীরের পক্ষে ভাল না—বহোত বুরা। যা বলার আস্তে আস্তে বল। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখতে হয়।'

কুলগুরুর কথায় কিছুটা কাজ হয়। গজ গজ করতে করতে আবার বসে পড়েন মুকুটনাথ।

বিছানার সঙ্গে প্রায় লেপটে মহেশ্বরীর কঙ্কালসার শরীর পড়ে আছে। এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েই ছিলেন তিনি। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে তীব্র শ্লেষের গলায় বলে উঠলেন, 'বানা, মেয়েকে মেমসাব বানা। যখনই মেয়েকে দিল্লি পাঠালি, তখনই জানি এরকম কিছু একটা ঘটবে। পাঠাতে বারণ করেছিলাম, কিন্তু তোরা আমার কথা কানে তুললি না।'

সেই সাত আট বছর বয়সে দিল্লির কনভেণ্টে নিয়ে গিয়ে যখন তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় সেই সময় আদৌ এ জাতীয় কথা মহেশ্বরী বলেছিলেন কিনা কিরণ মনে করতে পারে না। সে চোখের কোণ দিয়ে একবার ঠাকুমাকে দেখে নেয়।

আগের তুলনায় গলা অনেকটা নামিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'হাঁ, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়।' বলেই সোজাসুজি কিরণের চোখের দিকে তাকান, 'প্রভাকর কে?'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা খেলে যায় কিরণের। সে বুঝতে পারে, এতক্ষণ যা চলছিল সেটা ভূমিকা মাত্র। এবার আসল যুদ্ধটা শুরু হবে।

এত আকস্মিকভাবে মুকুটনাথ প্রশ্নটা করেছেন যে এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না কিরণ। কী উত্তর দেবে যখন সে ভাবছে সেইসময় রুক্ষ ভঙ্গিতে আবার মুকুটনাথ বলেন, 'চুপ ক'রে রইলি কেন ? বল—'

কিরণ বুঝতে পারে, প্রিন্সিপ্যাল নিশ্চয়ই প্রভাকরের কথা জানিয়ে দিয়েছে। উত্তেজনাশূন্য মুখে বলে, 'একজন প্রফেসর।'

'তোদের কলেজের ?'

'না। আমাদের কলেজের সবাই মহিলা প্রফেসর।'

'তবে ?'

'অন্য কলেজের।'

'তার সঙ্গে তুই দিল্লির বস্তিতে আর চারপাশের গাঁওগুলোতে ঘুরে বেড়াস ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'আমরা সোসাল ওয়ার্ক করি।'

'সেটা কী ?'

কী ধরনের কাজ তাদের অর্গানাইজেসন করে থাকে, সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় কিরণ।

দাঁতে দাঁত চেপে মুকুটনাথ বলেন, 'আমি কি তোকে সোসাল ওয়ার্কার হওয়ার জন্য দিল্লি পাঠিয়েছিলাম ?'

কিরণ উত্তর দেয় না।

মুকুটনাথ কিন্তু কিরণকে ছাড়েন না। তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'মুখ বুজে আছিস কেন ? বাতা, বাতা। আভী, রাইট নাউ।'

কিরণ বলে, 'না। তুমি আমাকে মেমসাহেব বানাবার জন্যে পাঠিয়েছিলে। কিন্তু—'

'কী ?'

'প্রভাকরের সঙ্গে মেশার পর আমার মনে হয়েছে সোসাইটির ব্যাপারে আমার কিছু দায়িত্ব আছে।'

কিরণের কাছ থেকে এ জাতীয় উত্তর কেউ আশা করেননি। মহেশ্বরীর এই একতলার ঘরটায় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপরেই বিস্ফোরণ ঘটে যায় যেন। প্রবল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। চিৎকার করে বলেন, 'বহুৎ বড়ী রেসপনসিবিলিটিবালী আয়ী হ্যায়! সোসাইটির দায়িত্ব নেবার জন্যে

তোকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল? এর জন্যে পোলিটিসিয়ানরা আছে, সোসাল ওয়ার্কাররা আছে।'

মুকুটনাথের এই প্রতিক্রিয়ার জন্য কিরণ মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। সে সাহস হারায় না। এতকাল 'মিশ্র নিকেত'-এর মেয়েদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাদের আচার আচরণ, চলাফেরা, রাহান সাহন, সব কিছুই এই বংশের পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দিল্লিতে কয়েক বছর কাটানোর পর, বিশেষ ক'রে প্রভাকরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কিরণ আগাগোড়া পালটে গেছে। 'মিশ্র নিকেত'-এর বৈশিষ্ট্যহীন, অতি সাদামাঠা, ভীরু একটি মেয়েকে আর তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে এখন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণী, দিল্লি এ ক'বছরে একটু একটু করে তাকে শাণিত করে তুলেছে।

খুব শান্ত গলায় কিরণ বলে, 'সোসাইটির কাজ করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। এর জন্য পোলিটিসিয়ান বা সোসাল ওয়ার্কার হবার দরকার নেই।'

শরীরের সব রক্ত লাফিয়ে মাথায় উঠে আসে মুকুটনাথের। গলার কাছের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে যায়। প্রবল রক্তচাপে চোখ দুটো ফেটে যাবে যেন। মুকুটনাথ গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে ফের আগের সেই প্রশ্নটা করেন, 'সোসাইটির দেখভাল করার জন্যে তোকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল?'

নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে এবারও কিরণ বলে, 'না।'

কণ্ঠস্বর আগের পর্দায় রেখেই মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তবে কিসের জন্যে? হোয়াই?'

মুকুটনাথের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিরণ বলে, 'ভবিষ্যতে মন্ত্রী হতে পারে এমন একজন পোলিটিসিয়ানের পুতহু হবার জন্যে মেমসাহেব বানাতে। কিন্তু—'

রক্তাভ চোখে তাকিয়ে মুকুটনাথ প্রশ্ন করেন, 'কী?'

'দিল্লিতে গেলে সোসিয়েলাইটও হওয়া যায়, আবার মানুষের মতো মানুষও হ'তে অসুবিধা নেই। ওখানে অনেক রাস্তা খোলা আছে। যার যেমন রুচি সে তেমন রাস্তা বেছে নেয়।'

'লেকচার দিতে হবে না। তোমাকে একটা রাস্তাই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুসরা রাস্তা ঢুঁড়তে কেউ বলেনি।'

কিরণ কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ

বলে ওঠেন, 'শান্ত্ হো যাও মুকুটনাথ, শান্ত্ হো কর বৈঠো। এত উত্তেজনা তোমার ভবিষ্যতের পক্ষে আচ্ছা নেহী ।'

খাটে শুয়ে এতক্ষণ বেশ ভয়ে ভয়েই সব শুনছিলেন মহেশ্বরী। এবার বলেন, 'হাঁ হাঁ, বৈঠ্, মুকুট, বৈঠ্ ।'

কুলগুরু এবং মায়ের সম্মান রাখতেই আস্তে আস্তে বসে পড়েন মুকুটনাথ। গলা নামিয়ে বলতে থাকেন, 'কত বড়ো সাহস, বাপের মুখের ওপর কথা বলছে! এমন লেড়কী মিশ্র বংশে আগে আর জন্মায়নি। বেশরম কাঁহীকা!'

বশিষ্ঠনারায়ণ মৃদু ধমকের গলায় বলেন, 'আ মুকুটনাথ, শির ঠাণ্ডা রাখো। ক্রোধ বহুৎ বুরা চীজ।'

মুকুটনাথ আর কিছু বলেন না, বিরক্ত চোখে কিরণকে একবার লক্ষ ক'রে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবার কিরণের দিকে ফিরে বলেন, 'বেটা, প্রভাকরের ঘর কোথায়?'

কিরণের স্নায়ুগুলো সতর্ক হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল-দের মতো উলটো পালটা জেরা করে প্রভাকর সম্পর্কে অনেক খবর বার করে নিতে চেষ্টা করবেন বশিষ্ঠনারায়ণ। কিরণ বলে, 'মহারাষ্ট্রে।'

'দিল্লিতে কী করে সে?'

'বললাম তো, কলেজের প্রফেসর।'

'পণ্ডিত আদমী?'

'হ্যাঁ।'

'উমর কত?'

তিরিশের মতো।'

নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে যায় বশিষ্ঠনারায়ণের। বলেন, 'লেড়কা জোয়ান!'

তাঁর বলার ভঙ্গিতে গভীর একটা ইঙ্গিত ছিল, কিরণ উত্তর দেয় না।

বশিষ্ঠনারায়ণ একটু চিন্তা ক'রে আবার বলেন, 'তুমি ত বললে প্রভাকরের সঙ্গে সমাজের সেবা করতে···'

'হ্যাঁ।' মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয় কিরণ।

'কী ধরনের সেবা?'

দিল্লিতে তারা কী কী করত, আরেক বার জানিয়ে দেয় কিরণ।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'কাজটা ভালই। লেকেন পড়াশোনা বন্ধ ক'রে এ সব করা ঠিক না।'

কিরণ বলে, 'পড়াশোনা বন্ধ ক'রে আমি কিছুই করিনি। কলেজ ছুটির পর সোসাল ওয়ার্ক করতাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর বশিষ্ঠনারায়ণ ফের এভাবে শুরু করেন, 'বেটা, তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল লিখেছেন, তুমি নাকি সমাজের কাজ সেরে রোজই অনেক রাতে কলেজে ফিরতে।'

কিরণ চমকে ওঠে। প্রিন্সিপ্যাল রাত ক'রে হস্টেলে ফেরা ছাড়া আর কিছু জানিয়েছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য তার এখনও ধারণা, পেটের ভ্রূণটার কথা সে এবং প্রভাকর ছাড়া আর কেউ জানে না। বাড়ির সবাই কতটা কী জানতে পেরেছে, এখনই বোঝা যাবে। এই মুহূর্তে অস্থির বা উত্তেজিত হ'লে সব গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্নায়ুগুলো টান টান করে কিরণ শান্ত, সংযত গলায় বলে, 'রোজ দেরি ক'রে আসতাম না। দু-একদিন ফিরতে দেরি হয়েছে।'

'আচ্ছা বেটা—'

'বলুন—'

'প্রভাকরের কী জাত?'

বশিষ্ঠনারায়ণ দুম ক'রে এরকম একটা প্রশ্ন করে বসবেন, কিরণের কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। ভেতরে ভেতরে সে হকচকিয়ে যায়, তবে নিজের অস্থিরতা বাইরে ফুটে উঠতে দেয় না। জিজ্ঞেস করে, 'জাত দিয়ে কী হবে?'

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'কিছুই হয়ত হবে না। জানার ইচ্ছা হ'ল, তাই—'

প্রভাকরের জাতপাত সম্পর্কে প্রশ্ন করার পেছনে বশিষ্ঠনারায়ণের নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিরণ মনস্থির করে ফেলে, সব কথার সোজাসুজি উত্তর দেবে। ক'দিন ধরে প্রবল স্নায়বিক চাপে তার মস্তিষ্ক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে সে পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়বে। সে চায়, ভালমন্দ যা ঘটার আজই ঘটে যাক। বেপরোয়া ভঙ্গিতে কিরণ এবার বলে, 'প্রভাকররা খ্রিস্টান। অচ্ছুত হিন্দু থেকে তিন পুরুষ আগে ওরা খ্রিস্টান হয়েছে।'

কিরণ ছাড়া বাকি চারটি মানুষের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন একেবারে থেমে যায়। সারা ঘরটা মুহূর্তে বায়ুশূন্য হয়ে যায় যেন। একই সঙ্গে যে যুবক খ্রিস্টান এবং অচ্ছুত, তার সঙ্গে পবিত্র মিশ্র বংশের একটি মেয়ে সোসাল ওয়ার্ক করতে বেরিয়ে

অনেক রাতে হোস্টেলে ফিরেছে—এমন মারাত্মক ঘটনার কথা আগে এ বাড়ির কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেনি।

স্তব্ধতা চুরমার ক'রে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠেন মুকুটনাথ, 'খ্রিস্টান, অচ্ছুত! তুই তার সঙ্গে সমাজ সেবা করতে যাস দিল্লিতে!'

এদিকে তীক্ষ্ণ সরু গলায় মড়াকান্না জুড়ে দেন মহেশ্বরী, 'হো ভগোয়ান শিউ-শঙ্কর, হো বিষুণজি, কিরণ এ কী বলছে!'

. কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ, কোনো কারণেই যিনি বিচলিত হ'ন না, হাত তুলে চতুর ডিপ্লোম্যাটদের মতো মহেশ্বরী এবং মুকুটনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'এত হৈচৈ করলে চলে! চারদিকে নৌকর নৌকরানীরা রয়েছে। তাদের কানে এসব গেলে পুরা ধরমপুরা টৌনে রটিয়ে বেড়াবে। তাতে মিশ্র বংশের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। আস্তে কথা বল মুকুটনাথ। মহেশ্বরী, রোনাউনা (কান্নাকাটি) বিলকুল বন্ধ্‌।'

মহেশ্বরীর কান্নার আওয়াজ স্তিমিত হয়ে আসে। মুকুটনাথ গলা নামিয়ে গজ গজ করতে থাকেন, 'আপনিই বলুন গুরুজি, এ সব শোনার পর মাথা ঠিক রাখা যায়!'

'সমঝা মুকুটনাথ। লেকেন বিপদের সময় মাথা ত ঠিক রাখতেই হবে। ধৈর্য ধর, মন থেকে উত্তেজনা বার ক'রে দাও। শিউশঙ্করজি সব সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।'

মুকুটনাথ উত্তর দেন না, মুখ নামিয়ে চাপা গলায় গজরাতে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবার কিরণকে বলেন, 'প্রভাকরের সঙ্গে তোমার এত মেলামেশা করা ঠিক হয়নি বেটা...'

কিরণ বলে, 'কেন, প্রভাকর অচ্ছুত আর খ্রিস্টান বলে?'

'তা বলতে পার। তোমাদের এত বড়ো, মহান ব্রাহ্মণ বংশ। যার তার সঙ্গে মেলামেশা ঠিক না।

'একটা কথা সবার মনে রাখা দরকার গুরুজি।'

'কী?'

'স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ কায়াথ অচ্ছুত, সব সমান। কেউ উঁচাও না, নিচাও না!'

বশিষ্ঠনারায়ণ মধুর হেসে বলেন, 'তাই কখনও হ'তে পারে! ভগোয়ান করম-ফল অনুযায়ী কাউকে উঁচা, কাউকে নিচা করে পাঠিয়েছেন। জবরদস্তি ক'রে

সবাইকে বরাবর করা যাবে না। ভগোয়ানের কানুনের বাইরে যারা যেতে চায় তাদের মতলব হ'ল সনাতন ধরমকে বিনাশ করা। লেকেন তা হ'তে দেওয়া যায় না।'

কিরণ বুঝতে পারে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন গোঁড়ামি আর সংস্কার বশিষ্ঠনারায়ণদের মতো কুলগুরু টাইপের শ্রেণীটির রক্তে ভাইরাসের মতো মিশে আছে। খুব সহজে সেগুলো থেকে তাদের মুক্ত করা যাবে না। মানুষের চেয়ে তাদের কাছে অনেক বড়ো হ'ল জাতপাত এবং ছুৎমার্গের সওয়াল। আবহমান যা চলে আসছে, এদের ইচ্ছা তা-ই চলতে থাক। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ কিংবা অচ্ছুত, সবাই উঁচু উঁচু বাউণ্ডারি-ওয়াল তুলে আলাদা আলাদা খোপের মধ্যে নিজেদের পুরে রাখুক। কোনোভাবেই যেন দেওয়াল ভেঙে একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে না পারে। স্থিতাবস্থায় চিড় ধরুক, এটা তাদের কাম্য নয়। পুরনো ভারতবর্ষের ধর্মান্ধতা আর সংস্কার থেকে এক পা-ও এরা সামনের দিকে বাড়াবে না। প্রাচীন ধ্যান-ধারণা নিয়ে এরা এ দেশকে মধ্যযুগের জীর্ণ কিংখাবে আটকে রাখতে চায়।

কিরণ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বশিষ্ঠনারায়ণ ফের বলে ওঠেন, 'তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে বেটা—'

কিরণ হকচকিয়ে যায়, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না গুরুজি—'

'আমাদের ধারণা তুমি এমন কিছু করনি যাতে এত বড়ো মিশ্র বংশের সম্মান নষ্ট হয়।'

বশিষ্ঠনারায়ণের কথায় সূক্ষ্ম এবং চোরা কোনো ইঙ্গিত রয়েছে কী ? কিছুক্ষণ সতর্ক চোখে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ করে কিরণ। তারপর বলে, 'আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী মনে হয় না এখন পর্যন্ত কোনোরকম অন্যায় করেছি।'

বশিষ্ঠনারায়ণ উদার হেসে বলেন, 'ঠিক বাত। এত বড়ো বংশের মেয়ে হয়ে বুরা গান্ধা কাম তোমার পক্ষে সম্ভব না।'

কিরণ চুপ ক'রে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণ আবার বলেন, 'তোমাকে একটা দরকারী কথা বলার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে বেটা—'

কিরণ মুখ তুলে তাকায়, তবে এবারও কিছু বলে না। শুধু সতর্ক ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ত্রিকূটজি খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন কিরণ বেটা—'

কথাটা এত আচমকা বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ফেলেছেন যাতে কিরণের স্নায়ুতে রীতিমত ধাক্কা লাগে। তিনি ঠিক কী জানাতে চান, বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করে, 'কোন ত্রিকূটজি?'

বশিষ্ঠনারায়ণ হাসেন। তাঁর হাসিটি একই সঙ্গে প্রাণখোলা এবং স্নিগ্ধ। তাঁর স্বভাব এবং মুখমণ্ডলের এটি একটি বড়ো রকমের শোভা। কুলগুরুদের এ জাতীয় অ্যাসেট থাকা বোধহয় অত্যন্ত জরুরি। মজার ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'কী আশ্চর্য, নিজের শ্বশুরের নাম ভুলে গেছ!'

ত্রিকূটজি অর্থাৎ ত্রিকূটনারায়ণ দুবে। বশিষ্ঠ পুরো নাম না বলায় প্রথমটা ধরতে পারেনি কিরণ। সে কিছু বলে না, চুপ ক'রে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ত্রিকূটজির ইচ্ছা, এই মাসেই তোমাদের শাদিটা চুকিয়ে ফেলেন।'

হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় কিরণের। শিরদাঁড়ার ভেতর বরফের স্রোত নামতে থাকে। কাঁপা, আড়ষ্ট গলায় সে বলে, 'লেকেন—'

'কী বেটা?'

'দু'মাস পর আমার পরীক্ষা—'

'ঠিক হ্যায়। পরীক্ষা যখন হবার তখন ঠিক হবে। দু'মাস অনেক সময়। তার মধ্যে শাদিটা হয়ে যাক।'

কিরণ ভয় পেয়ে যায়। একটি চতুর চালে তাকে বোকা বানিয়ে কী উদ্দেশ্যে ধরমপুরায় টেনে আনা হয়েছে, আগে ঘুণাক্ষরেও টের পেলে সে এখানে আসত না। তার মনে হয়, বাবা মা কুলগুরু ঠাকুমা এবং ত্রিকূটনারায়ণ—সবাই মিলে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য এই ষড়যন্ত্রটি করেছেন। এখান থেকে যেভাবেই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাকে দিল্লি ফিরে যেতেই হবে। সে জন্য যেটা প্রয়োজন তা হ'ল ধৈর্য এবং কৌশল। মা বাবা বা কুলগুরুর মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেনই। একমাত্র পরীক্ষার ওপর জোর দিলে হয়ত তাকে দিল্লিতে ফিরতে দিতে পারেন।

কিরণ বলে, 'বিয়ের পর কতরকম বাধা আসে। নতুন জায়গায় গিয়ে পড়াশোনায় মন বসানো মুশকিল।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'বাধা যাতে না আসে আমরা ত্রিকূটজিকে তার ব্যবস্থা করতে বলব। চিন্তা নেহী করনা বেটা।'

'আপনি যতই বলুন, বাধা পড়বেই। এত বছর পড়াশোনা করলাম, টেস্টও হয়ে গেছে। আর দু'মাস পর ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে পারলেই আমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাব। আপনারা এক কাজ করুন গুরুজি—'

'কী?'

'পরীক্ষার পর বিয়ের তারিখ ঠিক করুন।'

'তা হয় না।'

'কেন?'

'ফাল্গুন মাসে বিয়ে না হ'লে সেই শাওনের আগে সম্ভাবনা নেই। বৈশাখে তোমার মা আর পিতাজির শাদি হয়েছে। ওই মাহিনায় সন্তানের শাদি হওয়া ঠিক না। জেঠ মাহিনায় জ্যেষ্ঠ সন্তানের শাদি না হওয়াই ভাল। এই সাল আষাঢ়ে শাদির তারিখ নেই। তা হ'লে বুঝতেই পারছ, শাদিটা ফাল্গুনে হওয়া কতটা জরুরি।'

ফাল্গুনে বিয়ের পক্ষে সবরকম অজুহাতই সাজিয়ে রেখেছেন বশিষ্ঠনারায়ণরা। সেগুলোর বিরুদ্ধে আরও জোরালো যুক্তি খাড়া ক'রে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলে সে দিল্লি চলে যেতে পারবে। আর দিল্লি গিয়ে দেরি করবে না, প্রভাকরকে নিয়ে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে চলে যাবে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'তা ছাড়া—'

কুলগুরুর চোখের দিকে তাকিয়ে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'তা ছাড়া কী?'

'শাদির ব্যাপারে ত্রিকূটজিরা আর দেরি করতে চাইছেন না। ওঁর মায়ের উমর হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে নাতির শাদি দেখে যেতে চান।'

মহেশ্বরী এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বলেন, 'আমার বয়েসও শ-ও হ'তে চলল। আমারও ইচ্ছা, মরার আগে কিরণের শাদিটা দেখে যাই। এই জন্যেই হয়ত শিউশঙ্করজি আমাকে কাশীধাম থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

দুবে এবং শর্মা বংশের দুই বৃদ্ধা এক শ' বছরের কাছাকাছি পৌঁছেও যে মরতে পারছেন না, তা শুধু কিরণের বিয়ের জন্য। এই বিয়েটাই তাঁদের মৃত্যুর পক্ষে একমাত্র বাধা। শুভ কাজটা হয়ে গেলেই তাঁরা অপার শান্তিতে চোখ বুজতে পারেন। ব্যাপারটার মধ্যে সেন্টিমেণ্ট এবং আবেগ জড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে কিরণ বলে, 'আমার দাদী কি দুবেজির মা এতদিন যখন বেঁচে আছেন, আর ক'টা মাস শিউশঙ্করজি নিশ্চয়ই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবেন। ভগোয়ানের পূজা চড়িয়ে বলব, আমার শাদির আগে তাঁদের যেন কিছু না হয়।'

মুকুটনাথ ভারী গমগমে গলায় এবার বলে ওঠেন, 'আমি তোমার কোনো বাহানা শুনব না। এই মাসেই তোমার শাদি হবে। ত্রিকূটজিকে সেইরকম কথা দিয়েছি।'

বাবার মারমুখী চেহারা কিরণকে অনেকখানি দমিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে আরেক বার আগের কথাটাই সে বলে, 'এতদূর এগিয়ে শুধু ক'টা মাসের জন্যে আমি গ্র্যাজুয়েটটা হ'তে পারব না?'

মুকুটনাথ বলেন, 'কী জন্যে তোমাকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল, নিশ্চয়ই মনে আছে? ত্রিকূটজি আর আমি চেয়েছিলাম, তুমি ভাল করে ইংলিশ বলতে পারবে, মেমসাহেবদের রাহান সাহান রপ্ত করে নেবে। সে দুটো হয়ে গেছে, ব্যস। গ্র্যাজুয়েট হ'লে নতুন করে তিনটে ল্যাজ আর চারটে হাত গজাবে না।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'বি. এ পাস করাটা আমার খুব দরকার।'

'কিসের দরকার? তুমি কি নৌকরি উকরি করবে যে ইউনিভার্সিটির একটা স্ট্যাম্প নিতে হবে!'

কিরণ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ে। বিরক্ত মুখে সেদিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় মুকুটনাথ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কৌন?'

একটি ভীরু কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে ভেসে আসে 'আমি ঘাসিয়া—'

ঘাসিয়া এ বাড়ির ডজনখানেক নৌকরদের একজন। আগের গলাতেই মুকুটনাথ বলেন, 'কী চাই?'

'দুবেজি আয়া হুজৌর—'

দুবেজি অর্থাৎ ত্রিকূটনারায়ণ দুবে। শশব্যস্ত মুকুটনাথ বলেন, 'দুবেজিকে খাতিরদারি করে বাইরের ঘরে বসা। আমি আসছি।'

ঘাসিয়া বলে, 'বসিয়েছি সরকার।'

'ঠিক হ্যায়।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ।

এদিকে ত্রিকূটনারায়ণের আসার খবরে এলোপাথাড়ি হাতুড়ি পেটানোর শব্দের মতো কিরণের বুকের ভেতর কিছু একটা ঘটতে থাকে।

পাশের ঘরে ত্রিকূটনারায়ণকে যথেষ্ট যত্ন ক'রে সসম্ভ্রমে বসানো হয়েছে। তিন চারটে নৌকর তটস্থ হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। মুকুটনাথের ভাবী 'সমধী' বা বেয়াই ত্রিকূটনারায়ণের 'মিশ্র নিকেত'-এ কতটা মর্যাদা, সে সম্বন্ধে এ বাড়ির কাকপক্ষী থেকে কুকুর বেড়াল পর্যন্ত সবাই সচেতন।

ত্রিকূটনারায়ণ একাই আসেননি, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রোহিণীও এসেছেন। রোহিণীর সর্বাঙ্গে—সিঁথি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত—সোনা চাঁদি হীরে মুক্তোর ঝকমকানি। মহিলার সারা গায়ে যে গয়না রয়েছে তার ওজন কম ক'রে কিলো দেড়েক। যাঁরা রোহিণীকে দু'দিনও দেখেছে তারা জানে সর্বক্ষণ এই গয়না পরেই থাকেন তিনি। এমন কি রাতে শোবার সময়ও করণফুল বা পায়জোড়টি পর্যন্ত খোলেন না। এতটা ওজন দিবারাত্রি কেমন ক'রে যে তিনি বয়ে বেড়ান কে জানে।

ভারী ভারী গয়নার সঙ্গে জমকালো একটি বেনারসী পরে এসেছেন রোহিণী। পায়ে কাচ এবং পুঁতি বসানো ভেলভেটের স্লিপার।

মুকুটনাথ ঘরে এসে ঢুকতেই দু'জনে হাতজোড় ক'রে উঠে দাঁড়ান, 'নমস্তে—'

মুকুটনাথও দুই হাত জোড়া ক'রে বুকের কাছে এনে মাথাটা সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়ে সসম্ভ্রমে বলেন, 'নমস্তে, নমস্তে। কৃপা ক'রে বসুন—'

'আপ বৈঠিয়ে—'

'আপলোগ পহেলে।'

সবাই বসার পর একটা নৌকরকে ডেকে নিচু গলায় মুকুটনাথ বলেন, 'মাঈজিকে গিয়ে বল্, মিঠাই আর ঠাণ্ডাই এ কামরায় পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে এখনই যেন চলে আসেন।'

মাঈজি অর্থাৎ রেবতী। নৌকরটা ঘাড় হেলিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার বলেন, 'শুনলাম মাতাজিকে বনারস ধাম থেকে ফিরিয়ে এনেছেন?'

ত্রিকূটনারায়ণ যে মাতাজির কথা বললেন তিনি মহেশ্বরী। মুকুটনাথ বলেন, 'জি, হাঁ। বৈদ বলল মায়ের শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাই ওখানে আর ফেলে রাখলাম না।'

'ভালই করেছেন।' অনুমোদনের ভঙ্গিতে বললেন ত্রিকূটনারায়ণ।

মুকুটনাথ জানান, 'ঠিক করেছি, মাকে অত দূরে আর পাঠাব না। বাড়িতেই শিউশঙ্করজির মন্দির বানিয়ে দিয়েছি। ভালমন্দ যা হবার আমাদের চোখের সামনেই হোক।'

মুকুটনাথের এই পরিকল্পনায় পুরোপুরি সায় রয়েছে ত্রিকূটনারায়ণের। তিনি মাথা নেড়ে বলেন, 'ঠিক বাত। আমিও শুনেছি, বাড়িতেই আপনি স্বয়ং

বিশ্বনাথজিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।' একটু থেমে মহেশ্বরীর প্রসঙ্গ থেকে একেবারে অন্য বিষয়ে চলে যান, 'আরো একটা খবর আমার কানে এল মুকুটনাথজি—'

এবার সতর্ক ভঙ্গিতে ত্রিকূটনারায়ণকে লক্ষ করেন মুকুটনাথ। খুব আস্তে জিজ্ঞেস করেন, 'কী খবর ?'

'মাতাজিকে যেমন বনারস থেকে নিয়ে এসেছেন তেমনি দিল্লি থেকে কিরণকেও লোক পাঠিয়ে আনিয়েছেন।'

এই ত্রিকূটনারায়ণ দুবে সারা বছরই দিল্লি বম্বে কলকাতা আর পাটনায় ঘুরে বেড়ান। উঁচু সোসাইটিতে তাঁর মেলামেশা। তাঁর পক্ষে নানারকম খবর যোগাড় করা খুবই সহজ ব্যাপার। কিরণ সম্পর্কে গোলমেলে কিছু শুনেই তিনি আজ ছুটে এসেছেন কিনা, এই মুহূর্তে তাঁর মুখচোখ দেখে বলা যাচ্ছে না। মুকুটনাথ সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'হাঁ। ভাবলাম মা আর ক'দিনই বা আছেন। আচানক দেহান্ত্ ঘটে গেলে আপসোস থেকে যাবে, বড়ো নাতনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল না বলে। সেই জন্যেই—'

'আচ্ছাই কিয়া—'

একটু চুপচাপ।

সেই ফাঁকে রেবতী এ ঘরে চলে আসেন। তাঁর পেছন পেছন ঢাউস চাঁদির ট্রে-তে ঠাণ্ডাইয়ের গেলাস এবং মিষ্টির প্লেট নিয়ে একটা নৌকর ঢোকে।

রেবতী সবিনয়ে রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণকে 'নমস্তে' জানিয়ে নিজের হাতে তাঁদের সামনে সরবত এবং মিঠাই সাজিয়ে দেন। মৃদু গলায় বলেন, 'একটু মুহ্-মিঠা করুন।'

'হাঁ-হাঁ, জরুর। আপনি বস্থন—'

একটা বড়ো সোফায় কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বসে পড়েন রেবতী।

ত্রিকূটনারায়ণ সরবতের গেলাস তুলে নিয়ে আলতো চুমুক দিয়ে বলেন, 'যে কথা ভাবছিলাম, কিরণকে দিল্লি থেকে আনিয়ে ভালই করেছেন মুকুটনাথজি। নইলে দু-একদিনের ভেতরে কাউকে পাঠাতে হ'ত।'

মুকুটনাথের সেই সন্দেহটা আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। প্রভাকরের সঙ্গে কিরণের ঘোরাফেরার খবর কি ত্রিকূটনারায়ণের কানে গেছে ? মুকুটনাথের স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যায়। কোনো প্রশ্ন না ক'রে তিনি ত্রিকূটনারায়ণকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে থাকেন।

ত্রিকূটনারায়ণ ফের বলেন, 'কেন দিল্লিতে লোক পাঠাতে হ'ত জানেন ?'

মুকুটনাথের টেনসান কাটে না। আধফোটা গলায় তিনি বলেন, 'কেন ?'

'হরীশের মায়ের ইচ্ছা, এই ফাগুয়ার মাসেই ছেলের শাদিটা চুকিয়ে ফেলে। অনেক দিন ত হয়ে গেল। শুভকাজটা আর ফেলে রাখা ঠিক না।' ত্রিকূটনারায়ণ বলে যান, 'যে কারণে কিরণকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল তা ত হয়েই গেছে। বিলাইতি চাল, রাহান-সাহান, সবই শিখে নিয়েছে সে। জলের মতো ইংরেজিটাও বলতে পারে। এর বেশি জরুরত নেই।'

মুকুটনাথের টান টান স্নায়ুগুলো আবার আলগা এবং স্বাভাবিক হয়ে আসে। অনেকটা আরাম বোধ করেন তিনি। ত্রিকূটনারায়ণ যা বলছেন সেটা তাঁরও কাম্য। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে এক কথায় রাজি হয়ে গেলে দুবেজি পেয়ে বসবেন। একটু খেলিয়ে মত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মুকুটনাথ বলেন, 'মুন্নুয়া বলছিল পরীক্ষার আর মোটে কয়েক মাস বাকি। ওটা হয়ে গেলে বরং—'

দুই হাত প্রবল বেগে নেড়ে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'পরীকৃষা দিয়ে ডিগ্রি-উগ্রি পেলে একস্ট্রা বাহার কী আর হবে ? ডিগ্রির জরুরত ত নৌকরির জন্যে। আপনার কি আমার এমন হাল হয়নি যাতে মেয়েদের নৌকরি করতে পাঠাব।'

ত্রিকূটনারায়ণের আগ্রহটা চাগিয়ে দেবার জন্য মুকুটনাথ বলেন, 'ঠিক বাত। লেকেন নামের শেষে একটা ডিগ্রি থাকলে ওজন বাড়ে।'

ত্রিকূটনারায়ণ হাসেন, 'আপনার কথা মানছি শর্মাজি। লেকেন মুশকিলটা হয়েছে দু' দিক থেকে—'

'কীরকম ?'

এতক্ষণ রোহিণী চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার ত্রিকূটনারায়ণ মুখ খোলার আগেই বলে ওঠেন, 'হরীশ মুখে কিছু বলছে না, লেকেন বুঝিয়ে দিচ্ছে শাদিটা এবার না দিলেই নয়। হরীশের এক দোস্ত বলছিল, কিরণ এসেছে শুনে স্রিফ এক নজর দেখার জন্যে দো রোজ ও আপনাদের কোঠির চারপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। বেচারার হাল বুঝে দু'জনের 'জোড়ি' মিলিয়ে দিন।'

মুকুটনাথ এবং রেবতী একসঙ্গে হকচকিয়ে যান। রেবতী মৃদু গলায় বলেন, 'কী আশ্চর্য, ও বাড়ির ভেতর এল না কেন ?'

'ভাবী দামাদকে ইনভাইট না করলে কি আসতে পারে ? শরমকি বাত।' বলে হাসতে লাগলেন রোহিণী।

ত্রিকূটনারায়ণ বললেন, 'ছেলে সাদির জন্যে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

ক্ষেপবার কথাই। উমর তো কম হ'ল না। চব্বিশ পঁচিশ সাল কমসে কম। এই বয়েসে আমার ত দো বাচ্চে হয়ে গেছে।'

ত্রিকূটনারায়ণ ঝানু পোলিটিসিয়ান হ'লেও কোথায় যেন তাঁর মধ্যে এক ধরনের সারল্য রয়েছে। নইলে ছেলে সম্বন্ধে এ জাতীয় মন্তব্য আদৌ করতেন না।

মুকুটনাথ এবং রেবতীও প্রচুর হাসছিলেন। মুকুটনাথ হাসতে হাসতেই বলেন, 'এ ত একটা কারণ। দুসরা কারণটা কী?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনি ত চিরকাল ল্যাণ্ড নিয়েই পড়ে রইলেন। পোলিটিকসের ধারও ধারেন না, তার খবরও রাখেন না। এদিকে ইলেকসান এসে যাচ্ছে।'

'কবে ইলেকসান?'

'চার পাঁচ মাস পর।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মুকুটনাথ। তারপর বলেন, 'ইলেকসানের সঙ্গে শাদির কী সম্পর্ক?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আমার চুনাও কেন্দ্রের ফিফটি পারসেণ্ট ভোটার আপনার গোলগোলি বইহারি ভূমনগঞ্জ ঝাঝরিয়া মৌজার লোক। তাদের ভোটগুলো তো চাই। চুনাও-এর ক্যামপেনের সময় আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।'

'তা ত থাকবই। আগের বারও থেকেছি। শাদির জন্যে এটা আটকে থাকবে নাকি?'

'শাদিটা হলে বেশি জোর খাটানো যায়। তখন লীগালি আপনি আমার আপনা আদমী। এখন আপনি আমার জন্যে যা করবেন বা করেছেন, একবার লীগাল সমধী হয়ে গেলে তার দশ বিশ গুণ করবেন।' বলে হাসতে থাকেন ত্রিকূটনারায়ণ।

ছেলের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ত্রিকূটনারায়ণের যে অকপট সারল্য দেখা গিয়েছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এই মুহূর্তে তাঁর মধ্য থেকে একজন তুখোড় পোলিটিসিয়ান বেরিয়ে এসেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দুটো ব্যাপার ত্রিকূটনারায়ণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমন প্রয়োজন হ'লে চুনাওতে তিনি মুকুটনাথের ওপর জবরদস্তিই করবেন। বিয়েটা হ'য়ে গেলে কিরণকে নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন ত্রিকূটনারায়ণ। তখন সে তাঁদেরই সম্পত্তি। আর কন্যাদান করার পর সব বাপই কমজোর হয়ে যায়। মেয়ের ভালমন্দর এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার শ্বশুরবাড়ির অনেক অন্যায় আবদার তাকে মেনে নিতে হয়। বিশেষ ক'রে এই

অঞ্চলে যেখানে সামান্য কারণে পুত্রবধূ পোড়ানো একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া বউ পোড়াবার একটা ব্যাকগ্রাউণ্ডও রয়েছে দুবেদের।

মুকুটনাথ বলেন, 'কারেক্ট বাতায়া আপনে। কবে শাদির ব্যবস্থা করতে চাইছেন?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ঠিক হ্যায়। গুরুদেও-এর সঙ্গে কথা ব'লে তারিখ ঠিক ক'রে আপনাকে জানাব।'

'আচ্ছা—'

একটু ভেবে মুকুটনাথ বলেন, এবার তা হ'লে আরেকটা দরকারী বাত সেরে নেওয়া যাক।'

ত্রিকূটনারায়ণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলেন, 'দরকারী বাত ত হ'য়েই গেল।'

'নেহী' দুবেজি। দহেজের কথাটা পাক্কা করে নেওয়া যাক।' শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলেন মুকুটনাথ।

দহেজ অর্থাৎ যৌতুকের কথায় রীতিমত ক্ষুব্ধই হ'ন ত্রিকূটনারায়ণ। বলেন, 'দহেজের জন্যে আমি ছেলের শাদি দিচ্ছি না শর্মাজি। ভগোয়ান শিউশঙ্করজির কৃপায় আমার সম্‌সারে অভাব নেই। শর্মা বংশ আর দ্বিবেদী বংশ দো-চারশ বরষ পাশাপাশি বাস ক'রে আসছে, লেকেন তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক হয় নি। আমার মনোকামনা দুই বংশের ভেতর একটা পাকাপাকি মধুর রিস্তেদারি হোক। আপনার মেয়েটি ছাড়া আমার কোনো দাবি নেই। দহেজ বহুত গন্ধা চীজ শর্মাজি।'

পোলিটিক্যাল লীডারদের মতো বক্তৃতার ঢং-এ কণ্ঠস্বরে প্রচুর আবেগ ঢেলে কথাগুলো বললেন ত্রিকূটনারায়ণ। কিন্তু মুকুটনাথ বহুদর্শী পোড় খাওয়া মানুষ। বক্তৃতাবাজি ক'রে তাঁকে টলানো এত সহজ নয়। তা ছাড়া দুবে বা দ্বিবেদী বংশ যে বধূহত্যার কারণে এ তল্লাটে যথেষ্টই বিখ্যাত সেটা তিনি এক পলকের জন্যও ভুলে যাননি। হেসে হেসে বলেন, 'আপনারা কি আর দহেজ চাইছেন দুবেজি? ভগোয়ান শিউশঙ্কর আর রামচন্দ্রজির কৃপায় আমারও কোনো অভাব নেই। মেয়েকে খালি হাতে সসুরালে পাঠালে লোকে আমার গায়ে থুক দেবে। বলবে বেটা মক্ষিচুষ, বিলকুল মাইজার। তা ছাড়া লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ারসের মধ্যে আমাদের কোঠিতে কোনো শাদি উদির মতো শুভকাজ হয়নি। আমাদের পরের জেনারেসনে এটাই হবে পয়লা ম্যারেজ। ধুমধাম না ক'রে মেয়েকে কি সসুরালে পাঠাতে পারি?'

যৌতুক নিয়ে আগেও দু'চারবার ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে কথা হয়েছে মুকুটনাথের কিন্তু সে সব ভাসা ভাসা। বিয়ে যখন এবার দিতে হবে, আনুষ্ঠানিকভাবে যৌতুকের ব্যাপারটা পাকা ক'রে নেওয়া দরকার।

দহেজ নেবেন না, মনে মনে এমন ধনুর্ভাঙা পণ আদৌ ক'রে বসেনি ত্রিকূট-নারায়ণ। তবে যৌতুকের ব্যাপারে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে একটু আগে পরম উদারতায় যে লম্বা-চওড়া বক্তৃতাটি তিনি করেছেন, সেটা শুধু কথার কথা। ঝানু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁকে লোক চরিয়ে খেতে হয়। মনুষ্যচরিত্র তাঁর নখের ডগায়। মেয়ের বাপেদের মনস্তত্ত্ব তাঁর একেবারেই অজানা নয়। তিনি যদি মুখ ফুটে বলেন, এটা চাই, সেটা চাই, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। কেননা যা চাইবেন তার বেশি কিছুই মিলবে না। বরং কিছু না চাইলে প্রত্যাশার বেশিই পাওয়া যাবে। উলটে কিঞ্চিৎ মহত্ত্বও দেখানো হবে। লোকে বলবে, আহা, কী গ্রেট ম্যান! যাই হোক, মুকুটনাথের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হ'ন ত্রিকূটনারায়ণ, তবে মুখে কিছু বলেন না।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'আমি কী ঠিক ক'রে রেখেছি জানেন?'

উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করেন ত্রিকূটনারায়ণ, 'কী?'

'সোনাচাঁদি হীরামোতি ফার্নিচার—এসব ত মামুলি চীজ। সব বাপই তার মেয়েকে দিয়ে থাকে। আমিও দেবো। সেই সঙ্গে এমন কিছু দেবো যা দুবেরা জেনারেসনের পর জেনারেসন মনে রাখবে।'

এবার রীতিমত হকচকিয়ে যান ত্রিকূটনারায়ণ। কোণাকুণি সোফাটায় বসে আছেন রোহিণী, তিনিও মুখ তুলে অবাক চোখে মুকুটনাথের দিকে তাকান।

ত্রিকূটনারায়ণ অপার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী দিতে চান শর্মাজি?'

'আন্দাজ করুন।' বলে অল্প অল্প হাসেন মুকুটনাথ। যাঁর মুখোমুখি তিনি বসে আছেন সেই তুখোড় রাজনৈতিক নেতাটিকে নিয়ে কিঞ্চিৎ মজা করতে তাঁর ভালই লাগছে।

কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন ত্রিকূটনারায়ণ। তারপর ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, 'না, বুঝতে পারছি না শর্মাজি।'

অনেকটা ঝুঁকে মুকুটনাথ বলেন, 'জমিন, জমিন। গোলগোলি মৌজার পাশে যে পাহাড় তার গায়ে আমার এক শ' বিঘা ভাল জমিন রয়েছে। পুরোটাই আমার মেয়ের নামে লেখাপড়া ক'রে দেবো।'

ত্রিকূটনারায়ণের চোখেমুখে বিজরি খেলে যায়। ভেতরকার প্রচণ্ড লোভ

এবং খুশি প্রাণপণে ভেতরেই আটকে রাখেন, বাইরে বেরিয়ে আসতে দেন না। অত্যন্ত সংযত ভঙ্গিতে বলেন, 'লেড়কীকে কী দেবেন সেটা পুরা আপনার ইচ্ছা। তার ওপর কারো কথা চলে না। তবে এসব না দিলেও কিছু যায় আসে না। আপনাদের সঙ্গে নাতেদারিটাই আসল, বহুৎ বড়ে প্রাইজ ব'লে মনে করি।'

যে চোখা বুদ্ধি এবং চাতুরালির খেলাটা চলছে তাতে রীতিমত আমোদই লাগে মুকুটনাথের। তিনি যে ত্রিকূটনারায়ণের সূক্ষ্ম চালটা ধরতে পেরেছেন তা একেবারেই বুঝতে দেন না। অত্যন্ত নিস্পৃহ মুখে এবং খুবই স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন দুবেজি, মেয়েদের সাইকোলজিটা তাজ্জবের জিনিস। শ্বশুরের যত প্রোপার্টি সোনাদানা থাক না, বাপের কাছ থেকে কিছু না পেলে সে মনে মনে কমজোরি হয়ে যায়, লোকের চোখে তার সম্মান থাকে না।'

ত্রিকূটনারায়ণ হাতজোড় ক'রে হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি পোলিটিকস করি, বক্তৃতার চক্করে লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিই। লেকিন আপনার কাছে বিলকুল হার মানলাম। জীওনে এত সুন্দর ক'রে কথা বলতে আমিও পারব না।'

মুকুটনাথ হাসতে থাকেন।

রেবতী এবং রোহিণীও হাসছিলেন। রোহিণী রেবতীকে বলেন, 'দুই সমধীর শতরঞ্জ খেলাটা দেখছেন বহীনজি।'

রেবতী নিচু গলায় জবাব দেন, 'যা বলেছেন।'

ওদিকে মুকুটনাথ ত্রিকূটনারায়ণের উদ্দেশে বলেন, 'জমিনটা কবে দেখতে যাবেন বলুন?'

জিভ কেটে, একসঙ্গে মাথা এবং দুই হাত জোরে জোরে নেড়ে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন ভাইয়া! নিজের লেড়কীকে কী দেবেন তা দেখতে যাব আমি!'

'তা কী কখনও হয় দুবেজি? আমি পাথুরে পড়তি জমিন গছিয়ে দিলাম কিনা সেটা নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভাল। পরে এই নিয়ে হয়ত মনে আপনার খিঁচ থেকে যাবে। চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারবেন না।'

হাল ছেড়ে দেবার মতো ভঙ্গিতে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এমন বিপদে কেউ কাউকে ফেলে?'

মুকুটনাথ বলেন, 'এটা আমার দোষও বলতে পারেন, গুণও বলতে পারেন। আগেই সব সাফ সাফ বলে নেওয়া ভাল। পরে এই নিয়ে ঝঞ্ঝাট আমার না-পসন্দ। তা হ'লে কবে জমিন দেখার দিন ঠিক করব?'

'তার আগে শাদির তারিখ ঠিক হোক।'

'সেটা দু-চার রোজের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'তারপর না হয় জমিন দেখতে যাওয়া যাবে। আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই যাব।'

'ঠিক হ্যায়।'

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে চা-মিঠাই খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'অনেকক্ষণ এসেছি, এবার তবে ওঠা যাক। যাবার আগে মাতাজি, গুরুদেও আর শিউশঙ্করজিকে দর্শন ক'রে যাব।'

মুকুটনাথ শশব্যস্তে বলেন, 'হাঁ হাঁ জরুর। মা আর গুরুদেও পাশের কামরাতেই আছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হবার পর শিউশঙ্করজির মন্দিরে নিয়ে যাব।'

সবাই সোফা থেকে উঠে পড়েছিলেন। ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'এতদূর যখন এসে পড়েছি কিরণকেও দেখে যাই।'

'মুন্নুয়াও পাশের ঘরেই আছে। আসুন, আসুন—'

চার জন মহেশ্বরীর ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

ছয়

মুকুটনাথ আর রেবতী ত্রিকূটনারায়ণ এবং রোহিণীকে মহেশ্বরীর ঘরে নিয়ে এলেন।

কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ মহেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর মাস দেড়েকের কাশীবাস সম্পর্কে কথা বলছিলেন। কিরণ অন্যমনস্কর মতো চুপচাপ ঠাকুমার খাটের এক কোণে বসে আছে। বশিষ্ঠনারায়ণদের একটি কথাও যেন সে শুনতে পাচ্ছে না। খুবই চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ঘরের মেঝেতে বসে মহেশ্বরীর খাস নৌকরানী কুঁদরী একটা পাথরের খলে মহেশ্বরীর জন্য মধু দিয়ে কবিরাজি বড়ি মাড়ছিল। এখন তাঁর ওযুধ খাওয়ার সময়।

ত্রিকূটনারায়ণরা এতক্ষণ পাশের ঘরে কী বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, কিরণ সবই আন্দাজ করতে পারে। তার দুশ্চিন্তার কারণ সেটাই। যাই হোক, ত্রিকূটনারায়ণদের এ ঘরে দেখে সে চমকে ওঠে। যদিও সে জানত মহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা করতে ওঁরা এ ঘরে আসবেন। নিজেকে শক্ত রাখবে এবং কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়বে না, এরকম একটা সংকল্প মাথায় রেখেও সে টের পায় অদ্ভুত এক ভীতি তার সাহস আর ব্যক্তিত্বকে যেন চুরমার ক'রে দিতে চাইছে।

বশিষ্ঠনারায়ণ স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'আও ত্রিকূট, আও বহুরানী—' বহুরানী অর্থাৎ রোহিণী।

অতিথিদের দেখে মহেশ্বরীর কঙ্কালসার শরীরে আনন্দ এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। হাতের ভর দিয়ে তিনি উঠে বসতে যাবেন, প্রায় ছুটেই তাঁর কাছে চলে আসেন ত্রিকূটনারায়ণ। ব্যস্তভাবে বলেন, 'উঠবেন না মাতাজি, উঠবেন না।'

মহেশ্বরী আর ওঠার চেষ্টা করেন না। যথেষ্ট সমাদর ক'রে বলেন, 'আও বেটা, বৈঠো—'

ত্রিকূটনারায়ণ সস্ত্রীক বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মহেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে দুটো চেয়ারে বসেন। তাঁরা বসার পর মুকুটনাথ আর রেবতীও বসে পড়েন।

মহেশ্বরী কিরণকে বলেন, 'কি রে মুন্নুয়া, ত্রিকূটদের প্রণাম করলি না!'

কিরণ এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল যে এ ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি। দিল্লিতে কয়েক বছর কাটিয়ে এলেও শিষ্টাচার ভুলে যায়নি সে। বয়োজেষ্ঠ্যদের সম্মান দিতে জানে কিরণ। দ্রুত উঠে গিয়ে রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণকে প্রণাম করে সে। শুধু তা-ই না, মা বাবা ঠাকমা এবং কুলগুরুকেও প্রণাম করতে হয়। উপস্থিত যে গুরুজনেরা থাকবেন তাঁদের সবাইকেই এভাবে সম্মান জানানো এ বাড়ির বহুকালের রেওয়াজ।

প্রণাম চুকলে রোহিণী কিরণকে নিজের কাছে বসান। বলেন, 'কেমন আছ বেটা?'

কিরণ সংক্ষেপে উত্তর দেয়, 'ভাল।'

ত্রিকূটনারায়ণ সস্নেহে কিরণের সঙ্গে কথা ব'লে মহেশ্বরীর দিকে তাকান। বলেন, 'মাতাজি, আজ আমরা আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।'

মহেশ্বরীর কোঁচকানো মুখে মধুর হাসি ছড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, 'কিসের অনুমতি—কিরণের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদির?'

'হাঁ মাতাজি। একটু আগে মুকুটনাথজির সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। তিনিও রাজী হয়েছেন। লেকেন ছোটা আদালতের রায় পেলেই ত হবে না, হাইকোর্টের হুকুম চাই।'

মহেশ্বরী হাসলেন।

ত্রিকূটনারায়ণ ফের বলেন, 'আমাদের ইচ্ছা, এই মাসেই শাদিটা হয়ে যাক।'

মহেশ্বরী অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন, 'বেশ ত। শুভ কাজ বেশিদিন ফেলে রাখতে নেই।'

ত্রিকূটনারায়ণ খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'ঠিক মাতাজি। এই কথাই তখন মুকুটনাথজিকে বলছিলাম।' বলতে বলতে বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে তাকান, 'গুরুদেও, কৃপা করে পঞ্জিকা দেখে শাদির তারিখ ঠিক ক'রে দিতে হবে।'

'হাঁ হাঁ জরুর।' বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'আজ রাত্তিরেই তারিখটা দেখে মুকুটনাথকে বলে দেব।'

শুনতে শুনতে হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন থমকে গিয়েছিল কিরণের। গল্ গল ক'রে ঘামতে শুরু করেছে সে। মাথার ভেতর ঝিঁঝি'র ডাকের মতো একনাগাড়ে দুর্বোধ্য কী সব শব্দ হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, সে একটা ফাঁদের মধ্যে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার শক্তি বোধহয় একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার ক'রে উঠতে চাইল কিরণ, 'এ শাদি হবে না, হবে না, হবে না। আমার পেটে অন্যের বাচ্চা রয়েছে।' কিন্তু স্বর ফুটল না। তবে এটুকু বুঝতে পারল, যা করার দু'এক দিনের মধ্যেই তাকে ক'রে ফেলতে হবে। নইলে সব কিছুই তার হাতের বাইরে চলে যাবে।

বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত কিরণ বিপর্যয়ের শেষ মাথায় পোঁছে স্থির ক'রে ফেলল, আজই প্রভাকরকে চিঠিটা লিখে সব জানিয়ে দেবে। এই ফাঁদে-পড়া বিপন্ন অবস্থায় তার পরামর্শ এবং সাহায্য একান্ত জরুরি।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার মুকুটনাথকে বলেন, 'শাদির তারিখটা নিয়ে কৃপা করে ভাবীজি আর আপনি যদি গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেন—'

মুকুটনাথ শশব্যস্তে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'পায়ের ধুলো কী বলছেন দুবেজি! আপনার কোঠিতে যাব, এ ত আমাদের বহুত বড়ে সৌভাগ।'

'কবে আসছেন? আপনার সঙ্গে শাদি ছাড়াও আরো অনেক পরামর্শ আছে।'

'গুরুদেওজি তারিখটা আজ জানিয়ে দিলে কাল পরশু চলে যেতে পারি।'

'পরশু আর করবেন না। কালই কষ্ট ক'রে চলে আসুন।'

একটু ভেবে মুকুটনাথ বলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু জরুরি কথা আছে।'

'নিশ্চয়ই শুনব।' ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'কাল কখন আসছেন?'

'বিকেলের দিকে যাব। ধরুন চারটে পাঁচটা নাগাদ।'

'আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। এবার তা হ'লে আপনারা সবাই হুকুম দিন, আমরা আজ যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান ত্রিকূটনারায়ণ।

আরেক প্রস্থ প্রণামের পর ত্রিকূটনারায়ণ জানান, 'যাবার আগে নতুন মন্দির দর্শন করাবেন।'

'অবশ্যই।' মুকুটনাথ রেবতী এবং বশিষ্ঠনারায়ণ ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে ক'রে নতুন শিবমন্দিরে নিয়ে আসেন। সস্ত্রীক ত্রিকূট ভক্তিভরে ও সাষ্টাঙ্গে শিবের 'মূরত'কে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, 'বহুত পুণে'র কাজ করেছেন মুকুটনাথজি। আপনার কোঠি পবিত্র বনারসধাম হয়ে গেল।'

মুকুটনাথের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। তিনি অবশ্য কোনো উত্তর দেন না।

ত্রিকূটনারায়ণেরাও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন না। মন্দিরের মুখোমুখি ফাঁকা জায়গায় তাঁদের যে পুরনো মডেলের ঢাউস মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল, সোজা সেখানে চলে যান। মুকুটনাথ এবং রেবতী তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আসেন।

মুকুটনাথ নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিতে দিতে সবিনয়ে বলেন, 'উঠুন ভাবীজি, উঠুন ত্রিকূটজি। কাল আবার দেখা হবে।'

ত্রিকূটনারায়ণদের মোটর গেটের বাইরে বেরিয়ে যাবার পর মুকুটনাথ একটা নৌকরকে ডেকে বলেন, 'তুরন্ত ভকিলজির কোঠিতে চলে যা। তাকে বলবি আজই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

ভকিলজি অর্থাৎ খুবলাল। নৌকর ঘাড় হেলিয়ে তৎক্ষণাৎ খুবলালের বাড়ির দিকে ছোটে।

এদিকে মুকুটনাথেরা বেরিয়ে যাবার পর মহেশ্বরীর কামরায় মহেশ্বরী, তাঁর নৌকরানী কুঁদরী এবং কিরণ ছাড়া আর কেউ ছিল না।

কিরণ বিভ্রান্তের মতো চুপচাপ বসে আছে। একটি চতুর চালে মুকুটনাথেরা তাকে যে ব্যূহের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার রণকৌশল তার জানা নেই।

কুঁদরীর ওষুধ মাড়া হয়ে গিয়েছিল। খলসুদ্ধু ওষুধটা এনে মহেশ্বরীর মুখের কাছে ধরে সে। চেটে চেটে খেয়ে নেন মহেশ্বরী। তারপর তাঁকে জল খাইয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় কুঁদরী।

বলবর্ধক কবিরাজি বড়ি মহেশ্বরীর স্নায়ুগুলোকে মুহূর্তে চাঙ্গা ক'রে তোলে। হাসিমুখে তিনি বিয়ের ব্যাপারে কিরণকে ঠাট্টা-টাট্টা করেন, চোখেমুখে মজাদার ভঙ্গি ফুটিয়ে রঙ্গ রসিকতা জুড়ে দেন।

একটা ছড়াও কাটেন মহেশ্বরী।

'সুহাগিন লাড়ো (আদরের মেয়ে) খোজাইছে হে যোগ জাড়িয়া—'

কিরণের এসব একেবারেই ভাল লাগছিল না। সে অন্যমনস্কর মতো হুঁ হাঁ ক'রে যায়। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি এখন যাই—'

মহেশ্বরী অবাক হ'য়ে বলেন, 'যাবি কী রে, ব'স ব'স। দু'দিন পর সসুরাল যাবি। মরদ বশ করার কিছু কায়দা তোকে শিখিয়ে দিই। নইলে পরে মুশকিলে পড়তে হবে।'

'আমার শরীরটা ভাল না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কিরণ। একটু পর দোতলায় এসে নিজের ঘরে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে।

জানালার চৌকো ফ্রেমে আকাশের যে টুকরোটা ধরা পড়েছে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। দূরে ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে দু'একটা ঝাঁকড়া-মাথা পীপর কি অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা চেহারার তাল গাছ। তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে হাইওয়ে। সেখানে লাইন দিয়ে চলেছে ট্রাক, দূর পাল্লার বাস, ভ্যান। এছাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে বয়েল গাড়ি, ভৈসা গাড়ি আর সাইকেল রিকশা তো আছেই।

কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না কিরণ। তার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যাবলী, শব্দ এবং গন্ধ—সমস্তই বুঝিবা লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে প্রায় টেনেই তুলল কিরণ। বিছানার এক ধারে প্যাড, কলম পড়ে আছে। প্যাডের প্রথম পাতায় কয়েকটা লাইন লেখা। ঘণ্টা তিনেক আগে প্রভাকরকে যখন সে চিঠি লিখছিল সেই সময় সুষ্‌মা এসে তাকে মহেশ্বরীর ঘরে ডেকে নিয়ে যায়।

কিরণ কয়েক পলক লাইন ক'টার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর মনস্থির করে ফেলে। চিঠিটা শেষ ক'রে আজই পোস্ট করতে হবে।

কলম আর প্যাড তুলে নিয়ে দ্রুত লিখতে শুরু করে কিরণ। চিঠির বিষয়বস্তু এইরকম। বাবা মা ঠাকুমা কুলগুরু, সবাই মিলে একরকম জোর ক'রেই তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা ক'রে ফেলেছেন। এখান থেকে পালিয়ে যে সে দিল্লিতে প্রভাকরের কাছে চলে যাবে তারও উপায় নেই। মনে হয় সবাই তার ওপর কড়া নজর রাখছে। চিঠি পাওয়া মাত্র প্রভাকর যেন বন্দিদশা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়, ইত্যাদি।

চিঠিটা শেষ ক'রে একটা খামের ভেতর পুরে যখন সে ঠিকানা লিখছে সেই

সময় সাগিয়া কফির কাপ নিয়ে ঘরে ঢোকে। কিরণের কখন কী দরকার, মেয়েটা যেন আগে থেকেই টের পায়। তাড়াতাড়ি ঠিকানা লেখা শেষ ক'রে হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা নেয় কিরণ। চিঠিটা লিখতে পেরে খানিক আরাম বোধ করে সে। তার বিশ্বাস, প্রভাকর নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে।

পরক্ষণেই কিরণের মনে হয়, চিঠি তো লেখা হ'ল কিন্তু সেটা ডাকে দেবে কে? ডাক বাক্স এ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। সে বেরুতে গেলেই হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অন্য কাউকে দিয়ে যে চিঠিটা পোস্ট করাবে, তাতেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। মুকুটনাথের হাতে যদি কোনোভাবে চিঠিটা পড়ে যায় প্রভাকরের নাম দেখেই ক্ষেপে যাবেন। এর ফলাফল হবে মারাত্মক। তা ছাড়া মুকুটনাথ নৌকরদের তার সম্বন্ধে কী ব'লে রেখেছেন কিরণের জানা নেই। কারো হাতে চিঠিটা দেওয়া মাত্র সে হয়ত মুকুটনাথের কাছে পৌঁছে দেবে।

অন্য কাউকে দিয়ে চিঠিটা পোস্ট করার ঝুঁকি নিতে পারবে না কিরণ। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, একমাত্র সাগিয়াকেই এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। মেয়েটা চালাক চতুর এবং যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যও। খুব ছোটবেলা থেকে সে তার কাছেই আছে। কিরণ যা বলবে, মুখ বুজে তা-ই করবে সে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, 'মিশ্র নিকেত'-এর মেয়েদের হুটহাট বাড়ির বাইরে বেরুবার নিয়ম নেই। নৌকরানী হ'লেও না।

কিন্তু সাগিয়ার সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও তো নেই। একটা ঝুঁকি নিতেই হবে কিরণকে। দ্বিধাগ্রস্তের মতো সে বলে, 'আমার একটা কাজ ক'রে দিবি?'

তক্ষুণি মাথা হেলিয়ে দেয় সাগিয়া, 'হাঁ, জরুর।'

'না শুনেই জরুর বলছিস যে?'

'তুমি এমন কাজ দেবে না যেটা করা যায় না। এখন ব'লে ফেল দিদিজি—'

চিঠিটা দেখিয়ে কিরণ বলে, 'এটা ডাক বাক্সে ফেলে আসতে হবে। তবে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই সাগিয়া চাপা গলায় বলে, 'কেউ যেন জানতে না পারে, তাই তো?'

সাগিয়ার গালে আলতো টোকা মেরে কিরণ হাসে। বলে, 'তুই একটা সাঁখরেল।' তারপরেই কিছু একটা মনে পড়তেই চিন্তাগ্রস্তের মতো বলে, 'কিন্তু—'

'কা?'

'তুই চিঠি ফেলতে যাবি কী ক'রে? কোঠির বাইরে তোকে যেতে দিলে তো।'

'একটা বাহানা (ছল) ক'রে ঠিক বেরিয়ে যাব। চিন্তা নায় করনা দিদিজি।'

সাগিয়ার সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং ফন্দিবাজির ওপর কিরণের অগাধ আস্থা। তবু পুরোপুরি নিঃসংশয় হ'তে পারে না। জিজ্ঞেস করে, 'কী বাহানা ?'

সেটা তখনও ভেবে দেখেনি সাগিয়া। সে বলে, 'ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও দিদিজি। একটা ফিকির ঠিক মাথায় এসে যাবে।'

'দেখিস, কেউ যেন এই চিঠির ব্যাপারে জানতে না পারে।'

'আমার মৌত না হওয়া পর্যন্ত কেউ জানতে পারবে না।'

মনের ভেতর খুঁতখুঁতুনি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কিরণকে বলতেই হয়, 'ঠিক আছে।' সাগিয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর উপায় নেই। সে ফের বলে, 'চিঠিটা কিন্তু আজই ডাকে দিতে হবে।'

'জরুর।' বলে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সাগিয়া। ধীরে ধীরে তার টেপা ঠোঁটে অদ্ভুত নিঃশব্দ একটি হাসি ফুটে ওঠে। খুব নিচু গলায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো এবার সে বলে, 'কাকে চিঠি লিখেছ দিদিজি ? কিছু গড়বড় আছে ?'

চমকে ওঠে কিরণ। সে সাগিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে বলে, 'পরে শুনিস।'

সাত

মিশ্রদের গোলগোলি তালুকের বর্ডারে যে বেঁটে পাহাড়ের রেঞ্জটা রয়েছে তার ওধারে দু' কিলোমিটার জুড়ে চাষের জমি। তারপর ছোট মাপের শহর কামতিগঞ্জ। চেহারায় বা চরিত্রে মিশ্রদের ধরমপুরা টাউনের সঙ্গে কামতিগঞ্জের তফাত প্রায় নেই বললেই চলে। খোয়ার রাস্তার ওপর ছ'ইঞ্চি পুরু ধুলোর স্তর। কাঁচা নর্দমা দিয়ে কালো থকথকে স্রোত বয়ে চলেছে। তার ওপর দিনরাত উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। এই খোলা নোংরা ড্রেনগুলো মশাদের পার্মানেন্ট মেটার্নিটি হোম।

এখানে বেশির ভাগই টিনের বা টালির চালের ঘর। ফাঁকে ফাঁকে বেঢপ চেহারার দু-চারটে একতলা দোতলা কি তিনতলা পাকা দালান।

সারাদিন ধুলো উড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল রিকশা, বয়েল আর ভৈসা গাড়ি কামতিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় চক্কর দেয়। সন্ধের পর মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে বাতিগুলো থেকে যে আলোটুকু পাওয়া যায় তাতে দশ ফুট দূরের মানুষও চোখে পড়ে না।

কামতিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় আকছার যা চোখে পড়ে তা হ'ল নতুন আর পুরনো মন্দির। বজরঙ্গবলী থেকে শিব দুর্গা লছমী, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর এমন কেউ নেই যার মন্দির এ শহরে দেখা যাবে না। প্রতিটি রাস্তায় কম ক'রে দশ বারোটা করে দেব-দেবীর মূরত বা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মন্দির ছাড়া এখানে আর যা চোখে পড়বে তা হ'ল পাল পাল ধর্মের ষাঁড় এবং বেওয়ারিশ কুকুর।

এ শহরের এক ধারে প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে দ্বিবেদী বা দুবেদের বাড়ি 'ইন্দ্রধনুস'। বিহারের এই সব অঞ্চলের বড়ো জমিমালিকদের হাভেলি যেরকম হয়, এ বাড়িটা হুবহু তাই। উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল দিয়ে সীমানা ঘিরে রাখা হয়েছে। মাঝখানে দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা। সেটার মাথায় মহালছমীর মন্দির। মন্দিরটা এক মাইল দূর থেকে দেখা যায়।

বাড়িটার সামনের দিকে ফুলের বাগান। ত্রিকূটনারায়ণের ফুলের খুব শখ। রাজনীতির কারণে বছরের বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে দিল্লি আর পাটনা ক'রে বেড়াতে হয়। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকেন, তার অনেকটাই ফুলের পেছনে কেটে যায়।

বাগানের একধারে টিনের শেডের তলায় তিন চারটে নতুন এবং পুরনো মডেলের মোটর। চারপাশের অন্য জমিমালিকদের মতো ঘোড়ায়-টানা ফীটন পছন্দ করেন না ত্রিকূটনারায়ণ। ঢিমে তালের জীবনে তাঁর একেবারেই রুচি নেই। তিনি চান স্পীড। বিহারের এই সব অঞ্চলের জীবনযাত্রা যেখানে গৈয়া ভৈসা আর ঘোড়ায় টানা টাঙ্গার যুগে পড়ে আছে, সেখানে তিনি দুরন্ত গতি আনতে চান।

বাড়িটার সামনের দিকে যেমন অজস্র দেশী বিদেশী ফুল, পেছন দিকে তেমনি নানা ধরনের ফলের বাগান। সবেদা লিচু আম জাম জামরুল বাতাবী লেবু ইত্যাদি। সেখানে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি বানিয়ে নৌকর নৌকরানীদের থাকার ব্যবস্থা।

এখন সকাল। একতলার বিশাল বারান্দার এক ধারে যে সাবেক কালের বিশাল গ্রাণ্ড ফাদার ক্লকটা দাঁড়িয়ে আছে সেটার কাঁটায় সাড়ে আটটা।

এর মধ্যেই রোদ বেশ চড়ে গেছে। গরম কাল যে আসছে বাতাসের উত্তাপে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে পরদেশী শুগা এবং বকের ঝাঁক চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ওদিকে ফাঁকা শস্যক্ষেত্রগুলি অসীম নিঃস্বতা নিয়ে গা এলিয়ে পড়ে আছে একটানা দিগন্ত পর্যন্ত।

শীত গ্রীষ্ম বারো মাস ভোরে সূর্যোদয়ের আগে উঠে পড়া ত্রিকূটনারায়ণের দীর্ঘকালের অভ্যাস। কামতিগঞ্জে থাকলে উঠেই তিনি ছাদে চলে যান। মহালছমীর মূরতের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রথমে প্রণামটি সেরে নেন। তারপর ছাদেই একদমে আড়াই শ' বুক ডন এবং বৈঠক দেবার পর কিছুক্ষণ মুগুর ভাঁজেন। শারীরিক এই কসরতের পর ঠাণ্ডা জলে স্নানটি সেরে পোশাক পালটে নিচের বারান্দায় এসে বসেন।

শ্বেত পাথরের ঢালা বারান্দাটার আধাআধি জায়গা কার্পেটে মোড়া। তার ওপর পুরু গদিওলা পনেরো কুড়িটা সোফা আর সেণ্টার টেবল চমৎকার ক'রে সাজানো। কামতিগঞ্জে থাকলে বেশির ভাগ দিনই দুপুর পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে দেন ত্রিকূটনারায়ণ। বেলা আটটার পর থেকে দর্শন মাঙনেওয়ালারা ভিড় জমাতে থাকে। তা ছাড়া কামতিগঞ্জের বিশিষ্ট কিছু মানুষও আসেন। এঁরা তাঁর ইনার সার্কেলের লোক—বন্ধু পরামর্শদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী।

এই মুহূর্তে ত্রিকূটনারায়ণ বারান্দায় তাঁর আম দরবারে একটি সোফায় বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছেন কামতিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রাজভূষণ তেওয়ারি, ডাক্তার যুগলপ্রসাদ, স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রতাপরাম লাল এবং এখানকার বড়ো বিজনেসম্যান লালতাপ্রসাদ চৌবে।

বারান্দার তলায় নুড়ির রাস্তা। তারপর থেকে ফুলের বাগান। বাগানের পর প্রকাণ্ড লোহার গেট। সেখানে দুটো ভোজপুরী দারোয়ান গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে এবং কাঁধে দোনলা বন্দুক ফেলে টহল দিচ্ছে। ত্রিকূটনারায়ণ সকালে বারান্দায় নেমেই তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আজ অন্য কোনো দর্শনমাঙোয়াকে যেন ভেতরে আসতে না দেওয়া হয়।

ত্রিকূটনারায়ণের পরনে এই মুহূর্তে ধবধবে চুস্ত আর ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের সামনে পেস্তা-বাদাম দেওয়া উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই-এর গেলাস সাজানো রয়েছে। আর রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লাড্ডু, গুলাবজামুন, কাজু বাদামের বরফি এবং কলাকন্দ। তা ছাড়া প্লেটে প্লেটে নানা ধরনের ফল।

ধরমপুরা টাউনের মুকুটনাথ মিশ্রের মেয়ে কিরণের সঙ্গে ত্রিকূটনারায়ণের ছেলে হরীশের শাদির বিষয়েই তাঁদের মধ্যে গভীর এবং গূঢ় আলোচনা চলছে। এই কারণেই ত্রিকূটনারায়ণ আজ তাঁর বন্ধু ও পরামর্শদাতাদের বিশেষ ক'রে ডাকিয়ে আনিয়েছেন।

ঠাণ্ডাই-এর গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পবিত্র চেহারার

প্রতাপরাম বলেন, 'এটা একটা পোলিটিক্যাল ম্যারেজ। ডিপ্লোম্যাটিকও। এতে সব দিক থেকেই আপনার লাভ ত্রিকূটজি।'

ত্রিকূটনারায়ণ ভারিক্কি চালে হাসেন, তবে কোনো উত্তর দেন না।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বিপুল আকারের রাজভূষণ তেওয়ারি বলেন, 'পনদ্র (পনেরো) সাল আগে ধরমপুরার শর্মাদের সঙ্গে রিস্তেদারি করার জন্যে যে প্ল্যানিংটা করেছিলেন এবার তার রেজাল্ট পাওয়া যাবে। ত্রিকূটজির জবাব নেই।'

বড়ো সাইজের একটা গুলাবজামুন মুখে পুরে বিজনেসম্যান লালতাপ্রসাদ বলেন, 'এই না হ'লে পোলিটিসিয়ান! পনদ্র সাল পরের ঘটনা তিনি সিনেমার মতো দেখতে পেয়েছিলেন।'

দুই ঠোঁটে আধফোটা হাসি নিয়ে এই সব চাটুকারিতা উপভোগ করতে থাকেন ত্রিকূটনারারণ। বোঝা যায়, এ জাতীয় তোষামোদে তিনি চিরদিন অভ্যস্ত।

ডাক্তার যুগলপ্রসাদ কামতিগঞ্জের একমাত্র এম. বি. বি. এস। তিনি বলেন, 'গোলগোলি তালুকটা ছিল আমাদের সব চেয়ে উইক পয়েণ্ট। আগেকার দুটো চুনাও ত্রিকূটজি ওখান থেকে টেন পারসেণ্টের বেশি ভোট পাননি। শাদির কথা ঠিক হবার পর জিততে শুরু করেছেন। তবে গোলগোলি তালুকের পুরা ভোট এখনও পান না। মনে হয় মুকুটজি কিছু হাতে রাখছেন। এ ব্যাপার পুরা 'ধ্যান' দিচ্ছেন না। শাদিটা একবার হয়ে গেলে আশা করি হানড্রেড পারসেণ্ট ভোট পাবেন।'

রাজভূষণ সামনের সেণ্টার টেবলে প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলেন, 'জরুর, জরুর—'

বিজনেসম্যান লালতাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, 'এবার চুনাওটা হচ্ছে কবে?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'জুন মাসে, বারীষ নামবার আগে।'

'তা হ'লে তো আর বেশি দেরি নেই। এখন থেকেই ক্যামপেনের কাজ চালু করে দেওয়া দরকার।'

'তার আগে যেটা বেশি দরকার তা হ'ল হরীশের সঙ্গে মুকুটনাথজির বেটির শাদিটা চুকিয়ে ফেলা।'

প্রথমে বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন লালতাপ্রসাদ। যে নির্বাচন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তার আগে কেন ছেলের বিয়েটা সেরে ফেলা জরুরি, সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। পরক্ষণেই অবশ্য বিজলি চমকের মতো লালতাপ্রসাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি প্রবল উৎসাহে

মাথা এবং দুই হাত নেড়ে বলেন, 'সমঝ গিয়া, সমঝ গিয়া। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, এ শাদি পোলিটিক্যাল শাদি। যত জলদি এ শাদি হয় আমাদের ততই ফায়দা। শাদির তারিখ কি ঠিক করে ফেলেছেন ত্রিকূটজি?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'মুকুটনাথজি তারিখটা জলদি জলদি জানিয়ে দেবেন বলেছেন। আমিও ভাবছি ফাগোয়ার মাসে না হ'লে বৈশাখের পয়লা উইকেই শাদিটা চুকিয়ে ফেলতে চাই।'

যুগলপ্রসাদ জানতে চান, 'ঐ সময় শাদির ডেট আছে?'

ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর দিকে ফিরে বলেন, 'পঞ্জিকা দেখেছি, পয়লা থেকে সাত তারিখের মধ্যে তিন তিনটে ডেট রয়েছে।'

'ভেরি গুড।'

একটু চুপচাপ।

তারপর এক চুমুকে বাকি ঠাণ্ডাইটুকু শেষ ক'রে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনারা আমার দোস্ত, রিয়েল ওয়েলউইশার। আপনাদের এবার একটা খুশ খবর দিই। শুনলে ভাল লাগবে।'

সবাই বিপুল আগ্রহে ত্রিকূটনারায়ণের দিকে তাকান। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'সুখবরটা কী?'

ত্রিকূটনারায়ণ রহস্যময় হেসে পালটা প্রশ্ন করেন, 'আন্দাজ করুন।'

সবাইকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখায়। এবারও তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, 'বুঝতে পারছি না।'

ত্রিকূটনারায়ণের হাসিটা এবার সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, 'ছেলের শাদি দিতে যাচ্ছি। শাদিতে দহেজ পাব কি না?'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'কী দহেজ পেতে পারি বলুন ত।'

লালতাপ্রসাদ বলেন, 'হীরামোতি সোনাচাঁদি ফার্নিচার আর নগদ টাকা-যা সবাই দিয়ে থাকে।'

'নেহী' লালতাপ্রসাদজি—' মৃদু হেসে ত্রিকূটনারায়ণ বলতে থাকেন, 'হরীশের শাদিতে যা পেতে যাচ্ছি আমাদের দুবে বংশ কোনোদিন তা পায়নি। আমি অবশ্য নিতে চাইনি। লেকেন মুকুটনাথজি জোর করেই আমাকে রাজী করিয়েছেন। সমৃধীর সঙ্গে এ নিয়ে ঝামেলা করা যায় না।'

'কী দহেজ দিতে চেয়েছেন মুকুটনাথজি?'

'ল্যাণ্ড—ল্যাণ্ড প্রোপার্টি।'

সবার চোখ চকচক করতে থাকে। রাজভূষণ অনেকখানি ঝুঁকে বলেন, 'কতটা ল্যাণ্ড?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'এক শ' বিঘা। গোলগোলি তালুকের লগভগ আধা-আধি দিতে চেয়েছেন।'

কিছুক্ষণের জন্য দুবেদের এই বিশাল বাড়ি 'ইন্দ্রধনুস'-এ স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপর রাজভূষণই ফের শুরু করেন, 'শর্মারা ত চিরকালই ছেলেদের শাদি দিয়ে ল্যাণ্ড নিয়েছে। এইভাবেই ওদের যত প্রোপার্টি। এক ধুর জমি ছাড়তে ওদের জান চলে যায়। মুকুটনাথজি এত ল্যাণ্ড দিতে রাজী হলেন যে?'

'তা আমি বলতে পারব না।' বলতে বলতে একটু কী ভাবেন ত্রিকূটনারায়ণ। তারপর যা বলেন তা এইরকম, 'মুকুটনাথজির ছেলে নেই যে তার শাদি দিয়ে নতুন করে জমিন দহেজ পাবেন। অবশ্য জমিনের বদলে অন্য কিছুও তিনি দিতে পারতেন। আমার কোনো ডিমাণ্ড ছিল না।'

চাটুকারদের একজন হলেন লালতাপ্রসাদ। তিনি বলে ওঠেন, 'তা ত আমরা জানিই। আপনার মত মহান আদমী পরায়া প্রোপার্টি ডিমাণ্ড করবেন, এ আমরা ভাবতেই পারি না।'

প্রিন্সিপ্যাল প্রতাপরাম বলেন, 'দুবেদের মতো কালচার্ড, নির্লোভ ফ্যামিলি বিহারে আর আছে কিনা সন্দেহ। ছেলের শাদি দিয়ে অন্যের কাছে তাঁরা হাত পাতবেন এ আমাদের কল্পনার বাইরে।'

তোষামোদের কমপিটিসন শুরু হ'য়ে যায় যেন। ডাক্তার যুগলপ্রসাদ বলেন, 'দেবী মহালছমীর কৃপায় দুবেদের ল্যাণ্ড প্রোপার্টি, সোনাচাঁদি, হীরামোতি কি কিছু কম আছে যে অন্যের কাছে হাত পাতবেন! এর কোনো জরুরতই নেই।

রাজভূষণ চাটুকারিতার মাত্রাটা সূক্ষ্ম চারুকলার স্তরে তুলে নিয়ে যান। বলেন, 'সব চেয়ে বড় ব্যাপার হ'ল, কারো কাছ থেকে কিছু নেবার মতো হীন মনোবৃত্তিই দুবে বংশের মানুষদের নেই। তাঁরা হলেন মহান দাতা, বংশ পরম্পরায় অন্যদের দিয়েই এসেছেন।'

যুগলপ্রসাদ বলেন, 'তবে হাঁ, কেউ যদি কিছু নিজের থেকে দিতে চান সেখানে ত আর 'না' বলা যায় না। সেটা হবে অভদ্রতা।'

রাজভূষণ বলেন, 'আমারও তাই মত। ত্রিকূটজি জোর ক'রে আদায় করছেন না, মুকুটনাথজিরা খুশি মনেই তাঁর মেয়ের শাদিতে প্রোপার্টি দিচ্ছেন।'

এই সব ইনার সার্কেলের পরামর্শদাতা এবং বন্ধুরা যখনই ত্রিকূটনারায়ণকে ঘিরে বসেন তখনই বেশ খানিকটা সময় এ জাতীয় মধুর চাটুবাক্য তাঁকে শুনতে হয়। বলা যায়, এটা একটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই এত ভাল ভাল কথা বলছেন কিন্তু কারো মুখ দিয়েই আসল কথাটি বেরুচ্ছে না। শুধু দহেজের কারণে এই দুবে বংশের তিন তিনটি বউ পোড়ানোর রেকর্ডও রয়েছে।

যাই হোক, ত্রিকূটনারায়ণের মুখে হাসিটি লেগেই ছিল। পরিতৃপ্তিতে সেটা চকচক করতে থাকে। ধীরে ধীরে অত্যন্ত নরম গলায় তিনি এবার বলেন, 'আপনারা ঠিকই বলেছেন, পরায়া ধন নেবার মনোবৃত্তি আমার নেই। তবু গোলগোলি তালুকের জমিনটা নিতে যে রাজী হয়েছি তার কারণ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।'

রাজভূষণদের বুঝতে ভুল হয় না। তাঁরা প্রায় কোরাসেই বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ, কারণটা সেণ্ট পারসেণ্ট পোলিটিক্যাল।'

'গোলগোলি তালুকটা আমাদের হাতে এসে গেলে শুধু আমিই না, আমার পর হরীশ যদি পোলিটিকসে নামে, ওখানকার ভোটগুলো সে-ও পেয়ে যাবে।'

প্রিন্সিপ্যাল প্রতাপরাম কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেন, 'মোস্ট সার্টেনলি। গোলগোলির ভোটগুলো পেয়ে গেলে জেনারেসনের পর জেনারেসন আপনারা এম. এল. এ কি এম. পি হ'তে পারবেন। হরীশের শাদিতে দুবে বংশের এটাই সব থেকে বড় লাভ।'

ত্রিকূটনারায়ণ হাসেন, তবে এবার আর উত্তর দেন না।

এরপর হরীশের বিয়ে এবং তার পরবর্তী নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করতে করতে সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে। স্থির হয় আপাতত বিয়েটাই আসল ব্যাপার। সমস্ত মনোযোগ এবং এনার্জি সেখানেই প্রয়োগ করা হবে। তারপর প্রবল উদ্যমে নির্বাচনের কাজে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

একসময় আজকের মতো ইনার সার্কেলের সভা ভেঙে যায়। রাজভূষণরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর একতলার আম দরবার থেকে দোতলায় চলে আসেন ত্রিকূটনারায়ণ।

দোতলায় উঠলেই লম্বা টানা বারান্দা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বারান্দা প্রায় দশ ফুটের মতো চওড়া। সেটার একটা দিক গ্রিল দিয়ে ঘেরা। আরেক দিকে সারি সারি পনেরটা বিরাট বিরাট ঘর। বেশির ভাগ ঘরই তালাবন্ধ। কেননা এ বাড়িতে লোকজন বিশেষ নেই। ত্রিকূটনারায়ণ, তাঁর

স্ত্রী রেবতী, হরীশ, দুই বিধবা পিসি, আর ডজন দেড়েক নৌকর এবং নৌকরানী। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের একজন থাকে দ্বারভাঙ্গায়, আরেক জন গিরিডিতে। দুই শুচিবাইগ্রস্ত বিধবা পিসি তাঁদের যাবতীয় সংস্কার, ছুঁয়াছুতের বিচার ইত্যাদি নিয়ে একতলায় পড়ে থাকেন। পৃথিবীর কোনো কিছু সম্পর্কেই তাঁদের বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই।

ত্রিকূটের বড় পিসির বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে। স্বামীর বয়স তখন তেতাল্লিশ। দু বছরের মধ্যেই তিনি বিধবা হ'ন। ছোট পিসির বিয়ে হয়েছিল এগার বছর বয়সে, পঞ্চাশ বছরের এক বিরাট জমিমালিকের সঙ্গে। বিয়ের তিন বছরের মাথায় এই জমিমালিকটির দেহান্ত ঘটে। বিধবা হবার পর থেকেই দুই বোন বাপের বাড়ি 'ইন্দ্রধনুস'-এ এসে আছেন। জপতপ, ধর্মকর্ম, পূজাপার্বণ ইত্যাদি নিয়ে নিমগ্ন একাহারী মানুষ দু'টির অস্তিত্ব একেবারেই টের পাওয়া যায় না। নিজেদের আলাদা একটি জগৎ তৈরি ক'রে তাঁরা তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন।

হরীশও বেশির ভাগ সময় কাটায় পাটনার হোস্টেলে। আর রাজনীতির কারণে সারা বছরই হিল্লি দিল্লি ক'রে বেড়াতে হয় ত্রিকূটনারায়ণকে। কাজেই 'ইন্দ্রধনুস'-এ বেশির ভাগ সময়টা প্রায় একাই থাকতে হয় রোহিণীকে। একা বলাটা ঠিক হ'ল না। কেননা তাঁর বাপের বাড়ির বিপুল জনবল। সাত সাতটি ভাই এবং তাঁদের বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন। এই ভাই এবং তাঁদের বউদের কেউ না কেউ দু-এক মাস পর পরই এখানে হানা দিচ্ছে। যেমন এই মুহূর্তে ত্রিকূটনারায়ণের ছোট শালা রাজেশ এবং তার স্ত্রী উত্তরা তাদের দুটো বাচ্চাকে নিয়ে এ বাড়িতেই আছে। পরশু এসেছে তারা, থাকবে দিন দশেকের মতো।

বারান্দার একধারে বিশাল অ্যাকুয়েরিয়ামে অজস্র রঙিন মাছ। আর সিলিং থেকে সাত আট ফুট দূরে দূরে তারের জাল দিয়ে তৈরি চৌকো চৌকো পাখির খাঁচা ঝুলছে। সেগুলোর কোনোটায় তোতা, কোনোটায় ডজন ডজন মুনিয়া, কোনোটায় ম্যাকাও, কোনোটায় বা জোড়া জোড়া কাকাতুয়া।

কাকাতুয়াগুলো সবাই কিছু না কিছু বুলি শিখেছে। কেউ সুর ক'রে বলছে 'রাধাকিষুণ', কেউ 'সীয়ারাম', কেউ বা 'জয় জয় শিউশঙ্কর'। অন্য পাখিরা দুর্বোধ্য ভাষায় কিচির মিচির করছে।

পাখিগুলো ত্রিকূটনারায়ণকে দেখে প্রচুর হৈ চৈ বাধিয়ে দেয় এবং খাঁচার ভেতর সামনে ডানা ঝাপটাতে থাকে। তাঁকে ওরা খুব ভাল করেই চেনে।

প্রতিটি খাঁচার কাছে মিনিটখানেক ক'রে দাঁড়িয়ে খুব কোমল গলায়, গাঢ় স্নেহে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ঠিক হ্যায় রে চুন্নুয়া মুন্নুয়া বুন্নুয়া—'

সবাইকে আদর করতে করতে তিনি এগিয়ে যান। এত বড় টানা বারান্দায় ত্রিকূটনারায়ণ ছাড়া এখন আর কেউ নেই। নিচের তলায় নৌকর নৌকরানীরা যে যার কাজ করছে।

এই অংশটা থেকে বাড়ির পেছন দিকটা পুরোপুরি দেখা যায়। সেখানে ফলের বাগানে তিন চারটে দেহাতী লোক কেউ গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে, কেউ আগাছা সাফ করছে, কেউ বা বড় কাঁচি দিয়ে গাছের বুড়ো পাতা ছাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় চলে এলেন ত্রিকূটনারায়ণ। এটাই তাঁর শোবার ঘর।

তিরিশ ফুট লম্বা বিশ ফুট চওড়া এই প্রকাণ্ড ঘরটা আগাগোড়া ছ ইঞ্চি পুরু দামী কার্পেটে মোড়া। নতুন এবং পুরনো নানা ধরনের আসবাবে চারিদিক ঠাসা। প্রথম কেউ এসে ঢুকলে মনে হবে কোনো ফার্নিচারের দোকানে এসে ঢুকেছে।

এখানেই রোহিণী হরীশ রাজেশ এবং উত্তরাকে পাওয়া গেল। রাজেশের বাচ্চাদুটোকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই নৌকর নৌকরানীদের কেউ তাদের বাগানে টাগানে নিয়ে গেছে।

রোহিণী যথারীতি প্রচুর হীরেমোতি আর সোনার ভারী ভারী গয়না সারা গায়ে চড়িয়ে, দামী চোখ-ধাঁধানো শাড়ি পরে একটি সোফায় বসে আছেন। এইভাবে সারাদিন সেজেগুজে পটের রানী হয়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগে।

রোহিণীর হাতের কাছে একটা লম্বা সরু টেবলে চাঁদির প্রকাণ্ড পানের ডিবে আর তিন চারটে বাহারে জর্দার কৌটো। দিনে কম ক'রে তিরিশ চল্লিশ খিলি পান তিনি খেয়ে থাকেন।

রোহিণীর মুখোমুখি বসে আছে হরীশ রাজেশ এবং উত্তরা।

রোহিণী মজার গলায় বলেন, 'কি, তোমাদের মিটিং ভাঙল লিডারজি?' স্বামীকে ঠাট্টা-টাট্টা ক'রে মাঝে মাঝেই 'লিডারজি' বলে থাকেন তিনি।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'তা ভেঙেছে, লেকেন তোমাদের মিটিং ত পুরাদমে চলছে দেখছি।'

'তা চলছে। তোমাদের মিটিং-এ কী কথা হ'ল? : স্রিফ পলিটিক্স, তাই না? এম. এল. এ, এম. পি, মিনিস্টার, দিল্লি, পাটনা—এ সব ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই তোমরা জানো না।'

রাজনীতি ত্রিকূটনারায়ণের ধ্যানজ্ঞান এবং সর্বক্ষণের চিন্তা হ'লেও প্রাণের ভেতরটা তাঁর কর্কশ হয়ে যায়নি। মজা বা তামাশা করতে তিনিও যথেষ্টই পটু। একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'নেহী বিবিজি, আজ পোলিটিকস নিয়ে বাতচিত হয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট, বাকিটা হয়েছে তোমার ছেলের শাদির ব্যাপারে। মনে হচ্ছে, তোমরাও একই টপিক নিয়ে শির থেকে পসিনা বইয়ে দিচ্ছ।'

'ঠিকই ধরেছ।'

রাজেশ একজন মাঝারি ধরনের ঠিকাদার। 'ম্যাটার অফ ফ্যাকট ওয়ান্ডে'র মানুষ। সে বলে, 'আমরা শুধু গপসপ ক'রে আসর গরমই করছি না দুবেজি। কাজের কাজও কিছু করেছি।'

ত্রিকূটনারায়ণ তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'কাজের কাজটা কী শালে-সাহেব ?'

'হরীশ আর নয়া বহুর জন্যে পুব দিকে বড় কামরাটা সাজিয়ে ফেলেছি।'

এটা একটা নতুন খবর বটে। এবং অভাবিতও। রীতিমত অবাক হয়েই ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'শাদির ডেট এখনও ঠিক হয়নি। এর মধ্যে ছেলে আর বহুর কামরা সাজিয়ে ফেলেছ !'

রাজেশ বলে, 'শাদি ত হবেই। একটা একটা ক'রে কাম গুছিয়ে রাখছি। কিরকম সাজিয়েছি, দেখবেন চলুন।'

'এখন থাক। বহুত ভুখ লেগেছে। আগে ভোজন চুকিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে।'

'সেই ভাল।'

রোহিণী সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলেন, 'এবার একটা দরকারী কথা বলি।'

ত্রিকূটনারায়ণ জিজ্ঞেস করেন, 'কী ?'

'রাজু তো কিরণকে দ্যাখেনি। ওর ইচ্ছা আজ একবার হরীশকে নিয়ে বহুর সঙ্গে আলাপ ক'রে আসে। তুমি মুকুটনাথজিকে খবর পাঠিয়ে দাও, বিকেলে রাজুরা যাবে।'

কিরণকে দেখার ইচ্ছাটা কার যে বেশি তা বুঝতে এক মুহূর্তও লাগে না ত্রিকূটনারায়ণের। চোখের কোণ দিয়ে হরীশকে দেখতে দেখতে বলেন, 'ঠিক হ্যায়, এখনই তৌহরকে 'মিশ্র নিকেত'-এ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আট

সাগিয়াকে দিয়ে গোপনে কিরণ প্রভাকরকে সেদিন যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। এখনও প্রভাকরের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসেনি। ফলে কিরণ রীতিমত সংশয় এবং উৎকণ্ঠার মধ্যেই রয়েছে।

সাগিয়া যথেষ্টই চালাক চতুর মেয়ে। তবু শেষ পর্যন্ত চিঠিটা ডাকে দিতে পেরেছে কিনা কে জানে। যদিও সেদিন জোর দিয়েই সাগিয়া বলেছিল পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিটা সে লেটার বাক্সে ফেলে এসেছে।

এমনও হ'তে পারে, প্রভাকর হয়ত এই মুহূর্তে দিল্লিতে নেই। এই কারণে চিঠি তার ঠিকানায় পৌঁছলেও উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু দু'চারদিনের ভেতর প্রভাকর যদি কোনো ব্যবস্থা না ক'রে ফেলতে পারে কিরণকে অত্যন্ত বিপন্ন হ'য়ে পড়তে হবে। সে শুনেছে খুব তাড়াতাড়িই বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে ফেলবেন বশিষ্ঠনারায়ণ।

প্রায়ই কিরণের মনে হয়, মরিয়া হয়ে এবার সে পেটের ভ্রূণটার কথা জানিয়ে দেবে, কিন্তু জানাতে গিয়েও পারে না। লজ্জায় বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, অতটা বেপরোয়া হওয়া এখনও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু কিছু একটা তাকে করতেই হবে।

এবার 'মিশ্র নিকেত'-এ ফেরার পর থেকে বাড়িতে একরকম বন্দী জীবনই কাটাতে হচ্ছে কিরণকে। নিজের ঘরটি থেকে সে প্রায় বেরোয় না বললেই চলে। দিনে একবার অবশ্য মহেশ্বরী তাকে ডেকে পাঠান। সেখানে অনিবার্য নিয়মে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ থাকবেনই। দু'জনে মিলে তাঁরা তাকে সুনীতি, সংযম, মিশ্র নিকেত-এর কৌলীন্য এবং মর্যাদা, সদ্বংশের মেয়েদের আচার আচরণ, রাহান-সাহান ইত্যাদি সম্পর্কে বিপুল গাম্ভীর্যে পুরো এক দেড় ঘণ্টা উপদেশ দিয়ে যান। উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে শাস্ত্রে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুমারীদের বিষয়ে যে সব খটর মটর সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে সেগুলো আওড়াতে থাকেন বশিষ্ঠনারায়ণ। এ সবের একটা বর্ণও কিরণের মাথায় ঢোকে না, শুধু কানের পর্দায় সেগুলো একটানা বিপর্যয় ঘটিয়ে যায়। এইসব সংস্কৃত শ্লোকের উদ্দেশ্য কী, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না কিরণের। প্রভাকর সম্বন্ধে এঁদের সন্দেহ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তাঁদের ধারণায় যদি সামান্য দুর্বলতা এখনও থেকে থাকে, ঐভাবে তা শোধন ক'রে নিতে চান।

দিল্লিতে প্রায় স্বাধীনভাবেই এতগুলো বছর কাটিয়ে এসেছে কিরণ। কলেজ হোস্টেলে নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতেই হয়। সেটুকু বাদ দিলে তার চলাফেরার

স্বাধীনতা ছিল অবাধ। সেখানকার মুক্ত কসমোপলিটান আবহাওয়া থেকে এবার ধরমপুরায় আসার পর প্রতি মুহূর্তে কিরণের মনে হচ্ছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাড়ি থেকে যে বেরুবে তারও উপায় নেই। সে বুঝতে পারে তার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ছেলেবেলার এক বন্ধু আছে কিরণের। তার নাম ললিতা। সে ধরমপুরারই মেয়ে এবং তের বছর বয়সে এই শহরেরই একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। ধরমপুরার পুব দিকের শেষ মাথায় জানকী টোলিতে তার শ্বশুরবাড়ি।

ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে ললিতার সঙ্গে কিরণের যোগাযোগটুকু এখনও থেকে গেছে, যদিও জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা এবং স্বভাবের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। এই বয়সেই চারটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছে ললিতা। বাচ্চা মানুষ করা, শ্বশুর শাশুড়ির সেবাযত্ন, হাজারটা গেঁয়ো সংস্কার নিয়ে তার মা-ঠাকুমাদের তৈরি পরম্পরা মেনে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে ললিতা। প্রাচীন সাংসারিক ট্রাডিসান ভাঙার কথা সে ভাবতেও পারে না। দিল্লিতে না গেলে এই জীবনই হাসিমুখে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হ'ত কিরণকে। কেননা, এর বাইরেও মেয়েরা যে মাথা উঁচু ক'রে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে অন্যভাবে বাঁচতে পারে তা সে জানতেও পারত না। ভাবতেও পারত না মেয়েদের আলাদা কোনো আইডেনটিটি থাকতে পারে।

জীবনযাত্রার দিক থেকে ললিতা যেন এক শ' বছর পিছিয়ে আছে। তবু সাদাসিধে হাসিখুশি ঘোরপ্যাঁচহীন ছেলেবেলার এই বন্ধুটিকে খুবই পছন্দ করে কিরণ। দিল্লি থেকে ছুটিছাটায় ধরমপুরায় এলে প্রায় রোজই সে ললিতার শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি সাইকেল রিকশা ধরে সে, তারপর সোজা জানকী টৌলি। কিন্তু এবারেই শুধু যাওয়া হয়নি। প্রায় সাত আট দিন হ'ল খুবলাল তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছে। তারপর থেকে এমন সব কাণ্ড ঘটে চলেছে যে ললিতার কাছে যাওয়ার কথা প্রথম দিকে তার মনেও পড়েনি। পরশু দুপুরে হঠাৎ যখন মনে পড়ল তখনই যেতে চেয়েছিল কিরণ। 'মিশ্র নিকেত'-এর দম বন্ধ-করা আবহাওয়া থেকে বেরুতে পারলে কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও সে উৎকণ্ঠা অশান্তি এবং উত্তেজনা ভুলে থাকতে পারত।

কিন্তু দোতলা থেকে নেমে গেটের কাছে আসতেই বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান কাচুমাচু মুখে অত্যন্ত সসম্ভ্রমে জানিয়েছিল, কিরণের একা একা বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই।

প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল কিরণ। পরক্ষণে অসহ্য রাগে মাথার ভেতর রক্ত যেন ফুটতে শুরু করেছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল লোকটার গালে চড় কষিয়ে দেয়। তীব্র গলায় সে প্রায় চিৎকারই ক'রে উঠেছে, 'কার হুকুম ?'

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'বড়ে সরকারকা, দিদিজি—'

বড়ে সরকার, অর্থাৎ মুকুটনাথ মিশ্র। বাবুজি যে এভাবে তার ওপর মধ্যযুগীয় ডিকটেটরশিপ চালাবে, এতটা ভাবতে পারেনি কিরণ। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল।

দারোয়ান এবার বলেছে, 'মেরা কৌঈ কসুর নেহী দিদিজি—'

সত্যিই তো, এই লোকটার ওপর রাগারাগি ক'রে লাভ নেই। সে সামান্য নৌকর মাত্র। যার নুন খায় তার হুকুম তামিল করতে সে বাধ্য।

কিরণ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় রেবতী গেটের কাছে চলে আসেন। খুব সম্ভব শিউশংকরজির নতুন মন্দির বা মহেশ্বরীর কামরা কিংবা অন্য কোথাও থেকে তিনি তাকে দেখে থাকবেন। রেবতী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখানে কী করছ ?'

কী কারণে সে গেটের কাছে এসেছে, কিরণ জানিয়ে দিয়েছে।

রেবতী বলেছেন, 'ললিতার সসুরালে যেতে হবে না। নিজের ঘরে যাও।' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু দৃঢ়।

কিরণ বলেছে, 'প্রতি বারই তো দিল্লি থেকে এসে ওর কাছে যাই।'

'অন্য সব বার গেছ বলে এবারও যেতে হবে, এমন কোন কথা আছে ?'

'যাব না-ই বা কেন ?'

'আমরা কেউ চাই না, সেই জন্যে যাবে না।'

মাথার ভেতর রক্ত টগবগ করছিলই। কিরণের মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে সেটা ফেটে যেতে পারে। প্রবল উত্তেজনা এবং স্নায়বিক চাপের মধ্যেও দ্রুত চারপাশ একবার দেখে নিয়েছে কিরণ। গেটে দারোয়ানরা ত রয়েছেই, এধারে ওধারে নৌকর নৌকরানীরা ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল। কিরণ প্রাণপণ চেষ্টায় বিপজ্জনক কিছু ঘটতে দেয়নি। কাজের লোকেদের সামনে অপ্রিয় একটি নাটক করার মতো রুচি তার নেই। ইচ্ছা করলে জোর ক'রেই সে ললিতাদের বাড়ি যেতে পারত। তাকে আটকাতে হ'লে দারোয়ানকে গায়ে হাত দিতে হবে। তেমন দুঃসাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই তার নেই।

কিরণ চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন তোমরা চাইছ না ? কী এমন কারণ ঘটেছে ?'

যে রেবতী চিরদিনই শান্ত, নির্বিরোধ, যাঁর অস্তিত্ব এই 'মিশ্র নিকেত'-এ প্রায় টেরই পাওয়া যায় না—সেই মুহূর্তে তিনি প্রায় মারমুখী হয়ে উঠেছেন। উগ্র গলায় বলেছেন, 'তর্ক না ক'রে নিজের ঘরে চলে যাও।'

কিরণ আর কিছু বলেনি, স্থির চোখে মায়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে সামনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

এখন নিজের ঘরে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে অন্যমনস্কের মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে কিরণ।

বিকেল হয়ে গেছে।

ঘণ্টাখানেক আগেও রোদ থেকে হলকা ছুটছিল যেন। ধরমপুরার ওপর দিয়ে গনগনে লু-বাতাস অদৃশ্য ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে দূরে শস্যহীন মাঠগুলোর দিকে ধাওয়া ক'রে যাচ্ছিল। রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে, রংও বদলে গেছে। এখন রোদের রং হলুদ। সন্ধের আগেই সমস্ত চরাচর জুড়ে আরামদায়ক স্নিগ্ধতা নেমে আসবে।

সাগিয়া ঘরে এসে ঢোকে। তার হাতে পোর্সেলিনের দামী কাপে ব্ল্যাক কফি। রোজ এই সময়টা কফি ক'রে নিয়ে আসে সে।

সাগিয়ার পায়ের আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ। কফির কাপটা নিতে নিতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে বলে, 'আচ্ছা সাগিয়া—'

সাগিয়া কিরণের মুখের দিকে তাকায়, 'কী দিদিজি?'

কিরণ অনেকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'সেদিন চিঠিটা ঠিকমতো ডাকে দিয়েছিলি ত?' এই প্রশ্নটা সে আগে আরো কয়েক বার করেছে।

সাগিয়া বলে, হাঁ দিদিজি। আমি নিজের হাতে ডাকে দিয়েছি। চিন্তা করো না। যাকে লিখেছ সে ঠিক পেয়ে যাবে।'

কিরণ আর কিছু বলে না, ফের জানালা দিয়ে অনেক দূরে বাইরের রাস্তার দিকে তাকায়।

সাগিয়া কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ করে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবনাটা আবার তার মাথায় ফিরে আসে। এবার 'মিশ্র নিকেত'-এ এসে যেভাবে সে ফাঁদে আটকে গেছে তাতে

প্রভাকরই একমাত্র তাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারে। প্রভাকরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার কাছে অন্য কোনো পথই খোলা নেই।

হঠাৎ কিরণের চোখে পড়ে, একটা মোটর দূরের হাইওয়ে থেকে পাশের রাস্তায় ঢুকে তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। একটু পর গাড়িটা তাদের বিশাল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

কিরণ প্রথমটা লক্ষ করেনি। এবার দেখতে পায়, মোটর থেকে চর্বির ছোটখাটো একটি পাহাড় নেমে আসছে। বছর দুই পর দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না কিরণের। ত্রিকূটনারায়ণের ছেলে হরীশ। দু' বছর আগে কিরণ তার যে চেহারা দেখেছিল এখন সে তার প্রায় দেড় গুণ। যেভাবে সারা শরীরে হরীশ চর্বি জমাচ্ছে তাতে পাঁচ বছর বাদে তার আকার কী দাঁড়াবে ভাবতেও ভয় হয়।

সাত আট বছর বয়সেই এই ছেলেটার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মহেশ্বরীর কথায় হরীশ নাকি তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী। একটা অর্ধশিক্ষিত আনকালচারড বেঢপ চেহারার ছোকরাকে চক্রান্ত ক'রে মিশ্র এবং দুবে ফ্যামিলি তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চলেছে। বিয়ে সম্পর্কে তার নিজস্ব যে একটা মতামত থাকতে পারে, এ নিয়ে আদৌ কারো মাথাব্যথা নেই। মুকুটনাথ এবং ত্রিকূট-নারায়ণের সিদ্ধান্তটাই হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কারো কিছু যে বলার থাকতে পারে, তাঁদের কথাই যে শেষ কথা নয়, এ সব ভেবে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন না মুকুটনাথেরা। দিল্লিতে না গেলে সে জানতেই পারত না তাদের সোসাইটিতে মেয়েদের আসল জায়গাটা ঠিক কোথায়। হরীশের সঙ্গে তার বিয়েটাকে অদৃষ্ট, নিয়তি, বিধিলিপি ইত্যাদি বলেই সে ধরে নিত।

হরীশের পেছন পেছন রাজেশও নেমে এসেছিল। হরীশের চাইতে সাত আট বছরের বড়ো সে। ধারাল চেহারা, শরীরে এক গ্রাম অনাবশ্যক মেদ নেই।

রাজেশকে আগে কখনও দেখেনি কিরণ। যাই হোক, দু'জনকে দেখতে দেখতে কপাল কুঁচকে যায় তার। অসহ্য বিরক্তি এবং রাগে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে। কপালের দু' পাশের শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে।

এদিকে রাজেশরা মোটর থেকে নামতেই নৌকররা দৌড়ে যায়। তারপর দেখা গেল শশব্যস্তে মুকুটনাথ প্রায় ছুটতে ছুটতেই তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বিগলিত ভঙ্গিতে কিছু বলছেন। কথাগুলো শোনা না গেলেও বোঝাই যাচ্ছে, যথেষ্ট খাতির ক'রে হরীশদের বাড়ির ভেতর যেতে অনুরোধ করছেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় হরীশদের সঙ্গে নিয়ে মুকুটনাথ প্রথমে নতুন শিব মন্দিরের দিকে গেলেন। সেখানে হরীশরা শিউশংকরজির মুরতকে প্রণাম ক'রে মুকুটনাথের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একতলার উঁচু বারান্দায় উঠতে লাগল। একটু পর তারা চোখের আড়ালে চলে যায়।

কয়েক মিনিট বাদে কী ঘটতে চলেছে, দোতলায় নিজের ঘরে বসে পরিষ্কার যেন দেখতে পায় কিরণ। তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

যা ভাবা গিয়েছিল, কিছুক্ষণের মধ্যে তা-ই ঘটে যায়। রেবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কিরণের মনে হয়েছিল, সাগিয়া বা অন্য কোনো নৌকরানীকে তার কাছে পাঠানো হবে। কেননা এবার দিল্লি থেকে তাকে নিয়ে আসার পর রেবতী বা মুকুটনাথ কেউ তার ঘরে একদিনও আসেননি। মাকে দেখে কিরণ চমকে ওঠে।

রেবতী বলেন, 'হরীশ এসেছে।'

কিরণ উত্তর দেয় না।

রেবতী ফের বলেন, 'ভালো শাড়ি-জামা পরে নে। সুষ্‌মা এসে তোকে নিয়ে যাবে।' চিরকালের শান্ত চুপচাপ মায়ের গলায় কর্তৃত্ব এবং আদেশের সুর।

অর্থাৎ সাজগোজ ক'রে হরীশদের কাছে তাকে যেতে বলছেন রেবতী। কিরণের মাথার ভেতরটা জ্বালা করতে থাকে। ভাবল—বলে ফেলে, সে সং-টং সেজে যেতে পারবে না। কিন্তু বলার আগেই মা দরজার সামনে থেকে চলে গেছেন।

বেশ খানিকক্ষণ অনড় হ'য়ে বসে থাকে কিরণ। খাট থেকে নেমে পোশাক বদলাবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। একসময় নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে কী ভেবে পোশাক বদলে নেয়, এমনকি মুখে গালে গলায় পাউডারও বুলোয়, শাড়িতে দামী একটু সেন্টও ছড়িয়ে দেয়।

একটু সাজসজ্জা ক'রে না গেলে এখনই হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে। মুকুটনাথ এবং রেবতী দৌড়ে আসবেন। এই মুহূর্তে যখন সে কোনোরকম কনফ্রনটেশনে যাচ্ছে না তখন উত্তেজনা বাড়িয়ে কী লাভ? প্রভাকরের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তার অধৈর্য হ'লে চলবে না।

সুষ্‌মা এসে ঘরের ভেতর দাঁড়ায়। কোমরে দুই হাত রেখে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়ে কিরণকে কিছুক্ষণ দেখে নেয় সে। তারপর কর্কশ গলায় বলে, 'বিলকুল সিনেমার হিরোইন সেজেছিস দেখছি। বর এসেছে, মনে খুশির লহর খেলে যাচ্ছে!'

বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তিতে সারা মন ভরে আছে, তবু সুষ্‌মার সঙ্গে একটা মজা করতে ইচ্ছা হ'ল। বলল, 'এক কাজ করবি সুষ্‌মা ?'

ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে কিরণকে লক্ষ করে সুষ্‌মা। বলে, 'কী ?'

'হরীশকে তুই বিয়ে করবি ? যদি করিস তো বাবুজিকে বলে ব্যবস্থা করে দিই।' বলে নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ ক'রে তাকায় কিরণ।

সুষ্‌মা একেবারে ক্ষেপে যায়। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হিংস্র মুখে বলে, 'ঐ হাথীকে আমার দরকার নেই। তোর হাথী তোরই গলায় ঝুলুক। এখন চল, নিচে বাবুজি ডাকছে।'

একটু পর সুষ্‌মার সঙ্গে একতলায় বসার ঘরে চলে আসে কিরণ। এখানেই সেদিন রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণকে বসানো হয়েছিল।

এই মুহূর্তে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে আছে হরীশ আর রাজেশ। তাদের মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় মুকুটনাথ। হরীশের সামনে নিচু সেণ্টার টেবিলে প্রচুর মিঠাই আর নোনতা খাবার। আর ট্রেতে রয়েছে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং কয়েকটা দামী কাপ-প্লেট।

মুকুটনাথ দিল্লি থেকে আসার পর কিরণের সঙ্গে দু' একটার বেশি কথা বলেননি। তাঁর চোখমুখ দেখে টের পাওয়া গেছে, সারাক্ষণ তার ওপর বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। কিন্তু হরীশের সামনে হাসিমুখে, অত্যন্ত নরম গলায় ডাকলেন, 'আ বেটা, এখানে আয়।' কিরণকে নিজের পাশের সোফায় বসিয়ে বললেন, 'হরীশ আর রাজেশ এসেছে। রাজেশকে তো তুই আগে দেখিসনি। ও হরীশের ছোট মামা।'

রাজেশের মতো অল্পবয়সী যুবককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে কিনা প্রথমটা কিরণ ভেবে উঠতে পারল না। তারপর মনস্থির ক'রে ফেলল। হাত জোড় ক'রে বলল, 'নমস্তে—'

চোখ কুঁচকে কিরণকে একবার দেখে নিলেন মুকুটনাথ। বয়স কম হ'লেও সম্পর্কে রাজেশ তার গুরুজন। তার পায়ে মাথা ঠেকানো খুবই উচিত ছিল। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গেছে। রাহান সাহান এবং সহবত নিয়ে এখন চেঁচামেচি বা বকাবকি করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। মুকুটনাথ প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলেন।

রাজেশ অবশ্য খারাপভাবে ব্যাপারটা নেয়নি। সে-ও হাতজোড় ক'রে বলে, 'নমস্তে—'

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। বলেন, 'আচ্ছা, তোমরা গল্পটল্প কর। আমি যাই। জরুরি কাজ আছে।'

সুষ্‌মা খানিকটা দূরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সঙ্গে ক'রে বাইরে চলে গেলেন মুকুটনাথ। আগেও কিরণ লক্ষ করেছে, হরীশ এলে তাকে তার সামনে বসিয়ে কোনো এক অছিলায় বেরিয়ে গেছেন তিনি। এইভাবে আলাদা কথা বলার এবং মেলামেশার সুযোগ ক'রে দিয়েছেন।

কিরণ ঘরে ঢোকামাত্র হরীশের ছোট ছোট গোল চোখ দুটো তার গায়ে যেন আটকে গিয়েছিল। তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্য তার দিক থেকে চোখ সরায়নি হরীশ।

এবারই শুধু নয়, আগেও যখন হরীশের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিরণের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছে সে। তার তাকানোটা এমন যে গা ঘিন ঘিন করে। মনে হয়, চামড়ার ওপর দিয়ে একটা নোংরা পোকা হেঁটে যাচ্ছে। কিরণ ভাবল, মুকুটনাথেরা জোরজার ক'রে এই লোকটার সঙ্গে যদি তার জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করেন, দু' দিনেই নির্ঘাত মরে যাবে সে।

হরীশ বলল, 'রাজু মামা তোমাকে তো আগে দেখেনি—তাই ধরে নিয়ে এলাম।'

কিরণ বলে, 'উনি যে দয়া ক'রে এসেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ।' বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে সেণ্টার টেবিলে যে দামী দামী মিঠাই পড়ে আছে, সেগুলো এখনও ছোঁয়নি হরীশরা। কিরণ এবার অনুরোধের সুরে বলে, 'একি, আপনারা ত কিছুই খাচ্ছেন না। · প্লীজ, আরম্ভ করুন।'

'আপনি' না 'তুমি' কিরণকে কী বলবে, এই নিয়ে রাজেশকে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত দেখায়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের ভেতরের কুণ্ঠাটা কাটিয়ে ওঠে। কয়েক দিনের মধ্যে যে মেয়েটি তার ভাঞ্জা বা ভাগ্নের স্ত্রী হ'তে চলেছে তাকে 'আপনি' ক'রে বলার মানে হয় না। রাজেশ বলে, 'তুমিও শুরু কর।'

কিরণ সবিনয়ে জানায়, আজ দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন খেলে ভীষণ কষ্ট হবে।

রাজেশ আর কিছু না বলে প্লেট থেকে একটা কলাকন্দ তুলে নেয়। হরীশও বিরাট আকারের গুলাবজামুন তুলে খেতে শুরু করে।

কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কোথায় থাকেন ?'

কোথায় থাকে, রাজেশ জানিয়ে দেয়। তারপর বলে, জায়গাটা খুব ভাল।

তোমাদের বিয়ের পর আমাদের ওখানে নিয়ে যাব। দূরে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, একটা নদীও রয়েছে। বেড়াবার পক্ষে চমৎকার। অবশ্য—'

কিরণ বলে, 'কী ?'

'তুমি ত শুনেছি একরকম দিল্লিরই মেয়ে। অত বড়ো শহরে থাকার পর পাহাড় জঙ্গল কি ভাল লাগবে ?' বলে হাসে রাজেশ।

এই মানুষটিকে মোটামুটি ভালই লাগে কিরণের। তার চোখেমুখে সারল্য মাখানো, কথাবার্তায় রয়েছে আন্তরিকতা।

হরীশের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তবেই রাজেশদের কাছে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মরে গেলেও সে যে ঐ চর্বির পাহাড়কে বিয়ে করবে না, এই কথাটা এখন জানালে সারা বাড়ি তোলপাড় হ'য়ে যাবে। প্রভাকরের চিঠি না আসা পর্যন্ত যখন সে কনফ্রনটেশনে যাচ্ছে না তখন উত্তেজনা সৃষ্টি করলে শুধু ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে স্বাভাবিকভাবে সে বলে, 'শহর যেমন আমার ভাল লাগে, নেচারও তেমনি পছন্দ করি।'

রাজেশ খুশি হয়ে বলে, 'ফাইন। আচ্ছা কিরণ—'

মুখ তুলে রাজেশের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় কিরণ।

রাজেশ জিজ্ঞেস করে, 'কত দিন যেন দিল্লিতে কাটিয়ে এলে ?'

কিরণ বলে, 'চোদ্দ পনেরো বছর।'

'জানো, আমি কখনও দিল্লি যাইনি। ভাবছি, একবার যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। সবারই দেশের ক্যাপিটাল দেখে আসা উচিত।'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিল্লি সম্বন্ধে নানা খবর জেনে নেয় রাজেশ। তারপর বলে, 'অত বড়ো শহরে এতদিন থাকার পর হরীশদের কামতিগঞ্জ টাউনে গিয়ে থাকতে কি তোমার ভাল লাগবে ?'

হরীশ একের পর এক লাড্ডু, প্যাঁড়া এবং গুলাবজামুন খেয়ে যাচ্ছিল। একটা লাড্ডু চিবুতে চিবুতে জড়ানো গলায় সে বলে, 'নেহী নেহী—'

রাজেশ এবং কিরণ চমকে উঠে হরীশের দিকে তাকায়। রাজেশ বলে, 'কী হ'ল ?'

'কিরণকে কামতিগঞ্জে বেশিদিন থাকতে হবে না। অ্যাভারেজে, মান্থলি ম্যাকসিমাম দশ বারো দিন।'

'বাকি আঠার কুড়ি দিন কোথায় থাকবে ?'

'বাবুজি যখন এম. এল. এ তখন পাটনায়। পরের ইলেকসানে এম. পি হ'লে

দিল্লিতে। এম. পি হ'তে পারলে সার্টেনলি বাবুজি সেণ্ট্রাল মিনিস্টার হবেন। তখন বছরে পাঁচ দিনও কিরণ কামতিগঞ্জে থাকতে পারবে কিনা, আই ডাউট। কিরণ হবে বাবুজির প্রাইভেট সেক্রেটারি।' কথার ফাঁকে ফাঁকে দু' চারটে ইংরেজি শব্দ গুঁজে দেয় হরীশ। সে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে, খুব সম্ভব তা প্রমাণ করার জন্য।

রাজেশের হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ে যায়। সে ব্যস্তভাবে বলে, 'আরে তাই ত, দুবেজি একজন পোলিটিসিয়ান। এম. পি কি মিনিস্টার বনলে তাঁকে দিল্লিতে থাকতেই হবে। কিরণ তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হ'লে তাকেও ত সেখানেই থাকতে হয়।'

কিরণ কোনো প্রতিবাদ করে না। সে শুধু হাসে।

এলোমেলো আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হঠাৎ রাজেশ বলে, 'দুবেজি বলছিলেন, তোমাদের নতুন মন্দির আর তোমার ঠাকুমাকে যেন দর্শন ক'রে যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

কিরণ উঠে পড়ে, 'চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। আগে মন্দির দেখিয়ে তারপর ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাব।'

রাজেশ বলে, 'না, না, সঙ্গে আসতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাব।'

'আপনি এ বাড়িতে নতুন এসেছেন। অসুবিধা হবে।'

'কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা গল্প কর।' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় রাজেশ।

প্রথমটা অবাক হয়ে যায় কিরণ। পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আগে থেকে ওরা দু'জনে পরিকল্পনা ছকে এখানে এসেছে। আলাপ পরিচয়ের পর রাজেশ মন্দির এবং মহেশ্বরীকে দর্শন করার অছিলায় উঠে যাবে। উদ্দেশ্য, হরীশকে তার সঙ্গে আলাদা ক'রে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ ক'রে দেওয়া।

কিন্তু রাজেশকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া অভদ্রতা। কিরণ একটা নৌকরকে ডেকে রাজেশের সঙ্গে যেতে বলে ফের সোফায় এসে বসে।

কিরণকে একা পেয়ে খুশিতে হরীশের মুখে আঠালো গ্যাদগেদে হাসি ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, তার ভেতরে উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কিরণকে দেখার পর থেকে তার চোখে আর পাতা পড়েনি। পলকহীন সে তাকিয়েই আছে।

হরীশ বলে, 'এবার দু'বছর বাদে তোমাকে দেখলাম। মনে হচ্ছে টু সেঞ্চুরিজ। অবশ্য—'এই পর্যন্ত বলে হাসিটাকে বিশাল মুখে আরো অনেকটা ছড়িয়ে দেয়।

কিরণ উত্তর দেয় না, ঠোঁট টিপে স্থির চোখে হরীশকে দেখতে থাকে।

হরীশ আবার বলে, 'এখন থেকে এক বছর দু'বছর পর আর তোমাকে দেখতে হবে না। সব সময় তোমাকে কাছে কাছে পাব। এতদিনে আমার ড্রিমটা সত্যি হ'তে চলেছে।'

হঠাৎ মাথার ভেতর একটা শিরা যেন ছিঁড়ে যায় কিরণের। সে বলে, 'ড্রিম ত সত্যি হ'তে চলেছে কিন্তু তার আগে তোমার ক'টা খবর জানা দরকার।'

প্রচণ্ড উৎসাহে টেবিলের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে হরীশ। বলে, 'কী খবর?'

'তুমি কি জানো দিল্লিতে থাকার সময় অনেক ছেলের সঙ্গে আমি ফ্রীলি মেলামেশা করেছি?'

হরীশ বলে, 'ও, এই ব্যাপার। বেশ করেছ, মিশেছ। আজকাল বড়ো বড়ো সিটিতে ছেলেমেয়েদের ফ্রী মিক্সিং চলছে। পাটনাতেও আমি এ সব দেখেছি। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দিল্লি বম্বে কলকাতা পাটনা ত আর ধরমপুরা কি কামতিগঞ্জ নয়। তা ছাড়া—'

'কী?'

'বাবুজি এম. পি কি মিনিস্টার হ'লে তোমাকে কত লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। আই ডোণ্ট মাইণ্ড।'

'দ্যাটস রাইট। কিন্তু যে সব ছেলের সঙ্গে মিশেছি তাদের কারো সঙ্গে যদি আমার ইন্টিম্যাসি হ'য়ে থাকে?'

হরীশের হাসির জেল্লা নিভে যেতে থাকে। সে মরিয়া হয়ে বলে, 'ধুস, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ—স্রেফ জোক।'

কিরণ চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'ধরো যদি ব্যাপারটা মজা না হয়—'

হরীশের মুখে যে নিভু নিভু হাসিটুকু এখনও আটকে আছে, সেটা একেবারেই মুছে যায়। ভারী গলায় সে বলে, 'এসব কথা শোনার জন্যে কি এতগুলো বছর আমি ওয়েট করছি কিরণ?'

এই সাদাসিধে, ঘি-মাখন খাওয়া, বাপ-মায়ের আদুরে ছেলেটার জন্য হঠাৎ করুণাই হয় কিরণের। কিন্তু সে ধীরে ধীরে যে মারাত্মক প্রসঙ্গটার দিকে এগিয়ে গেছে সেখান থেকে ফেরার আর উপায় নেই। কিরণ লক্ষ করল, এর মধ্যেই গল গল ক'রে ঘামতে শুরু করেছে হরীশ। সবটা শোনার পর নিশ্চয়ই অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। যা হবার হোক, কাউকে না কাউকে ব্যাপারটা ত

বলতেই হবে। হরীশকেই না হয় বলা যাক। তাকে বললে মুহূর্তে সবাই জেনে যাবে।

কিরণ বলে, 'তুমি বোধ হয় শোনোনি, একটি ছেলের সঙ্গে আমার ইন্টিম্যাসি এত বেড়ে গিয়েছিল যে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবুজিকে সব জানিয়ে চিঠি লেখেন। বাবুজি সঙ্গে সঙ্গে খুবলাল ভকিলকে পাঠিয়ে আমাকে ধরমপুরায় নিয়ে আসেন।'

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে হরীশ। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'তোমার সঙ্গে ছেলেটির যা-ই হয়ে থাক, ও সব আমি গ্রাহ্য করি না। পাস্ট নিয়ে আমার হেড-এক্ নেই।'

কিরণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রেবতী ঘরে এসে ঢোকেন। বলেন, 'দাদীজি তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন হরীশ। এসো আমার সঙ্গে—'

'হাঁ, মাতাজি—' অতি কষ্টে নিজেকে সোফা থেকে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করায় হরীশ। তারপর রেবতীকে প্রণাম ক'রে তাঁর সঙ্গে মহেশ্বরীর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কোন ছেলের সঙ্গে কিরণের কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা নিয়ে তার আর আগ্রহ নেই। কিরণকে যেভাবে হোক পেলেই সে খুশি, তার স্বপ্ন সার্থক।

এত বড়ো একটা সুযোগ পেয়েও হরীশকে সবটা বলা গেল না। কিরণকে রীতিমত হতাশ দেখায়।

রেবতীরা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে রেবতী বলেন, 'তুইও আয়। এখানে একা একা বসে থেকে কী করবি?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় কিরণ।

নয়

'মিশ্র নিকেত'-এর জীবনযাত্রা খুবই ঢিলেঢালা। এখানে সময় ঢিমে চালে বয়ে যায়। কিন্তু আজকের দিনটা বছরের অন্য সব দিন থেকে আলাদা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে নিজের ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট করতে করতে কিরণের চোখে পড়ে, নতুন শিব মন্দিরের সামনের খোলা মাঠে ভকিল খুবলাল সহায় চার পাঁচটা নৌকর দিয়ে দুটো ফীটন ধুইয়ে মুছিয়ে ঝকঝকে ক'রে তুলছে। আরো দুই নৌকর গোটা চারেক দামী স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার গা পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মুকুটনাথ এসে হাঁকডাক ক'রে গাড়ি এবং ঘোড়া

সাফাইয়ের তদারক ক'রে যাচ্ছেন। তা ছাড়া নৌকরানীরা রসুইকরেরা যে যার কাজ তটস্থ ভঙ্গিতে করে যাচ্ছে।

এই ব্যস্ততার কারণ খুব ভাল ক'রেই জানে কিরণ। একটু বেলা হ'লে ত্রিকূট-নারায়ণরা আসবেন। দিন দুই আগে স্বয়ং মুকুটনাথ কামতিগঞ্জে গিয়ে তাঁদের আজ এখানে আসার জন্য অনুরোধ ক'রে এসেছেন। ওঁরা এলেই ফীটনে ক'রে বেরিয়ে পড়বেন। এই বিরাট কর্মসূচির পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। পুব দিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গোলগোলি মৌজার গায়ে যে এক শ' বিঘে জমি মুকুটনাথ কিরণের বিয়েতে যৌতুক দিতে চান, সেটা ত্রিকূটনারায়ণদের দেখিয়ে দেবেন। পরে ওঁরা যেন বলতে না পারেন এক জমি দেখিয়ে অন্য জমি দেওয়া হয়েছে।

প্রথম থেকেই জমি নেওয়ার ব্যাপারে মৌখিক আপত্তি জানিয়ে এসেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। পরে অবশ্য নিতে রাজী হয়েছেন। তবে সেদিনও আরেক বার মৃদু গলায় বলেছিলেন, জমিটা না দিলেই তিনি খুশি হবেন। কিন্তু মুকুটনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে আগাগোড়া অটল। তিনি জানেন, ওটা ত্রিকূটনারায়ণের কথার কথা। জমির লালচ তাঁর যথেষ্টই রয়েছে।

মুকুটনাথ হাতজোড় ক'রে সেদিন বলে এসেছিলেন, জমি দেখাবার পর 'মিশ্র নিকেত'-এ কিঞ্চিৎ শাকাহার ক'রে গেলে তিনি কৃতার্থ হ'ন। ত্রিকূটনারায়ণ প্রথমে রাজী হ'ননি। বলেছেন, এ সব ঝঞ্ঝাট করার মানে হয় না। কিন্তু মুকুটনাথ নাছোড়বান্দা। অগত্যা নিরুপায় হয়েই খাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। সেই জন্যেই গোটা 'মিশ্র নিকেত' আজ এত সরগরম।

শিবমন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় গাড়ি সাফাই এবং ঘোড়া সাজানো দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল কিরণের। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল তার। হরীশের সঙ্গে তার বিয়ের যে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যৌতুকের জমি দেখতে যাওয়া তার একটা অত্যন্ত জরুরি অংশ। এটা ভাবতে গিয়ে অসহ্য রাগে কিরণের মাথা থেকে গরম ভাপ বেরুতে থাকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে রাগ অস্থিরতা বা বিরক্তি, কিছুই আর অনুভব করল না কিরণ। যে বিয়ে কেনোদিনই হবার নয় তা নিয়ে নিজের স্নায়ুকে উত্তেজিত করার মানে হয় না: প্রভাকর এলেই 'মিশ্র নিকেত' এবং 'ইন্দ্রধনুস'-এর প্রতিটি মানুষকে কিরণ জানিয়ে দেবে তার শরীরে একটি ভ্রূণ রয়েছে, আর প্রভাকরের বীজ থেকেই তার জন্ম। এরপর নিশ্চয়ই মুকুটনাথ মিশ্র তাকে বাড়িতে এক মুহূর্তও থাকতে

দেবেন না, সোজা গেটের বাইরে বের ক'রে দিয়ে গোটা 'মিশ্র নিকেত'কে গঙ্গাজলে বাইশ বার ধুইয়ে, অষ্টপ্রহর যজ্ঞ-টজ্ঞ ক'রে পাপমুক্ত করাবেন।

মুকুটনাথ তাকে তাড়িয়ে দিন, এটাই কিরণ চায়। কিন্তু পেটের ভ্রূণটার কথা না জানালে সে সম্ভাবনা আদৌ নেই। প্রভাকর না আসা পর্যন্ত এটা জানানো যাবে না। তার মধ্যে মুকুটনাথরা যত বার ইচ্ছা যৌতুকের জমি দেখান, যেভাবে খুশি বিয়ের প্রস্তুতি চালান, শেষ অস্ত্রটা ত তার হাতেই থেকে যাচ্ছে।

'এখনও বসে আছিস?'

গলার আওয়াজে চমকে ঘুরে বসে কিরণ। দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন রেবতী।

বেশ অবাকই হয়ে যায় কিরণ। কেননা, এবার দিল্লি থেকে আসার পর একবারও মা তার কাছে আসেননি, নিজের থেকে যেচে কথা বলেননি। আজই প্রথম এলেন।

রেবতীর প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে কিরণ বলে, 'কী করব তা হ'লে?'

'কাল রাত্তিরে তোর বাবুজি তোকে কী বলেছিল?' রেবতী সোজাসুজি কিরণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

এবার কিরণের মনে পড়ে যায়। মুকুটনাথ কাল রাতে তাকে বলেছিলেন, সকালে ন'টা নাগাদ সে যেন ভাল শাড়ি-টাড়ি পরে রেডি থাকে। সবাই মিলে যৌতুকের জন্য যে জমি দেখতে যাওয়া হচ্ছে সেই দলে কিরণকেও থাকতে হবে। কিরণ আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি মুকুটনাথ।

কিরণ রেবতীকে বলে, 'আমি যাব না।'

রেবতী ভাবলেন, সঙ্কোচের জন্যই হয়ত যেতে চাইছে না কিরণ। কোনো মেয়ে কি নিজের বিয়ের যৌতুক দেখে এবং যাচাই ক'রে নেয়? ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর।

অল্প হেসে রেবতী ঘরের ভেতর চলে এলেন। কোমল স্বরে বলেন, 'তোর যাওয়া দরকার—'

'কেন?'

'জমিটা তোর নামে লিখে দেওয়া হবে। কী দেওয়া হ'ল, সেটা দেখে নিবি না?'

কিরণ উত্তর দেয় না।

রেবতী এবার যা বলেন তা এইরকম। দহেজ অর্থাৎ পণ এবং যৌতুক হ'ল মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো জোরের জায়গা। বাপের বাড়ি থেকে যে যত দহেজ নিয়ে যেতে পারবে শ্বশুরবাড়িতে তার তত খাতির, তত মর্যাদা। বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ যতই থাক, দহেজ আনতে না পারলে ও সবের দাম কানাকড়িও না।

সব শুনেও কিরণ চুপ ক'রে থাকে।

রেবতীর মনে হয়, তাঁর কথাগুলো কিরণের মাথায় সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। সে যে কোনোরকম আপত্তি না ক'রে, চুপচাপ তাঁর কথা শুনে গেল, এতে তিনি যথেষ্ট স্বস্তিবোধ করেন।

দিল্লি থেকে কিরণের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কিছুদিন আগে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন রেবতী। কয়েক রাত তিনি ঘুমোতে পারেননি। বার বার শিউশঙ্করজি এবং বিষ্ণুজির কাছে প্রার্থনা করেছেন, পবিত্র মিশ্র বংশে যেন কলঙ্ক না লাগে। ভ্রষ্টাচার এবং মতিচ্ছন্নতার পথ থেকে ফিরে এসে কিরণ যেন পারিবারিক সম্মান অটুট রাখে।

রেবতী লক্ষ করেছেন, দিল্লি থেকে এবার ফেরার পর কিরণের মধ্যে কোথায় যেন সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেটা ঠিক স্পষ্ট ক'রে ধরা যাচ্ছিল না, তবে অনুভব করতে পারছিলেন। ফলে তাঁর উৎকণ্ঠা এবং রক্তচাপ বেড়েই যাচ্ছিল। আজই কিরণের সঙ্গে কথা বলে মনে হ'ল, মাঝখানে সামান্য ঝাঁকুনি লাগলেও পরম্পরা নষ্ট হয়নি। মিশ্র বংশের আগের আগের প্রজন্মের মেয়েদের থেকে সে আলাদা কিছু নয়।

রেবতী আবার বলেন, 'এতে লজ্জার কিছু নেই। নিজের জিনিস নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভাল।' একটু ভেবে ফের বলেন, 'আরেকটা কথা'—

খুব একটা আগ্রহ দেখায় না কিরণ। নিরুৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী ?'

রেবতী জানান, ত্রিকূটনারায়ণদের বংশে পুতহু বা পুত্রবধূ পোড়াবার দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু সে সব অনেক কালের পুরনো কথা। ছুবেরা এখন পুরোপুরি বদলে গেছে। তাদের হাত দিয়ে এখন আর কোনো নোংরা কাজ হওয়া সম্ভব না। তবু কিরণের সতর্ক থাকা দরকার। মুকুটনাথ যে জমিটা যৌতুক হিসেবে তাকে দিতে যাচ্ছেন সেটা যেন কোনোক্রমেই সে ত্রিকূটনারায়ণদের নামে লিখে না দেয়।

অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কিরণ বলে, 'ও, আচ্ছা—'

রেবতী বলেন, 'আমার আর দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। ওদিকে অনেক

কাজ পড়ে আছে। তুই তুরন্ত জামাকাপড় বদল ক'রে নে। ভাল সিল্কের শাড়ি পরবি।' বলেই ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

কিরণ ভাবল, প্রভাকর না আসা পর্যন্ত সংঘর্ষে নামার মানে হয় না। ব্রেকফাস্ট শেষ ক'রে বাধ্য মেয়ের মতো সে দামী শাড়ি এবং জামা টামা পরে। এমন কি ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে ঠোঁটে এবং গালে একটু রংও বুলিয়ে নেয়। তারপর চোখে আই-ব্রো পেন্সিল টেনে যখন সারা গায়ে সেন্ট ছড়াতে শুরু করেছে সেই সময় নিচে হৈচৈ শোনা যায়। জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে ত্রিকূটনারায়ণ, হরীশ এবং রাজেশ পুরনো মডেলের একটা বিরাট ফোর্ড গাড়ি থেকে নামছেন, আর মুকুটনাথ এবং খুবলাল যথেষ্ট বশংবদ ভঙ্গিতে তাঁদের খাতিরদারি করছে।

ওঁরা কী বলছেন, প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চতা থেকে শোনা যাচ্ছে না, তবু এটা বোঝা যায় মুকুটনাথরা ত্রিকূটনারায়ণদের ভেতরে এসে একটু চা খেয়ে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন। কিন্তু এখন চা খেতে গেলে অনেক বেলা হয়ে যাবে। তাঁদের মতে আগে আসল কাজটা সেরে আসা দরকার।

ত্রিকূটনারায়ণদের দেখে বিশেষ চাঞ্চল্য বোধ করল না কিরণ, ড্রেসিং টেবলের সামনের কুশন থেকে উঠলও না।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না। রেবতী ছুটতে ছুটতে ফের চলে এলেন। বললেন, 'কি রে, তোর হয়েছে?'

উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কিরণ।

রেবতী এক পলক মেয়ের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। তাঁর চোখে আলো ছলকাতে থাকে। মেয়ের সাজ দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। গভীর স্নেহে মেয়েকে বলেন, 'চল চল, ওঁরা তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

নিচে এসে ত্রিকূটনারায়ণকে প্রণাম করে কিরণ। ত্রিকূটনারায়ণ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে একটি হাত তুলে বলেন, 'জিতা রহো বেটা—'

বয়স্কদের কাউকে প্রণাম করলে, উপস্থিত অন্য সবাইকে ঐভাবে সম্মান জানানো মিশ্র বংশের একটি চালু নিয়ম। কাজেই মুকুটনাথ, রেবতী থেকে শুরু ক'রে দূরে শিউশঙ্করের নতুন মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ পর্যন্ত সকলেরই পায়ের কাছে মাথা নোয়াতে হয় কিরণকে। এই পর্বটি চুকে যাবার পর একটি ফীটনে ওঠেন মুকুটনাথ ত্রিকূটনারায়ণ কিরণ এবং হরীশ। অন্যটিতে রাজেশ আর খুবলাল। কোচোয়ানরা আগে থেকেই ওপরে উঠে বসেছিল। কিরণরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফীটন হাঁকিয়ে দেয়।

পাহাড়ের নিচে গোলগোলি এবং বইহারি তালুকের গায়ে একটানা ফসলের জমিগুলোর কাছে এসে গাড়ি থামাতে বলেন মুকুটনাথ।

এদিকে পাক্কী বা পাকা সড়ক নেই। কাঁচা রাস্তা যেটা আছে সেটা বেশ সমতল। ফীটন চলতে অসুবিধা হয় না।

এখনও ন'টা বাজেনি, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ বেশ গনগনে হয়ে উঠেছে। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সামনের টানা পাহাড়, এবং বাকি তিন দিকের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র যেন ঝলসে যাচ্ছে। মাথার ওপর কচিৎ দু-একটা পাখি চোখে পড়ে।

ডান ধারে খেতগুলোর গায়ে ক'টা হতচ্ছাড়া চেহারার গাঁ। টালি বা ফুটো-ফাটা টিনের চাল এবং বাঁশ কিংবা মাটির দেওয়ালের অগুনতি ভাঙাচোরা ঘর চারিদিকে এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে। এই সব গাঁয়ে পুরুষানুক্রমে যারা বাস করে আসছে তারা হ'ল দোসাদ গঞ্জু গাঙ্গোতা চামার আর ধাঙড় অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুতেরা।

অচ্ছুতদের গাঁ-গুলোর পাশ দিয়ে লম্বা একটা খাল বহু দূর চলে গেছে। খালটার ওপর পর পর অনেকগুলো বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা বসে আছে।

ফীটন থেকে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন মুকুটনাথ। দরজা খুলে দিয়ে ত্রিকূট-নারায়ণদের নামতে বললেন। তারপর চারপাশে ফসলের জমিগুলো দেখে চমকে ওঠেন।

অনেক দিন বাদে আজই প্রথম এদিকে এসেছেন মুকুটনাথ। আজ যে শস্য-ক্ষেত্রগুলি তিনি দেখছেন কয়েক বছর আগে সেগুলি ছিল কর্কশ পাথুরে ডাঙা। এখানে আগাছা আর কিছু মরকুটে কাঁটাগাছ ছাড়া অন্য কিছু জন্মাত না। কিন্তু এখন জমিগুলোর চেহারা দেখেই বোঝা যায়, এগুলো উৎকৃষ্ট ফসলের খেত। এবছর যে প্রচুর ফলন হয়েছে তা ধান কেটে নেবার পর গাছের গোড়াগুলোর দিকে তাকিয়েই টের পাওয়া যাচ্ছে।

বেশ কয়েক বছর আগে উত্তর বিহারের এই অঞ্চলে ভূদান যজ্ঞের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। স্বয়ং বিনোবা ভাবে এখানে আসায় বড়ো বড়ো জমিমালিকদের হৃদয়ের এমনই পরিবর্তন ঘটে যায় যে তারা ভূমিহীন অচ্ছুতদের নামে জমি দানপত্র করে লিখে দেয়। সেই ফেরে পড়ে মুকুটনাথও গোলগোলি আর বইহারি তালুকের পাথুরে পড়তি ডাঙাগুলো অচ্ছুতদের বিলিয়ে দেন। যে জমিতে কোনোদিন দশ

গ্রাম ধান গেঁহু জন্মাবে না তা দিতে অসুবিধা কোথায়? কী জমি দেওয়া হ'ল তা ত আর বিনোবার পক্ষে মাঠে মাঠে ঘুরে পরখ করা সম্ভব না।

অকেজো বাজে জমিও দেওয়া হ'ল, সেই বাবদে দানবীর বলে যথেষ্ট সুনামও জুটে গেল। এই চালটি দিতে পেরে এতকাল বেশ একটা আত্মগরিমাই অনুভব করে এসেছেন মুকুটনাথ। কিন্তু এই মুহূর্তে ফসলের মাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। এমন বেকুব জীবনে আর কখনও তাঁকে বনতে হয়নি। কে জানতো, মাঝখানের ক'টা বছরে পাথুরে জমিগুলোকে অচ্ছুতেরা এমন চমৎকার শস্যক্ষেত্র বানিয়ে ফেলবে! আগে থেকে জানা থাকলে কে এতটা জমি দানপত্র করে লিখে দিত! অবশ্য গায়ের জোরে তিনি জমিগুলো কেড়েকুড়ে নিতে পারেন। সে জন্য কয়েকটি বিশেষ জায়গায় মোটা টাকার ঘুষ চড়াতে হবে।

পরক্ষণেই মুকুটনাথ ভাবেন, অকারণে এ সব দুশ্চিন্তার মানে হয় না। তার মনে পড়ে যায়, বিনোবাজির সামনে মামুলি চোতা কাগজে হিজিবিজি সই ক'রে জমিগুলো অচ্ছুতদের নামে দানপত্র ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। আদালতে ওগুলোর দাম ফুটো কড়িও না। আসল দলিলগুলো মুকুটনাথের হেফাজতেই রয়েছে। ইচ্ছা করলে যে কোনোদিন তিনি ফসলের এই মাঠগুলির দখল নিতে পারেন। কিন্তু মেয়েকে যখন যৌতুকই দেবেন ঠিক করেছেন, ঐ সব হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। শুধু নামকাওয়াস্তে দানপত্রের কথাটা ত্রিকূটনারায়ণকে একবার জানিয়ে দিলেই হবে। দুবেরাও জানে, কিভাবে জমি নিজেদের দখলে রাখতে হয়।

দুই ফীটন থেকে বাকি সবাই নেমে পড়েছিল। মুকুটনাথ তাদের, বিশেষ ক'রে ত্রিকূটনারায়ণকে বলেন, 'চলুন ত্রিকূটজি, একটু কষ্ট ক'রে হেঁটে জমি দেখে নিন।'

ভকিল খুবলাল সহায় বুদ্ধি ক'রে গোটা কয়েক ছাতা নিয়ে এসেছিল। প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে ধরিয়ে দেয় সে। রোদের তেজ থেকে মাথা বাঁচানো যাবে, এতে সবাই খুশিই হয় এবং খুবলালের দূরদৃষ্টির তারিফ করে।

তীব্র রোদে হেঁটে হেঁটে জমি দেখতে আপত্তি করেন না ত্রিকূটনারায়ণ। কেননা আগে যৌতুকের কথায় যতই নিরাসক্ত থাকতে চেষ্টা করুন, এই মুহূর্তে উৎকৃষ্ট ফসলের খেতগুলো দেখতে দেখতে লোভে তাঁর চোখ চকচক করতে থাকে।

ফীটন দুটো পেছনে ফেলে সবাই কাঁচা রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে যায়। একেবারে সামনে রয়েছেন ত্রিকূটনারায়ণ এবং মুকুটনাথ। তাঁদের ঠিক পেছনে কিরণ। তারপর হরীশ আর রাজেশ। সবার শেষে খুবলাল। কোচোয়ানরা আসেনি, তারা ঘোড়া এবং গাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে কাঁচা সড়কের দু' ধারের খেতগুলো দেখিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'এখানে লগভগ এক শ' বিঘা জমিন রয়েছে ত্রিকূটজি। বহুত ফাইন ল্যাণ্ড।'

ত্রিকূটনারায়ণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন, 'হাঁ।'

'এই জমিনের পুরাটাই কিরণের শাদিতে যৌতুক দেবো। পাহাড়ের ওধারের সব ল্যাণ্ড আপনার, এধারে শ'ও বিঘা জমিন পেলে একটানা অনেকটা জমিন আপনার হয়ে যাবে।'

ত্রিকূটনারায়ণ সামান্য হাসেন, উত্তর দেন না।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'ধান গেঁহু ইখ—এ জমিতে যা লাগাবেন তাই ফলবে।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ত্রিকূটনারায়ণ বলে ওঠেন, 'লেকেন—'

'কী?'

'আমি অনেকদিন আগে একটা কথা শুনেছিলাম।'

'কী কথা?'

কুণ্ঠিত মুখে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ভূদান যজ্ঞের সময় আপনি নাকি বিনোবাজিকে সাক্ষী রেখে এই জমিগুলো অচ্ছুতদের দানপত্র করে দিয়েছেন। আমার ভুল হ'লে ক্ষমা করবেন।'

মুকুটনাথ বলেন, 'না না, ভুল কিসের। আমিও এই ব্যাপারটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম।' এরপর ভূদান যজ্ঞের হুজুগে কিভাবে জমিগুলো অচ্ছুতদের দান করেছিলেন, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ও, এই ব্যাপার। ঠিক আছে, জমিগুলো কিরণের নামে লিখে দেবার পর অচ্ছুতরা যদি কিছু ঝামেলা করে, আমি সামলাব। চিন্তা মাত কীজিয়ে মুকুটনাথজি।'

ঠিক এটাই আন্দাজ করেছিলেন মুকুটনাথ। বিবেকের দিক থেকে তিনি এখন একেবারে মুক্ত। সব স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছেন এবং ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর পুত্রবধূর জমি দখলে রাখার ব্যবস্থা করবেন বলেও জানালেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর মুকুটনাথ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'আমার একটা আর্জি ছিল ত্রিকূটজি—'

ব্যস্তভাবে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আর্জি আবার কী, হুকুম করুন—'

একটু চিন্তা ক'রে মুকুটনাথ এভাবে শুরু করেন, 'এই জমিন যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর আমার ছোটখাটো একটা তালুক রয়েছে। আমার অনেক দিনের

ইচ্ছা, ওখানে একটা লোহার কারখানা বসাব। আপনি পরের চুনাওতে জরুর জিতবেন। তখন আমাকে লাইসেন্সের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।'

পেছনে আসতে আসতে মজাও লাগে কিরণের। তার বিয়েটাকে ঘিরে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ নিজের নিজের সাধ মিটিয়ে নিতে চাইছেন। মুকুট-নাথের অনেক দিনের ইচ্ছা, শুধু ল্যাণ্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট হয়ে থাকবেন না, তাঁকে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হ'তে হবে। কিন্তু এতকাল পাশে দাঁড়িয়ে মদত দেবার মতো কেউ ছিল না। দুবেদের ঘরে মেয়েকে পুতহু ক'রে পাঠাতে পারলে এবার ইচ্ছাপূরণটা হ'য়ে যাবে বলেই তাঁর ধারণা। দু' পক্ষই এই বিয়ে থেকে কতটা লাভ তুলে নিতে পারে, তারই এক সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলছে যেন। মনে মনে হেসেই ফেলে কিরণ।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'জরুর। আমি চুনাওতে জিততে পারলে একটা কেন, আপনি দশটা কারখানা বসাবেন।'

আশায় এবং খুশিতে চোখমুখ ঝকমক করতে থাকে মুকুটনাথের। বিগলিত ভঙ্গিতে বলেন, 'বহুত ধন্যবাদ ত্রিকূটজি—'

এধারে তৃতীয় লাইন থেকে কখন যে হরীশ পাশে চলে এসেছে, কিরণ টের পায়নি। আচমকা চাপা গলার ডাক শুনে সে চমকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকায়।

হরীশ হেসে হেসে গাঢ় গলায় ফিস ফিস করে, 'জানো ত ক'দিনের মধ্যে আমাদের শাদি ?'

তারিখটা এখনও ঠিক না হ'লেও খুব তাড়াতাড়িই যে শুভকাজ চুকিয়ে ফেলতে চান মুকুটনাথেরা, কিরণ তা জানে। হঠাৎ অসহ্য রাগে মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে চায় সে। হরীশের গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। পরক্ষণেই কিন্তু মাথা থেকে রাগটা নেমে যায়। হরীশ কেমন ক'রে জানবে দিল্লিতে গিয়ে সে কী ক'রে বসে আছে।

ত্রিকূটনারায়ণ দুবের এই ছেলেটা বোকাসোকা গোছের ভালোমানুষ। সেই কবে থেকে সরল বিশ্বাসে সে তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। হরীশের জন্য নতুন ক'রে আরেক বার করুণাই হয় তার। ছোকরার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে শুধু।

হরীশ আরো একটু ঘন হয়ে আসে। বলে, 'তোমাকে ছাড়া আমার সময় আর কাটতে চাইছে না।'

মজার গলায় কিরণ বলে, 'আমারও—'

কথায় কথায় তারা কখন যে পশ্চিম দিকের দেহাতী গ্রামগুলোর কাছে চলে এসেছে, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কিরণদের চোখে পড়ে কয়েক শ' মানুষ চার-পাশের গাঁগুলো থেকে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে আসছে।

দশ

মুকুটনাথ মানুষগুলোকে ছুটে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য সবাইও থেমে যায়।

ত্রিকূটনারায়ণ পাশ থেকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কারা ?'

মুকুটনাথ জানান, ওরা জল-অচল অচ্ছুত। পুরুষানুক্রমে শর্মাদের অর্থাৎ তাঁদের প্রজা। আবহমান কাল ধরে এই লোকগুলো তাঁদের জমি চষে আসছে। কিরণের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে এই অঞ্চলের এক শ' বিঘে খেত লিখে দেবার পর এই সব দোসাদ গঞ্জু এবং গাঙ্গোতারা ত্রিকূটনারায়ণদের প্রজা বনে যাবে। যেভাবে শর্মা বংশের জমি এতকাল তারা চষে এসেছে, অবিকল সেইভাবেই দুবেদের জমিতেও তারা লাঙল চালাবে, ধান কি গেঁহু বুনবে, ফসল কাটবে। ওপর দিকের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারটা নিয়ে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না। সব কিছু যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকবে।

মুকুটনাথ বলেন, 'জমিনগুলোর চেহারা বিলকুল বদলে দিয়েছে অচ্ছুতেরা।'

'হাঁ। আমারও মনে আছে, আগে যখন এদিকে এসেছি, জমিগুলো পড়তিই ছিল। অচ্ছুতগুলোকে তারিফ করতে হয়, খেটেখুটে খুন আর পাসিনা ঝরিয়ে মা লছমীর কৃপা আদায় করে ছেড়েছে।'

'ঠিক বলেছেন।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে মুকুটনাথ এবার বলেন, 'একটা কথা আপনার জেনে রাখা দরকার ত্রিকূটজি।'

'কী ?' উৎসুক চোখে তাকান ত্রিকূটনারায়ণ।

'অচ্ছুতদের নামে দানপত্র বিনোবাজির সামনে লিখে দিয়েছি। তেমনি পরে অচ্ছুতদের দিয়ে কবজাপত্রও লিখে রেখেছি। সেগুলো এমনভাবে খুবলাল ভকিল বানিয়ে দিয়েছে, যাতে দেনার দায়ে যে কোনো সময় ওদের জমি কেড়ে নিতে পারি।'

ত্রিকূটনারায়ণ বেজায় খুশি হয়ে যান। হাত তুলে নাড়তে নাড়তে বলেন, 'ব্যস ব্যস, আপনার মেয়েকে করজাপত্রগুলো শুধু দিয়ে দেবেন। তারপর বাকিটা আমি দেখব। আমার মনে হয়, আর কোনো ঝামেলা হবে না।'

'জরুর জরুর। তবে একটা কথা ত্রিকূটজি—'

'বলুন—'

'চুনাওয়ের আগে অচ্ছুতরা যেন জমির ব্যাপারটা জানতে না পারে। তা হ'লে ঝঞ্ঝাট হবে।'

'আমি কি অতই ব্লাডি ইডিয়ট শর্মাজি! নিজের ইণ্টারেস্ট বরবাদ ক'রে কিছুই করব না।'

এদিকে অচ্ছুতরা মাঠের ওপর দিয়ে কাছাকাছি এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় শ' দেড়েক মানুষের একটা জনতা। সবার সামনে রয়েছে ভৈরো দোসাদ। ভৈরোর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। চুল যদিও সবটাই সাদা হ'য়ে গেছে, তবু এই বয়সেও তার পেটানো মজবুত স্বাস্থ্য। গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। পোড়া ঝামার মতো গায়ের রং। চারকোণা চোয়াল, থ্যাবড়া নাক, মোটা মোটা আঙুলের মাথায় ভাঙা নখ। ছোট চোখদুটোতে শিশুর সারল্য। পরনে খাটো লালচে ধুতির ওপর সবুজ জামা। পা দুটো খালি।

মাঝারি মাপের এই লোকটার মধ্যে যে অসীম শক্তি জমা হ'য়ে আছে, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের অচ্ছুতটোলিগুলোতে যে 'পঞ্চ' রয়েছে, ভৈরো তার মাথা। সে একটি আঙুল তুললে এখানকার কয়েক হাজার দোসাদ গঞ্জু এবং গাঙ্গোতা আগুনে ঝাঁপ পর্যন্ত দিতে পারে।

ভৈরো মাথা ঝুঁকিয়ে মুকুটনাথকে বলে, 'দেওতা আপ!' অর্থাৎ যে মুকুটনাথকে দু' তিন চার বছরে একবারও এদিকে দেখা যায়নি, হঠাৎ কেন তিনি আজ এলেন, এতে খুবই অবাক হয়ে গেছে সে এবং তার সঙ্গী অন্যান্য অচ্ছুতেরাও।

মুকুটনাথ হেসে হেসে বলেন, 'কেন রে, আসতে নেই?'

সসঙ্কোচে জিভ কেটে ব্যস্তভাবে ভৈরো বলে, 'এ আপনি কী বলছেন দেওতা!'

'তোদের অনেক দিন দেখিনি ত, তাই চলে এলাম।'

'হুজৌর, কষ্ট ক'রে এই ধুপের ভেতর এতদূর এলেন। হুকুম করলে আমরাই চলে যেতাম।'

মুকুটনাথ সস্নেহে হাসেন, 'তোদের যাওয়াও যা, আমাদের আসাও তাই। বল কেমন আছিস?'

'আপনার কিরপাসে ভালই আছি হুজৌর।' কথা বলছে ঠিকই ভৈরো, কিন্তু বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছে ত্রিকূটনারায়ণ কিরণ হরীশ এবং রাজেশের দিকে। হঠাৎ এতগুলো বিশিষ্ট বড়ে আদমী এমন চড়া রোদ মাথায় নিয়ে কেন এখানে হানা দিয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে না।

'শুনলাম তোদের জমিতে এবার প্রথম ধান হয়েছে।'

'হাঁ হুজৌর?'

'কেমন ধান ফলল?'

'আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আপহিকা কিরপা।'

মুকুটনাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিকূটনারায়ণ। একটু দূরে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে চারিদিকের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, অচ্ছুতটোলার লোকজন, মাঠের পেছনে পাহাড়, ঝকঝকে আকাশ দেখছিল কিরণ। মুকুটনাথের সঙ্গে ত্রিকূটনারায়ণ বা ভৈরোর কথাবার্তা আবছাভাবে তার কানে আসছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে ঔৎসুক্য না থাকায় তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না।

কিরণের শরীর থেকে তিন সেন্টিমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘেনে মাছির মতো গাঢ় চাপা গলায় এক নাগাড়ে কিছু বলে যাচ্ছে হরীশ। ঘি-মাখন খাওয়া চর্বির এই ঢিবিটা কী জানাতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না কিরণের। কিন্তু সে ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া আদৌ প্রয়োজন বোধ করে না কিরণ।

দলছুট হ'য়ে বেশ খানিকটা দূরে ফাঁকা মাঠে একা একা ঘোরাঘুরি করছে রাজেশ। ত্রিকূটনারায়ণ আর মুকুটনাথ বা কিরণ আর হরীশ, কোনো দলেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না।

হঠাৎ ত্রিকূটনারায়ণের কথা মনে পড়ে যায় মুকুটনাথের। ভৈরোকে বলেন, 'তোদের সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।'

তাদের মতো গরীবের চাইতেও গরীব, দুনিয়ার সব চেয়ে ওঁচা মানুষদের সঙ্গে ঈশ্বরের মতো মহিমময় মুকুটনাথ মিশ্রর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, ভৈরো ভেবে পায় না। আর কিনা স্বয়ং তিনি সেই কথাটি বলার জন্য এতদূরে ছুটে এসেছেন! ভৈরো এবং তার সঙ্গীরা একেবারে হকচকিয়ে যায়। ভৈরো বিভ্রান্তের মতো বলে, 'জি--'

ত্রিকূটনারায়ণকে দেখিয়ে মুকুটনাথ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'এঁকে চিনিস?'

ভৈরো মাথাটি প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে বলে, 'চিনব না! উনি কামতিগঞ্জের বড়ে সরকার।'

'চিনিস তা হ'লে।' মুকুটনাথ হাসেন, 'জরুরি কথাটা ওঁর ব্যাপারে।'

ভৈরো বলে, 'হুজৌর, এতদূর এসেছেন। আউর থোড়া কিরপা করে যদি আমাদের গাঁও-এ আসেন—মতলব, এই ধুপে এত তকলিফ হচ্ছে আপনাদের।'

মুকুটনাথ বলেন, 'দুফার হ'য়ে এল। আজ গেলে আরো দেরি হ'য়ে যাবে। আরেক দিন সুবেহ্ সুবেহ্ এসে তোদের গাঁওয়ে চলে যাব।' একটু থেমে আবার বলেন, 'এখানেই ত্রিকূটজি সম্পর্কে কথাটা বলে যাই।'

মুকুটনাথ যখন বলেছেন আজ তাদের গ্রামে যাবেন না, তখন আর দ্বিতীয় বার তাঁকে অনুরোধ করতে সাহস হয় না ভৈরোর। সে বিনীত ভঙ্গিতে শুধু বলে, 'জি দেওতা—'

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'তোরা ত জানিস, পাঁচ সাল পর পর ত্রিকূটজি চুনাওতে দাঁড়ান।'

'জি—'

'লেকেন আগে তোরা ওঁকে ভোট দিসনি, তাই ত্রিকূটজি জিততে পারেননি।' বলে মুকুটনাথ অল্প হাসেন।

ভৈরো জানায়, তারা আগের আগের চুনাওতে ভোট দেয়নি ঠিকই, তবে সাড়ে চার বছর আগে যে চুনাওটা হয়ে গেছে তাতে কিন্তু ভোটটা ত্রিকূট-নারায়ণকে দিয়েছে। এবং তার জোরে জিতেও গেছেন তিনি।

মুকুটনাথ হেসে হেসে বলেন, 'সবাই দিসনি। দিলে ত্রিকূটজি ভাল ক'রে জিততেন।'

আসলে মুকুটনাথ তেমনভাবে গত নির্বাচনে ত্রিকূটনারায়ণের হয়ে প্রচারে নামেননি। ভাসা ভাসা ভাবে ভৈরোদের ভোট দিতে বলেছিলেন শুধু। কিরণের সঙ্গে হরীশের বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাতে কিছু সুতো রেখে দিয়েছিলেন, পুরোটা ছেড়ে দেননি।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'তোরা কি শুনেছিস, ত্রিকূটজির ছেলের সঙ্গে অনেক-দিন আগেই আমার মেয়ের শাদি ঠিক হয়ে আছে?'

'জি, নায়—' আস্তে মাথা নাড়ে ভৈরো।

মুকুটনাথ বলেন, 'তা জানবি কী করে, আমি ত আর আগে তোদের জানাই নি। খুব শিগগিরই শাদিটা হয়ে যাবে। এই শাদিতে তোদেরও নেমন্তন্ন হবে।' বলে আঙুল বাড়িয়ে খানিকটা দূরে কিরণ এবং হরীশকে দেখিয়ে দেন, 'ঐ যে আমার মেয়ে আর ত্রিকূটজির ছেলে—'

শুধু ভৈরোই না, চারপাশের বিশাল অচ্ছুত জনতা অসীম কৌতূহলে কিরণদের দেখতে থাকে। তাদের ঝলমলে মুখচোখ দেখে মনে হয় বিয়ের খবরে খুবই খুশি হয়েছে, যদিও মুকুটনাথরা বংশ পরম্পরায় তাদের রক্ত শোষণ ক'রে আসছে। ভৈরো উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, 'বহোৎ বড়িয়া বাত।'

মুকুটনাথ বলেন, 'তা হ'লে বুঝতে পারছিস, ত্রিকূটজি আমার রিস্তেদার হ'তে যাচ্ছেন।'

'হাঁ হাঁ, সমধী।'

'আমার রিস্তেদার তোদেরও তো আপনা আদমী—তাই না?'

'জরুর হুজৌর—'

একটু ভেবে কিছুক্ষণ পর মুকুটনাথ এবার বলেন, 'জানিস ত আবার চুনাও আসছে?'

চোখ ছোট ক'রে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ভৈরো, 'শুনা হ্যায়, লগভগ ছে-সাত মাহিনা পর চুনাও হবে।'

'ঠিকই শুনেছিস। এবারও ত্রিকূটজি চুনাওতে নামছেন।'

ভৈরো উত্তর দেয় না। নির্বাচন এবং ত্রিকূটনারায়ণের ব্যাপারে মুকুটনাথ আরো কী বলতে চান, শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মুকুটনাথ বলেন, 'এখানে যত গাঁও আর গাঁওবালা আছে তাদের বলে রাখবি আমার সমধীকে যেন সবাই ভোট দেয়।'

'জি—' বশংবদ ভঙ্গিতে মাথা হেলায় ভৈরো।

'একটা ভোটও যেন এদিক ওদিক না হয়।'

'জি—'

'কথাটা মনে থাকবে?'

'থাকবে হুজৌর।'

'আজ আমরা যাই। পরে ত্রিকূটজিকে সঙ্গে নিয়ে তোদের গাঁওয়ে যাব। তুই নিজে ত্রিকূটজির সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিবি।'

ফেরার জন্য মুকুটনাথরা যখন পা বাড়াতে যাবেন সেইসময় দূর থেকে মেয়েমানুষের গলা ভেসে আসে, 'কঁহা হ্যায় মেরে হুজৌর, কঁহা হ্যায়?'

মুকুটনাথের আর যাওয়া হয় না। ভিড় ঠেলে ছুটতে ছুটতে একটি মেয়েমানুষ একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। আঁটোসাটো গড়ন, উদ্দাম স্বাস্থ্য।

মেয়েমানুষটির গায়ের রং মোটামুটি ফর্সাই। ভাসা ভাসা বড়ো চোখ তার, লম্বাটে মুখ, সাদা সুগঠিত দাঁত। পিঠময় ছড়ানো কোঁচকানো চুলের প্রায় সবটাই কুচকুচে কালো, ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ দু-চারটে রুপোর তার। গায়ের চামড়া এখনও টান টান। সরু কোমর তার, নিচের দিকটা বিশাল।

পরনে খাটো রঙিন শাড়ি আর লাল টকটকে জামা। দুই ভুরুর মাঝখানে সাপ-আঁকা উলকি। হাতে মোটা মোটা চাঁদির কাংনা, নাকে ঝুটো সবুজ পাথর বসানো নাকফুল, কানে বড়ো বড়ো চাকার মতো দুল, গলায় চাঁদিরই হার।

যৌবন অনেক আগেই চলে যাবার কথা কিন্তু এখনও তার গনগনে আঁচ অনেকটাই থেকে গেছে। তার শরীর জুড়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো এই বয়সেও প্রচুর চটক।

মেয়েমানুষটা মুকুটনাথের পায়ের কাছে প্রায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে প্রণাম করে। তবে পা ছোঁয় না, কেননা জল-অচল অচ্ছুতের স্পর্শে পবিত্র ব্রাহ্মণের দেহমন অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সজ্ঞানে তা হ'তে দিতে পারে না মেয়েমানুষটা। প্রণামের পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে।

মুকুটনাথ মেয়েমানুষটাকে দেখে ভেতরে ভেতরে অনেকখানি কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। কেননা তাঁর যৌবনে সে ছিল মুকুটনাথের রাখনি বা রক্ষিতা। রাতের অন্ধকারে ধরমপুরায় শর্মাদের এক পুরনো বাড়িতে রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসত মেয়েমানুষটা। তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করতেন মুকুটনাথ। ঘণ্টা তিন চারেক একসঙ্গে কাটিয়ে মিশ্র নিকেত-এ চলে যেতেন মুকুটনাথ, আর মেয়েমানুষটি চলে যেত অচ্ছুতটোলিতে।

অচ্ছুতদের ছুঁলে শুধু ব্রাহ্মণের চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হতে পারে, কিন্তু তাদের ঘরের সুন্দরী যুবতী মেয়েরা এ অঞ্চলে চিরকালই শর্মা বংশের ভোগের বস্তু। সেখানে ছুঁয়াছুতের দোষ অর্সায় না।

মুকুটনাথের ধারণা, তাঁদের পুরনো বাড়ির এক অতি প্রাচীন নৌকর ছাড়া আর কেউ এই গূঢ় খবর জানে না। নৌকরটা অতীব বিশ্বাসী, গলা কেটে ফেললেও তার মুখ দিয়ে এ ব্যাপারে টু শব্দটি বেরুবে না।

মুকুটনাথের ধারণা যাই হোক, ধরমপুরার বিশ হাজার মানুষের চল্লিশ হাজার চোখ রয়েছে। শর্মাদের পুরনো বাড়িতে মুকুটনাথ এবং ঐ মেয়েমানুষটা রাত্তিরে বেশ খানিকটা সময় যে কাটিয়ে যেত তা তাদের অনেকেরই চোখে পড়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত শর্মা বংশের কেচ্ছা একসময় সবাই জানতো,

আবার কেউ জানতো না। এই ঘটনাটি ধরমপুরার মানুষজনের কাছে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ব্যাপার।

এই মেয়েমানুষটি সম্পর্কে মুকুটনাথের মোহভঙ্গ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। দশ বছর তার সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ নেই বললেই চলে। আজকাল কচিৎ কখনও দু'জনের দেখা হয়।

মুকুটনাথ জানেন, ইদানীং মেয়েমানুষটি এ অঞ্চলে দাই-এর কাজ করে। ছেলেপুলে জন্মাবার সময় তার ডাক পড়ে। তা ছাড়া মুকুটনাথ খবর পেয়েছেন, মেয়েমানুষটির একটা গোপন ব্যবসাও রয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে অবাঞ্ছিত অবৈধ বাচ্চা নষ্ট ক'রে থাকে সে। এই ব্যবসাতে তার প্রচণ্ড রমরমা।

মুকুটনাথ নিচু গলায় বলেন, 'কেমন আছিস ভামরী?' বলে চোখের কোণ দিয়ে চারপাশের লোকজনকে লক্ষ করতে থাকেন।

'আপনার কিরপায় দিন কেটে যাচ্ছে।' মেয়েমানুষটা অর্থাৎ ভামরী এভাবে উত্তর দেয়।

খানিকটা দূরে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল কিরণ। ভামরীর নাম কানে আসতেই চমকে তার দিকে তাকায়। যদিও 'মিশ্র নিকেত' একটি ছোটখাট দুর্গবিশেষ, তবু তার দেওয়াল ভেদ ক'রে মুকুটনাথ এবং ভামরীকে জড়িয়ে কিছু কেচ্ছা সেখানেও ঢুকে গিয়েছিল। ভামরীকে আগে কখনও দেখেনি সে। বেশ আগ্রহ নিয়েই এখন কিরণ তাকে লক্ষ করতে থাকে।

ভামরী হাতজোড় ক'রে বলে, 'হুজৌর, আমার ঘরে চলুন। আপনার পায়ের ধুলো পড়লে ঘরটা স্বরগ বনে যাবে।'

ভৈরো মুকুটনাথকে তাদের গাঁয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু ঘরে যেতে বলার সাহস নেই। ভামরীর এ কথা বলার জোরটা যে কোথায়, ভৈরো কেন, অচ্ছুত-টোলার বয়স্ক পুরুষ এবং মেয়েরা সবাই জানে। তবে মুখ ফুটে এ বিষয়ে কিছু বলার দুঃসাহস বা স্পর্ধা কোনোটাই তাদের নেই।

মুকুটনাথ অনিশ্চিতভাবে বলেন, 'আসব একদিন তোদের গাঁওয়ে। তখন তোর ওখানেও যাব।' বলে ব্যস্তভাবে ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, 'চলুন ত্রিকূটজি, চল হরীশ, রাজেশ। ইস, অনেক বেলা হয়ে গেল।'

সবাই দূরে ফীটনগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

এগারো

গোলগোলি এবং বইহারি মৌজা দেখার পর ফেরার সময় ত্রিকূটনারায়ণ হাতজোড় ক'রে বলেন, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলি—'

পালটা হাতজোড় ক'রে মুকুটনাথ শশব্যস্তে বলেন, 'অপরাধ নেব আমি! যা ইচ্ছা হয় বলুন।'

'হঠাৎ মনে পড়ল, বাড়িতে জরুরি একটা কাজ আছে। দুপুরে আপনার কোঠিতে খেতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভাবীজিকে বলবেন, আমি আরেক দিন গিয়ে খেয়ে আসব। উনি যেন আমাদের ক্ষমা ক'রে দেন।'

মুকুটনাথকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। তিনি বলেন, 'আমরা বহুত আশা করেছিলাম, একসাথে বসে আনন্দ ক'রে খাব। ভাগ্যটাই খারাপ দেখছি।'

মুকুটনাথের দু'হাত ধরে কাঁচুমাচু মুখে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনার না, ভাগ্যটা আমারই খারাপ। দু'টো দিন, ওনলি টু ডেজ। তারপর আমি হরীশ আর রাজেশকে সঙ্গে ক'রে এসে ভাবীজির রান্না খেয়ে যাব।'

মুকুটনাথ হতাশ ভঙ্গিতে বলেন, 'ঠিক আছে। কৃপা ক'রে আসবেন কিন্তু। এবার মেহমানদারির চান্সটা যেন পাই।'

ত্রিকূটনারায়ণ হেসে ফেলেন। হালকা গলায় বলেন, 'পাবেন পাবেন। চিন্তা মাত কিজিয়ে—' একটু থেমে ফের বলেন, 'আরেকটা মেহেরবানি যে করতে হবে মুকুটনাথজি—'

মুকুটনাথ বলেন, 'মেহেরবানি বলে লজ্জা দেবেন না, হুকুম করুন।'

ত্রিকূটনারায়ণ জানান, তাঁরা মুকুটনাথের ফীটন নিয়ে আপাতত কামতিগঞ্জে ফিরে যেতে চান। বাড়ি পৌঁছে ফীটনটা ফেরত পাঠানো হবে। মুকুটনাথ ধরমপুরায় নিজের বাড়ি ফিরে গিয়ে যেন ত্রিকূটনারায়ণের ড্রাইভারকে মোটর নিয়ে কামতিগঞ্জে চলে যেতে বলেন।

এরপর দু'টো ফীটন দু'দিকে চলে যায়। এক ফীটনে ত্রিকূটনারায়ণ, হরীশ এবং রাজেশ। অন্য ফীটনটায় মুকুটনাথ কিরণ আর খুবলাল।

'মিশ্র নিকেত'-এর কাছে যখন কিরণদের ফীটন এসে পৌঁছয়, সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদে এখন ছুরির ধার। গরম হাওয়া গনগনে ভাপ ছড়াতে ছড়াতে ধরমপুরা টাউনের ওপর দিয়ে উলটোপালটা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

ফীটনটা দেখে দারোয়ান ধাতব শব্দ ক'রে লোহার গেট খুলে দেয়।

কোচোয়ান ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ফীটনটা এনে থামাতেই মুকুটনাথ এবং

কিরণ নেমে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মাঝবয়সী নৌকর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসে। কিন্তু কিছু বলার আগেই নতুন শিবমন্দিরের বারান্দা থেকে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ তাকে থামিয়ে দেয়, 'তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমি বলছি।'

মুকুটনাথ শিবমন্দিরের দিকে তাকান। বারান্দায় শুধু বশিষ্ঠনারায়ণই নেই, রেবতীও রয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

মুকুটনাথের স্নায়ু খুবই সজাগ। মুহূর্তে তিনি টের পান, গোটা 'মিশ্র নিকেত'-এর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। ঘণ্টা তিনেক আগে তিনি যখন গোলগোলি এবং বারহৌলি মৌজায় গিয়েছিলেন, এ বাড়ির কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কী ঘটে যেতে পারে? কিছুটা উদ্বেগই বোধ করতে থাকেন তিনি।

আগে লক্ষ করেননি মুকুটনাথ, এবার তাঁর চোখে পড়ে নৌকর নৌকরানী দূরে দূরে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে চাপা নিচু গলায় কী যেন বলাবলি করছে। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে যেতে থাকে মুকুটনাথের।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবং রেবতী কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

মুকুটনাথ উৎসুক মুখে বলেন, 'কী?'

চারিদিক ভাল ক'রে দেখে নিয়ে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'এখানে না, ভেতরে চল।' রেবতীকে বলেন, 'তুমি কিরণকে ওপরে ওর ঘরে পেঁ'ছে দাও। ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে যাবে।'

ওপরে যাবার দুটো সিঁড়ি আছে এ বাড়িতে। রেবতী মাথা নেড়ে বলেন, 'জি।' কিরণের দিকে ফিরে বলেন, 'আয়।'

কিরণ খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিমূঢ়ের মতো সে রেবতীর সঙ্গে ডান ধারের সিঁড়ির দিকে যায়।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'এসো মুকুট—'

পা বাড়াতে গিয়ে ত্রিকূটনারায়ণের অনুরোধ মনে পড়ে যায় মুকুটনাথের। যে মোটরে ক'রে সকালে তিনি এসেছিলেন সেটা ফেরত পাঠাতে বলেছেন।

ত্রিকূটনারায়ণের ফোর্ড গাড়িটা এক কোণে পার্ক করা রয়েছে। মাঝবয়সী যে নৌকরটা তাকে কিছু বলার জন্য দৌড়ে এসেছিল সে এখনও দাঁড়িয়েই আছে। তাকে দিয়ে ত্রিকূটনারায়ণের ড্রাইভারকে ডাকিয়ে কামতিগঞ্জে ফিরে যেতে বলেন। তারপর বশিষ্ঠনারায়ণের সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান।

যেতে যেতে বশিষ্ঠনারায়ণ চাপা গলায় বলেন, 'বহুত মুসিবত মুকুট—'

'কী হয়েছে? মায়ের কি কিছু হ'ল?' একটু আগের সেই উদ্বেগটা বেড়ে যায় মুকুটনাথের।

'না না, মহেশ্বরী ঠিক আছে।'

'তা হ'লে?'

'ভেতরে গিয়ে সব বলব।'

মুকুটনাথ বুঝতে পারছিলেন, বশিষ্ঠনারায়ণ এই খোলা জায়গায় যেখানে নৌকর নৌকরানীরা থিক থিক করছে, কিছুই বলবেন না। যা জানাবার গোপনেই জানাবেন।

মুকুটনাথ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কোনো কারণেই তিনি অধীর হয়ে পড়েন না। তাঁর ধৈর্য অফুরন্ত। আর কোনো প্রশ্ন করেন না তিনি।

দু'জনে একটু পর একতলার বাঁ দিকে একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে সোফায় মুখোমুখি বসেন।

মুকুটনাথ স্থির চোখে বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে তাকান, 'এবার বলুন গুরুজি—'

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ওই ছোকরা এসেছে।'

'কার কথা বলছেন?'

'ঐ যে দিল্লিবালা, যার কথা কিরণের কলেজের বড়ে মাস্টারনী তোমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল।'

পলকে মুখচোখের চেহারা একেবারে পালটে যায় মুকুটনাথের। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হ'তে থাকে, শরীরের সব রক্ত গিয়ে জমা হয় দু'চোখে। কণ্ঠার কাছের রক্তবাহী শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁতে ঘষে মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি প্রভাকরের কথা বলেছেন ত?'

'হাঁ—' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন বশিষ্ঠনারায়ণ।

মুকুটনাথ বলেন, 'কখন এসেছে কুত্তাটা?'

'তোমরা ফীটন নিয়ে বেরিয়ে যাবার এক দেড় ঘণ্টা পর।'

'কোঠির ভেতর ঢুকতে দিল কে? দারবানেরা?'

'নেহী, আমিই দিয়েছি।'

মুকুটনাথ যত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিতই হ'ন না, কুলগুরুর সিদ্ধান্তের ওপর কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যা করেছেন তা মেনে নিতেই হবে। কোনো প্রশ্ন না ক'রে মুকুটনাথ তাকিয়ে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবার বলেন, 'ছোকরাকে দারবানেরা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। ও তখন কিরণের নাম ক'রে এমন চেল্লাচেল্লি শুরু ক'রে দেয় যে লোক জমে যাচ্ছিল। ঘরের কেচ্ছা বাইরে রটুক, সেটা ত ঠিক না মুকুটনাথ। তাই ওকে ভেতরে এনে বসিয়েছি।'

মুকুটনাথ সায় দিয়ে বলেন, 'ঠিক করেছেন। ছোকরা হঠাৎ এখানে এল কেন? আপনাকে কিছু বলেছে?'

'নেহী'। আমি জিজ্ঞেস করিনি। ভাবলাম, গোলগোলি মৌজা থেকে ফিরে এলে যা বলার তুমিই বলবে। আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে থাকব।'

কোনো কারণেই যে মুকুটনাথ মাথা গরম করেন না, এই মুহূর্তে অসহ্য ক্রোধে এবং উত্তেজনায় তাঁর রক্তচাপ ভয়ানক বেড়ে যায়। কণ্ঠার দু'পাশে শিরা দু'টো মোটা হ'য়ে ফুলে ওঠে। চোখ দু'টো এত লাল হ'য়ে উঠেছে যেন ফেটে গিয়ে এখনই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, 'ওর এত সাহস যে দিল্লি থেকে ধরমপুরা পর্যন্ত চলে এসেছে। শুয়ারকা বাচ্চার সঙ্গে একটা কথাও আমি বলব না, স্রিফ লাথ মারতে মারতে কোঠি থেকে বার ক'রে দেব। নৌকরদের বলব, গর্দানা পাকড়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

বশিষ্ঠনারায়ণ মুকুটনাথের হাত ধরে ফের বসিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো মুকুটনাথ। ছোকরা দিল্লির প্রফেসার, ধরমপুরার আনপড় ডরপোক আদমী না। যে এত দূর থেকে আসতে পারে তার পেছনে জরুর বড়ে বড়ে আদমী আছে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বোঝাতে চাইছেন, ধরমপুরার গরীব শিক্ষাদীক্ষাহীন ভীরু লোকজনের ওপর অবশ্যই দাপট খাটানো যায়, চোখ রাঙিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখাও যেতে পারে। তাদের গলা দিয়ে টু শব্দটি বেরুবে না। কিন্তু দিল্লির একজন উচ্চশিক্ষিত প্রফেসারের ওপর ঠিক ঐ পদ্ধতি চালানো যায় না। তা ছাড়া তার পেছনে প্রভাবশালী মুরুব্বির জোর থাকা অসম্ভব নয়। জবরদস্তি কিছু করতে গেলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। কোনরকম হৈচৈ না ক'রে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রভাকরকে ফেরত পাঠানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখা দরকার, সব জায়গায় জোরজুলুম খাটে না, কূটকৌশলও কাজে লাগাতে হয়।

বশিষ্ঠনারায়ণের কথাগুলো আদৌ অসার নয়, তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। মুকুটনাথের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কিছুটা জুড়িয়ে আসে। তিনি বলেন, 'আপনি যা বলছেন তা-ই হবে।'

'চল তা হ'লে—'

একতলায় মহেশ্বরীর কামরা বাদ দিলে তিন তিনটে বসবার ঘর রয়েছে। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটিতে প্রভাকরকে বসানো হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ সেখানে চলে আসেন।

ঝকঝকে চেহারার প্রভাকর একটা সোফায় চুপচাপ বসে ছিল। মাথার ওপর আস্তে আস্তে পুরনো মডেলের দুই ব্লেডের পাখা ঘুরে যাচ্ছে। মুকুটনাথদের দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'নমস্তে। আমি প্রভাকর।'

প্রতি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতটা সামান্য তুলে মুকুটনাথ বলেন, 'আমার নাম মুকুটনাথ মিশ্র।' বশিষ্ঠনারায়ণের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ইনি আমাদের কুলগুরু।'

'ওঁকে আগেই দেখেছি। পরিচয়টা জানতাম না।' প্রভাকর বলতে থাকে, 'আমি দিল্লি থেকে আসছি।'

'শুনেছি। বসুন। অত দূর থেকে যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই জরুরি কোনো ব্যাপার আছে।'

সবাই বসে পড়েছিল। সেণ্টার টেবিলের একধারে মুকুটনাথ এবং বশিষ্ঠনারায়ণ, তাঁদের মুখোমুখি প্রভাকর।

প্রভাকর বলে, 'হ্যাঁ। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।'

'বলুন'—মুকুটনাথ তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকান।

প্রভাকর হাতজোড় ক'রে বলে, 'আমার একটা অনুরোধ আছে। বয়েসে আপনাদের চেয়ে আমি অনেক ছোট। 'আপনি' ক'রে বলছেন, আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। যা বলতে এসেছ, বলে ফেল—'

'কিন্তু—' বলে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে তাকায় প্রভাকর।

তার মনোভাবটা বুঝতে পারেন মুকুটনাথ। বলেন, 'তুমি আমাকে যা বলবে, ওঁর কাছে তার একটা শব্দও গোপন থাকবে না। কোনো চিন্তা নেই। গুরুজির সামনে বললে তোমার ক্ষতি হবে না।'

প্রভাকর বলে, 'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন—'

প্রভাকরকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ওঠেন, 'কথাবার্তা পরে হবে। তুমি অতদূর থেকে এসেছ। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আগে চা খাও, তারপর কথা—'

কুলগুরুর সূক্ষ্ম চালটা ধরতে পারেন মুকুটনাথ। অর্থাৎ খাতিরদারি ক'রে মধুর ব্যবহারে, মিষ্টি কথায় প্রভাকরকে বিদায় করতে হবে। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তিনি বলে ওঠেন, 'নৌকরগুলোকে ঘাড় ধরে আমার কোঠি থেকে বার ক'রে দেবো। একটা লোক দিল্লি থেকে এসে টায়ার্ড হয়ে বসে আছে, তাকে চা-পানি দেবার কথা কারো খেয়াল নেই? যত ভূচ্চরের দল—' বলেই চিৎকার ক'রে একটা নৌকরকে ডাকেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘোলের উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই, গুলাবজামুন, প্যাঁড়া, কলাকন্দ, নিমকিন এবং সামোসা এসে হাজির হয়। মুকুটনাথ পরম সমাদরের ভঙ্গিতে বলেন, 'খাও—'

প্রভাকর আপত্তি না ক'রে ঠাণ্ডাই এবং দু'একটা মিঠাই খেয়ে বলে, 'এবার শুরু করতে পারি?'

'সার্টেনলি।'

কোনো ভণিতা না ক'রে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসে প্রভাকর, 'কিরণের কাছে আমার কথা হয়ত আপনি শুনে থাকবেন।'

মুকুটনাথ চোখের কোণ দিয়ে বশিষ্ঠনারায়ণকে এক পলক দেখে নেন। তারপর বলেন, 'কিরণ আমাকে বলেনি। তবে তোমার নাম অন্য জায়গা থেকে শুনেছি।'

'কোত্থেকে?'

'সেটা না জানলেই কি নয়?'

প্রভাকর বলে, 'জানতে পারলে ভাল হ'ত।'

মুকুটনাথ বলেন, 'বেশ, শুনে নাও। কিরণের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন।'

প্রভাকর হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে খুব সংযত ভঙ্গিতে বলে, 'প্রিন্সিপ্যাল আমার সম্বন্ধে কী লিখেছেন, জানতে চাই না। তবে আমার ধারণা—'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন মুকুটনাথ, কোনো প্রশ্ন করেন না।

প্রভাকর থামেনি। সে বলে যায়, 'ঐ চিঠিটা পাওয়ার পরই বোধ হয় কিরণকে আপনি লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

মুকুটনাথ বলেন, 'তোমার এ কথার আমি জবাব দেবো না। অন্য কথা থাকলে বল—'

প্রভাকর তক্ষুণি কিছু বলে না। কিছুক্ষণ ভেবে শুরু করে, 'কয়েকদিন আগে আমি কিরণের একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে সে কী লিখেছে আপনি কি জানেন?'

সমস্ত ঘরটায় নিরেট স্তব্ধতা নেমে আসে। কিরণকে ত দিনরাত একরকম কয়েদীদের মতো কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। আজ গোলগোলি মৌজায় যাওয়া ছাড়া এক পলকের জন্যও তাকে 'মিশ্র নিকেত'-এর বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি। একদিন একা একা সে তার ছেলেবেলার বন্ধুর বাড়ি যেতে চেয়েছিল, দারোয়ানেরা তাকে রুখে দেয়। এই নিশ্ছিদ্র নজরদারির ভেতরে থেকেও সে কী ক'রে প্রভাকরকে চিঠি পাঠাতে পারল ?

মুকুটনাথের চোয়াল শক্ত হ'য়ে উঠেছিল। কর্কশ স্বরে তিনি বলেন, 'কী লিখেছে ?'

প্রভাকর মুকুটনাথের চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে বলে, 'আপনি তাকে এ বাড়িতে আটকে রেখেছেন।'

বশিষ্ঠনারায়ণের পরামর্শমতো প্রাণপণে এতক্ষণ নিজেকে সংযত রেখেছিলেন মুকুটনাথ। কিন্তু শরীরের সব রক্ত আবার তাঁর মাথায় উঠে আসতে থাকে।

প্রভাকর এবার বলে, 'এটা আপনি কিছুতেই পারেন না। দিস ইজ টোটালি আন-ল'ফুল, পুরোপুরি বে-আইনি।'

মুকুটনাথকে এই মুহূর্তে বারুদের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। প্রভাকরের কথা শুনতে শুনতে তার দিকে লক্ষ রাখছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। বিস্ফোরণটা ঘটবার আগেই মুকুটনাথকে থামিয়ে দিয়ে তিনি প্রভাকরকে বলেন, 'মুকুট কিরণের বাবা। মেয়েকে আটকে রাখা না রাখা, সবটাই তার ইচ্ছা।'

প্রভাকর আগাগোড়াই ধীর স্থির এবং শান্ত। নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে সে বলে, 'কিরণ সাবালিকা। তাকে কারো ইচ্ছামতো আটকে রাখা যায় না, বাবা হ'লেও না। আপনারা যে কোনো ভকিলকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিতে পারেন।'

বশিষ্ঠনারায়ণ অদ্ভুত হাসেন, 'তুমি কলেজে পড়াও, জ্ঞানী আদমী। আইন না জেনেই কি আর বলছ ! তবে আইনের ওপরও অনেক কিছু থাকে।'

'যেমন ?' কিঞ্চিৎ উৎসুক দেখায় প্রভাকরকে।

'তুমি সেই শ্লোকটা জরুর জানো। 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ—'

'জানি।'

'তাছাড়া কিরণদের বংশের একটা পরম্পরা আছে।'

'কীরকম ?'

'এই বংশে বাপই সব। তার ইচ্ছা বা হুকুমের বাইরে কোনো কিছু হ'বার উপায় নেই।'

'ছেলেমেয়ে যদি বাবার ইচ্ছায় না চলে?'

'তার ফল তাদের ভুগতে হবে।' বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ওসব কথা থাক। তুমি ত বললে কিরণের চিঠি পেয়ে চলে এসেছ—'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়ে প্রভাকর।

'কী জন্যে এসেছ, সেটা কিন্তু এখনও আমরা জানতে পারিনি।'

'আমি কিরণকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বশিষ্ঠনারায়ণ চমকান না। প্রভাকর যে এই উদ্দেশ্যেই এখানে হানা দিয়েছে, সেটা যেন জানাই ছিল তাঁর। তিনি বিচলিতও হ'ন না। অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলেন, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

প্রভাকর বলে, 'নিশ্চয়ই।'

'তোমার সঙ্গে মুকুটনাথদের রিস্তেদারি আছে বলে কখনও শুনিনি। তুমি ওর ভাই না, চাচা না, মামা না। তোমার সঙ্গে একটা জোয়ানী লেড়কীকে আমরা যেতে দেবো কেন?'

প্রভাকর বলে, 'কিরণ আমার স্ত্রী। তাই ওকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন।' তার কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়।

সমস্ত ধরমপুরা টাউন তোলপাড় করে 'মিশ্র নিকেত'-এর মাথায় আচমকা প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ে যেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য সারা ঘর একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বারো

কিরণকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে রেবতী রূঢ় গলায় বলে গিয়েছিলেন, 'কামরা থেকে বেরুবে না।' বাইরে বেরিয়ে কাকে যেন হুকুম দিয়েছিলেন, এই ঘরের ওপর নজর রাখতে। যদি কিরণ বেরুবার চেষ্টা করে, তক্ষুণি যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

রেবতীর মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিরণের। চিরদিনের শান্ত এবং নরম মানুষটি পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা করার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। বংশের সম্মান তিনি কোনোভাবেই নষ্ট হ'তে দেবেন না। এ ব্যাপারে মুকুটনাথ বা মহেশ্বরীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ধ্যানধারণার বিন্দুমাত্র তফাত নেই।

রেবতী চলে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ খাটে বসে থাকে কিরণ। তারপর

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকে। একবার ভাবে, এখনই নিচে নেমে যাবে। প্রভাকর এখানে আসার পর আর মুখ বুজে থাকার মানে হয় না। এবার বিস্ফোরণ ঘটাতেই হবে। পরক্ষণে ভাবে, আরেকটু অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক।

তীব্র অস্থিরতার মধ্যে অনেকটা সময় কেটে যায়। তারপর হঠাৎ বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে সাগিয়া। চাপা গলায় ডাকে, 'দিদিজি—' তার স্বরে উত্তেজনা।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ।

সাগিয়া কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'নিচে গোলমাল হচ্ছে। জরুর শুনেছ, দিল্লি থেকে একগো আদমী এসেছে। বহোৎ খুবসুরত। বড়ে সরকারের সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছে।'

কিরণ কিছু উত্তর দেবার আগে সাগিয়া ফের বলে, 'আচ্ছা দিদিজি, আমাকে তুমি যে চিঠিটা ডাকে দিতে বলেছিলে সেটা কি এই আদমীটাকেই লিখেছিলে?'

মেয়েটা দারুণ চালাক চতুর, কেউ হাঁ করলে তার বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে দেখতে পায়। অন্য সময় হ'লে কিরণ অবাক হ'ত, এখন প্রভাকরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। চিঠির ব্যাপারে কিছু না বলে সে জিজ্ঞেস করে, 'বাবুজি কী বলছে?'

'বহোৎ গুস্‌সা হ'য়ে ঐ আদমীটাকে গালি দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, দারবানদের ডেকে তাকে কোঠির বাইরে বার ক'রে দেবে। আমার ডর লাগছে দিদিজি—'

'প্রভাকর কী বলছে?'

'দিল্লি থেকে যে এসেছে তার নাম প্রভাকরজি?'

'হ্যাঁ।'

'সব কথা শুনতে পাইনি। মা'জি ওখানে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তবে দূর থেকে কানে এল, প্রভাকরজি তোমাকে দিল্লি নিয়ে যেতে চাইছে।'

রুদ্ধশ্বাসে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'বাবুজি কী বলল?'

সাগিয়া জানায়, আর কিছু সে শুনতে পায়নি। কেননা হঠাৎ রেবতী তাকে দেখতে পেয়ে রেগে যান এবং দোতলায় চলে আসতে বলেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর সাগিয়া চাপা গলায় এবার বলে, 'দিদিজি, আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'বড়ে সরকার যেরকম গুস্‌সা হয়ে আছেন তাতে প্রভাকরজির বিপদ হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে—'

উৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে তাকায় কিরণ। বলে, 'কী ?'

'প্রভাকরজি যদি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে জেদ ধরে, দারবানদের দিয়ে মার দেওয়াবেন। কী হবে দিদিজি ?'

সাগিয়ার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মনস্থির ক'রে ফেলে কিরণ। সে শুধু জিজ্ঞেস করে, 'মা এখন কোথায় রে ?'

সাগিয়া বলে, 'যে কামরায় বড়ে সরকার, গুরুজি আর প্রভাকরজি কথা বলছে তার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে—'

আর কিছু বলে না কিরণ। তার ওপর দুর্জয় এক সাহস যেন ভর করে। সাগিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার পাশ দিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে একতলার সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়।

পেছন থেকে ভীরু গলায় সাগিয়া ব'লে ওঠে, 'মাত্ যাও দিদিজি, মাত্ যাও—'

কিন্তু তার কথা যেন শুনতেই পায় না কিরণ। একসঙ্গে দু-তিনটে ক'রে সিঁড়ি টপকে সে নির্দিষ্ট ঘরটির সামনে চলে আসে।

খবরটা ঠিকই দিয়েছিল সাগিয়া। রেবতী ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সতর্ক চোখে চারিদিকে লক্ষ রাখছেন। আশেপাশে নৌকর নৌকরানী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব তাঁর হুকুমে সবাই বাড়ির অন্য দিকে চলে গেছে।

কিরণকে দেখে মুখ কঠোর হ'য়ে ওঠে রেবতীর, কপাল কুঁচকে যায়। রুক্ষ গলায় বলেন, 'এখানে কে আসতে বলেছে তোমাকে ? ওপরে যাও।'

কিরণ উত্তর দেয় না, দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের ভেতর থেকে মুকুটনাথের প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে আসছে, 'দিস ইজ নট ইওর দিল্লি। এখানে আমি যা বলব তা-ই করতে হবে। আমার কথাই এখানকার কানুন। উঠে পড়, আমার লোকেরা তোমাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে।'

প্রভাকরের গলা এবার শোনা যায়। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে সে বলে, 'আপনাকে ত অনেক বার বলেছি, কিরণকে না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না।'

মুকুটনাথের গলা এবার আরো কয়েক পর্দা চড়ে যায়।

ভেতরে তর্জন গর্জন চলছে। বাইরে রেবতী বলেন, 'আমার কথা কি কানে গেল না ? ওপরে যেতে বললাম যে ?'

কিরণ মা'র প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, 'দরজা ছাড়ো, আমি ভেতরে যাব।'

মেয়ের স্পর্ধায় কিছুক্ষণ রেবতীর গলায় স্বর ফোটে না। অসহ্য রাগে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় যেন, গলার কাছের শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে। একসময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বেশরম লেড়কী; এত সাহস তোমার! বংশের মুখে আর কত কালি মাখাবে! যাও—' ব'লে সটান হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দোতলার সিঁড়ি দেখিয়ে দেন।

যে প্রবল জেদ কিরণকে নিচে নামিয়ে এনেছিল তার শক্তি আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সে ধীরে ধীরে মাকে সামান্য সরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

মুকুটনাথ প্রচণ্ড উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে প্রভাকরকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা কিরণকে দেখে থমকে যান। এ ঘরে আসার মতো এতটা সাহস কিরণ কীভাবে পেল, এরকম একটা ভাবনা তাঁকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ক'রে রাখে। তারপর আরক্ত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি এখানে!'

চোখের সামনে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না কিরণ। অন্ধের মতো সে বলে, 'প্রভাকরের সঙ্গে আমি দিল্লি যাব।'

কিরণের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মুকুটনাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর একটা হাত ধরে টানতে টানতে সোজা ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে তার ঘরে ছুঁড়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেন।

কিরণ ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়েছিল। দ্রুত উঠে দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে গলা চড়িয়ে ডাকতে থাকে, 'বাবুজি, বাবুজি, দরজা খুলে দিন—'

মুকুটনাথের উত্তর মেলে না। তাঁর পায়ের আওয়াজ একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

কিরণ উন্মাদের মতো দরজায় ঘা মারতেই থাকে, 'বাবুজি, বাবুজি—'

একসময় ক্লান্ত, হতাশ কিরণ বিছানায় গিয়ে বসে। এখন কী করা উচিত, একেবারেই ভেবে উঠতে পারছে না। অথচ যা করার, কয়েক মিনিটের ভেতর ক'রে ফেলতে হবে। কেননা, প্রভাকরকে জোর ক'রে এ বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলে, যে দুর্লভ সুযোগটা পাওয়া গেছে, চিরকালের মতো তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। 'মিশ্র নিকেত'-এর দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে কোনোদিনই আর বেরুনো যাবে না। বেরুলেও তাকে যেতে হবে কামতিগঞ্জে ত্রিকূটনারায়ণদের বাড়িতে। দিল্লিতে কয়েক বছর কাটিয়ে পর্যাপ্ত আলো হাওয়ায় ভরা গোঁড়ামি-মুক্ত স্বাধীন যে পৃথিবীর স্বপ্ন সে দেখেছে, কোনোদিনই তার নাগাল পাওয়া যাবে না। হাজার

কুসংস্কারে বোঝাই, পচা, গলিত, আবহমান কালের প্রাচীন আবহাওয়ায় তাকে আমৃত্যু অবরুদ্ধ থাকতে হবে।

হঠাৎ কিরণ উঠে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, ক্ষীণ একটু আশা এখনও আছে। মুকুটনাথ যখন তাকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে এসেছিলেন, কিরণ বাধা দেয়নি। বলা যায়, দিতে পারেনি। বাবাকে সেই ছেলেবেলা থেকে সে ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু এই ভয়টা এই মুহূর্তে তার কাটিয়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরি। কোনো-রকমে এই বাড়িটা থেকে বেরুতে পারলে জোর ক'রেই প্রভাকরের সঙ্গে চলে যাবে। বেরুবার একটা উপায় তাকে বের করতেই হবে!

কিরণ সোজা দরজার কাছে চলে আসে। ডাকে, 'সাগিয়া, সাগিয়া—' কিরণের ধারণা, মুকুটনাথ চলে যাবার পর সাগিয়া দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

কিরণ যা ভেবেছিল তা-ই। বাইরের বারান্দা থেকে সাগিয়ার চাপা গলা ভেসে আসে, 'হাঁ দিদিজি—'

'শেকলটা খুলে দে।

'নেহী দিদিজি।'

বিশ্বস্ত অনুগত সাগিয়ার কাছ থেকে এমন জবাব আশা ক'রেনি কিরণ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে সে। তারপর বিমূঢ়ের মতো বলে, 'খুলবি না কেন?'

সাগিয়া বলে, 'হুকুম নেহী।'

'কার হুকুম?'

'বড়ে সরকারের। দরবাজা খুলে দিলে আমার জান চলে যাবে।'

অর্থাৎ চতুর মুকুটনাথ আগেই আন্দাজ করেছিলেন, ঘর থেকে বেরুবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে যাবে কিরণ, অন্তত প্রভাকর যতক্ষণ এ বাড়িতে আছে। তাই সাগিয়াকে, শুধু সাগিয়াকেই না, এ বাড়ির নৌকর নৌকরানী থেকে শুরু ক'রে সবাইকেই হয়ত শাসিয়ে দিয়েছেন, দরজা খুলে দিলে খুন ক'রে ফেলবেন। তাঁর হুঁশিয়ারি অমান্য করার সাহস 'মিশ্র নিকেত'-এর একটি মানুষেরও নেই।

কিরণ বলে, 'তোর ভয় নেই সাগিয়া। বাবুজিকে বলব, দরজা খুলে দেবার জন্যে আমিই তোকে জোর করেছি।'

বিপন্নভাবে সাগিয়া বলে, 'আমাকে দরবাজা খুলতে ব'লো না দিদিজি। আমি পারব না।'

এরপর কাকুতি মিনতি করতে থাকে কিরণ, 'খুলে দে সাগিয়া, খুলে দে। কথা দিচ্ছি, তোর কোনো বিপদ হবে না।'

সাগিয়ার একটাই জবাব, তার পক্ষে বড়ে সরকারের হুকুম অগ্রাহ্য ক'রে দরজা খোলা সম্ভব না।

এবার উদ্‌ভ্রান্তের মতো দরজায় এক নাগাড়ে ধাক্কা মারতে থাকে কিরণ, 'খোল বলছি, খোল—'

সাগিয়া উত্তর দেয় না।

হঠাৎ নিচে তুমুল হৈচৈ শুনে চমকে ওঠে কিরণ। দরজায় ঘা দিতে দিতে তার হাত থেমে যায়। চোখ কুঁচকে হৈচৈ-এর কারণটা বুঝতে চেষ্টা করে। বিদ্যুৎচমকের মতো তার মনে হয়, প্রভাকরকে নিয়ে কিছু একটা গোলমাল চলছে। নিজের অজান্তেই প্রায় দৌড়ে উলটো দিকের জানালার কাছে চলে আসে কিরণ। এখান থেকে নিচের ফাঁকা জায়গা, বাঁ দিকের নতুন শিবমন্দির, ডান পাশের বিশাল লোহার গেট—সব দেখা যায়।

গরাদের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাতেই পলকের জন্য কিরণের হৃৎপিণ্ডে দুরন্ত গতিতে ঝড় বয়ে যায়। যা ভয় করেছিল তা-ই। গেটের দুই দারোয়ান এবং হট্টাকট্টা চেহারার চার-পাঁচটা নৌকর প্রভাকরকে টেনে হিঁচড়ে তাদের পুরনো মডেলের মোটরটার দিকে নিয়ে চলেছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করতে করতে মুকুটনাথ নৌকরদের বলছেন, 'ভূচ্চরের ছৌয়াটাকে গাড়িতে তুলে সিধা স্টেশনে নিয়ে যাবি। যে ট্রেন পয়লা আসবে সেটায় তুলে দিয়ে তবে ফিরবি। সমঝা ?'

নৌকর এবং দারোয়ানরা সমস্বরে জানায়, 'সমঝ গিয়া হুজৌর।'

এদিকে প্রভাকর সমানে হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছিল আর চিৎকার করছিল, 'ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও—'

মুকুটনাথ ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চুপ, বিলকুল চুপ—'

প্রভাকর বলে, 'আমি আপনাকে ছাড়ব না। জেনে রাখুন মিস্টার মিশ্র, কিরণকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাবই।'

'ফের ওকথা বললে তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলব কুত্তা।'

'একবার না, হাজার বার বলব। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।'

অসীম ক্রোধে প্রায় অন্ধ হ'য়ে যান মুকুটনাথ। চোখ দুটো যেন ফেটে পড়বে, কণ্ঠার কাছের মোটা শিরাগুলো দপ দপ ক'রে লাফাতে থাকে। একটা মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছিল, তার আগেই শিবমন্দিরের ভেতর থেকে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ দ্রুত বেরিয়ে এলেন। 'শান্ত হো যাও মুকুটনাথ, শান্ত হো যাও—'

বলতে বলতে নিচে নেমে সোজা মুকুটনাথের কাছে চলে আসেন, 'চারদিকে লোকজন রয়েছে। এখন এত উত্তেজনা ভালো না।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বুঝিয়ে দেন, নৌকর দারোয়ানদের সামনে নিজের মেয়ের ব্যাপারে চিৎকার চেঁচামেচি করা অনুচিত। তাতে ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে ছড়িয়ে যাবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে ধরমপুরা টাউনে। ঠাণ্ডা মাথায়, অসীম ধৈর্যে এখন সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।

আগেও অনেক বার বশিষ্ঠনারায়ণ সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। মুকুটনাথ দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করেন। বলেন, 'ঠিক আছে'—তারপর নৌকরদের উদ্দেশ্যে চাপা গলায় বলতে থাকেন, 'তুরন্ত জানবরটাকে গাড়িতে তুলে ফ্যাল। ভৈসের মতো চেহারা এককেটার। ঐ রোগা দুব্‌লা ছোকরাকে টেনে তুলতে এত সময় লাগে! লাথ মেরে আমি সবাইকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দেবো।'

কাজেই নতুন উদ্যমে টানাহ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যায়। অসীম শক্তিতে নৌকরদের বাধা দিতে দিতে প্রভাকর সমানে বলতে থাকে, 'কিরণকে না নিয়ে আমি যাব না।'

চোয়াল শক্ত করে মুকুটনাথ নৌকরদের শুধু বলেন, 'তুরন্ত—'

দোতলায় গরাদের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরে পলকহীন নিচের দৃশ্য দেখছিল কিরণ। টের পাচ্ছিল, তার বুকের ভেতরটা বেঁকেচুরে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো ক'রে সে চিৎকার করে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমি ওর সঙ্গে যাব।'

চমকে মুখ তুলে কিরণকে দেখেন মুকুটনাথ। সেই সঙ্গে বাকি সবাই।

পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নৌকরদের উদ্দেশে মুকুটনাথ ব'লে ওঠেন, 'জলদি—'

এক হ্যাঁচকায় প্রভাকরকে গাড়িতে তুলে পেছনের সীটে বসিয়ে দেয় নৌকরেরা এবং নিজেরা উঠে তাকে ঘিরে থাকে। প্রভাকর যে এতগুলো পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়বে তার আর উপায় নেই।

এ বাড়ির পুরনো ড্রাইভার আগে থেকেই স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল এবং এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা বাইরের রাস্তায় নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেট ধাতব শব্দ ক'রে বন্ধ হ'য়ে যায়।

ক্রমশ গাড়িটা দূরে, আরো দূরে, হাইওয়ের দিকে চলে যেতে থাকে। গরাদে মুখ চেপে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কিরণের চোখের সামনে চার-পাশের পৃথিবী একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়।

তেরো

প্রভাকরকে নিয়ে নৌকরেরা অনেকক্ষণ আগেই স্টেশনে চলে গিয়েছিল। তাকে পাটনার গাড়িতে চড়িয়ে তবে ওরা ফিরবে।

মুকুটনাথ প্রভাকরকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলার ব্যাপারটা আগাগোড়া তদারক ক'রে গেছেন। সুচারুভাবে কাজটি সম্পন্ন ক'রে তিনি আপাতত বাড়ির ভেতর চলে এসেছেন। হয়ত কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ রেবতী বা মহেশ্বরীর সঙ্গে এই নিয়ে নতুন করে রণকৌশল স্থির করছেন অথবা স্নানটান সেরে দুপুরের ভোজন চুকিয়ে বিশ্রাম করছেন।

হৈচৈ শুনে সেই যে কিরণ জানালার কাছে গিয়ে গরাদে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এখনও হুবহু তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে।

নিচের ফাঁকা জায়গাটায় এই মুহূর্তে কেউ নেই। দু'-একটা নৌকর এধারে ওধারে কী যেন করছে। নতুন শিউশঙ্করজির মন্দিরেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কারো সাড়াশব্দও কানে আসছে না। 'মিশ্র নিকেত' প্রচণ্ড দুর্যোগের পর হঠাৎ একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে।

দূরে হাইওয়ের ওপর দিয়ে প্রভাকরকে তুলে নিয়ে তাদের পুরনো আমলের ফোর্ড গাড়িটা চলে গেছে। যতক্ষণ সেটা দেখা গেছে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়েছিল কিরণ। হাজার রকমের প্রাচীন সংস্কার দিয়ে ঘেরা 'মিশ্র নিকেত' থেকে বেরুবার শেষ আশাটুকুও বিলীন হয়ে গেল তার।

হাইওয়েতে এখন প্রতিদিনের সেই দৃশ্যাবলী। সেই বয়েল আর ভৈঁসা গাড়ির ঝাঁক, অগুণতি সাইকেল রিকশা, ট্রাক, বাস এবং মানুষ। কিরণের জীবনে এত বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল কিন্তু তার এতটুকু ছাপ পড়েনি সেখানে। সমস্ত কিছুই আগের নিয়মে চলছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই কিরণের। হঠাৎ ঝনাৎ করে শেকলের আওয়াজ হওয়ায় চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। ওধারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছেন রেবতী।

তিন ঘণ্টা আগে মায়ের চোখেমুখে যে দুশ্চিন্তা আর টেনসান ফুটে বেরিয়েছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এই মুহূর্তে ভাবনামুক্ত হয়ে রেবতীকে অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। বড়ো রকমের অঘটন না ঘটিয়ে প্রভাকরকে যে ধরমপুরা থেকে বিদায় করা গেছে, এতেই তাঁর স্নায়বিক চাপটা আর নেই।

খুব সহজ গলায় রেবতী বলেন, 'অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। এবার স্নান ক'রে খেয়ে নে।'

কিরণ লক্ষ করল, প্রভাকরের নাম বা তাকে নিয়ে 'মিশ্র নিকেত'-এ এমন একটা ব্যাপার যে ঘটে গেল তার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না রেবতী। যেন এ বাড়িতে পলকের জন্যও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, আজকের দিনটা অন্য সব দিনের মতো চিরকালের নিয়মে কেটে যাচ্ছে। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই।

কিরণ মাকে দেখতে দেখতে মনস্থির ক'রে ফেলে। আপাতত সে চুপচাপ থাকবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর যা করার করবে। শরীরের অভ্যন্তরে প্রভাকরের যে ভ্রূণটি প্রতিদিন একটু একটু ক'রে পুষ্ট হচ্ছে, এবার সেটার কথা বলার সময় হয়েছে। তার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব না।

পেটের এই ভ্রূণটার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া কী হ'তে পারে মোটামুটি আন্দাজ ক'রে নেয় কিরণ। হয়ত শেষ পর্যন্ত 'মিশ্র নিকেত' থেকে বার ক'রে দেবেন মুকুটনাথেরা। সেটাই চায় কিরণ। যেভাবেই হোক এখান থেকে তাকে বেরুতেই হবে। প্রভাকর এ বাড়িতে থাকতে থাকতে পেটের বাচ্চাটাকে অস্ত্রের মতো কেন যে প্রয়োগ করল না, ভেবে এখন আপসোস হচ্ছে। তা হ'লে হয়ত প্রভাকরের সঙ্গেই তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চিরকালের মতো বিদায় করতেন মুকুটনাথেরা। আসলে প্রভাকরকে এ বাড়িতে দেখে সে এতই হকচকিয়ে গিয়েছিল যে গুছিয়ে ভাবতেই পারছিল না তার কী করা উচিত। আসলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার শক্তিটাই কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল।

রেবতী এবার তাড়া দিলেন, 'কিরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে? স্নান করতে যা।'

কিরণ বলে, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

মেয়েকে সহজভাবে কথা বলতে দেখে রেবতী ভাবলেন, প্রভাকরকে জোর ক'রে তাড়িয়ে দেবার ফলটা ভালই হয়েছে। কিরণ নিশ্চয়ই মিশ্র বংশের ছক-কাটা পথেই ফিরে এসেছে। তাঁদের এই অনমনীয়তা এবং নিষ্ঠুরতার খুবই প্রয়োজন ছিল। এবার থেকে কিরণ নিশ্চয়ই এমন বেয়াড়া কিছু করবে না বা ভাববে না যাতে মিশ্রদের পারিবারিক সুনাম এবং মর্যাদা নষ্ট হয়।

ফিরে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন রেবতী। বললেন, 'যা হবার তা ত হয়েই গেছে। এবার ওসব ভুলে যাও। সব সময় নিজের বংশের সম্মানের কথা মনে রাখবে।' একটু থেমে আবার বলেন, 'ছেলে-দের দুর্নাম রটলে দু'দিন পরে সবাই ভুলে যায়, কিন্তু মেয়েদের বদনাম হ'লে তার দাগ চিরকাল থেকে যায়। কথাটা ভুলো না।'

উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে মাকে লক্ষ করতে থাকে কিরণ।

মেয়ের মুখ বুজে থাকাটা ভালই লাগে রেবতীর। তাঁর ধারণা প্রভাকরকে জোর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কিরণের সৃষ্টিছাড়া মতিগতি শুধরে যাবে। অন্তত এখন তাকে দেখে রেবতীর তা-ই মনে হচ্ছে। তিনি মোটামুটি খুশি হয়েই ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

আর তখনই পেছন থেকে কিরণ ডাকল, 'মা—'

রেবতী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কী বলছিস ?'

'বিকেলে দাদীর ঘরে তুমি, গুরুজি থাকবে। বাবুজিকেও থাকতে বলবে। আমি ওখানে যাব। তোমাদের সঙ্গে দরকারী কথা আছে।'

সন্দিগ্ধ চোখে কিরণকে দেখতে দেখতে রেবতী জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা ?'

কিরণ বলল, 'তখনই বলব।'

রেবতী চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল সুষ্‌মা। তার কুটিল মুখে হিংস্র হাসি ফুটে আছে। চোখ এবং ভুরু কুঁচকে সে বলে, 'চুহী কাঁহিকা ! গলায় রশি দিতে পারিসনি ?'

জঘন্য স্বভাবের এই হিংসুটে ইতর মেয়েটাকে পারতপক্ষে ঘাঁটায় না কিরণ। যতটা সম্ভব তাকে এড়িয়েই চলতে চায়। দু'একটা কথা যা কিরণ বলে তাতে থাকে খোশামুদি। কিরণ জানে, কারো, বিশেষ ক'রে তার ভালো আদৌ চায় না সুষ্‌মা। উলটে তার ক্ষতি হ'লে, তার বদনাম হ'লে লোকের চোখে তার মর্যাদা নষ্ট হ'লে, সুষ্‌মার মতো খুশি কেউ হবে না।

অন্য সময় কী করত, কিরণ জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে মাথার ঠিক থাকে না তার। অসহ্য রাগে কপালের শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে। নিজের অজান্তে সে চিৎকার করে ওঠে, 'গলায় রশি দেবো কেন ? তোর কথায় ?'

কিরণের এ রকম মারমুখী চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি সুষ্‌মা। প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, 'শরম নেই তোর ? বাড়িতে দিল্লি-বালা এক জানবর এসে বলে কিনা তুই তার আওরত। আমাদের মুখে কালি দিয়ে এখন আবার আঁখ গরম করছিস ! কুত্তী কাঁহিকা !'

ক্রোধে উত্তেজনায় মাথা ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে কিরণের। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে বলে, 'কাকে জানবর বলছিস রে শয়তান মেয়ে। জানিস উনি একজন প্রফেসার, কত পণ্ডিত—'

মুখটা এবার বেঁকেচুরে বীভৎস দেখায় সুষ্‌মার। সে টেনে টেনে তীক্ষ্ণ গলায়

বলে, 'ছোড় তেরি প্রফেসার! নালিয়ার পোকার মতো যার স্বভাব সে আবার পণ্ডিত! থুঃ থুঃ থুঃ—' অসীম ঘৃণায় শব্দ ক'রে তিন বার থুতু ফেলে সে।

শরীরের সব রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছে। মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়েই ফেলত কিরণ। তার আগেই কণ্ঠনালী থেকে আরো খানিকটা বিষ ঢালে সুষ্‌মা, 'মর তুই, মর, মর।' বলে আর দাঁড়ায় না, কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

সুষ্‌মা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে কিরণ। মাথাটা জুড়িয়ে এলে কোনোরকমে স্নান খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে যে সব উত্তেজক ব্যাপার ঘটেছে তাতে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে। তা ছাড়া আসল বিস্ফোরণটা ঘটবে বিকেলে। এই সব কারণে ঘুম আসে না, চোখ বুজে থাকলেও ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করতে থাকে।

শুয়ে থাকতে থাকতে চোখের পাতা কখন ভারী হয়ে এসেছিল কিরণের খেয়াল নেই। হঠাৎ সাগিয়ার ডাক ভেসে আসে, 'দিদিজি—দিদিজি—'

চমকে চোখ মেলতেই কিরণ দেখতে পায়, কফির কাপ হাতে নিয়ে তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাগিয়া। বলে, 'কি রে, আজ এত তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে এলি!'

'তাড়াতাড়ি কোথায়?' সাগিয়া বলে, 'ঐ দেখ সুরয ডুবে যাচ্ছে। একটু পরেই অন্ধেরা নেমে যাবে।'

দ্রুত জানালার বাইরে তাকায় কিরণ। অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে পশ্চিম দিগন্তে নেমেছে, সূর্যটা সেখানে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই ওটাকে আর দেখা যাবে না। এই শেষ বেলায় রোদের রং মরে গেছে। মাঠ ঘাস শস্যক্ষেত্র এবং দূরের গাছপালা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে কিরণ বলে, 'তুই একটু দাঁড়া, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

ফিরে এসে সাগিয়ার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে হালকা চুমুক দেয় কিরণ।

সাগিয়া বলে, 'তুরন্ত কফি খেয়ে নিচে যাও। দাদীজির ঘরে সবাই তোমার জন্যে বসে আছে।'

কিরণ অবাক চোখে তাকায়, 'কারা বসে আছে?'

'গুরুজি মা'জি বড়ে সরকার আর দাদীজি।' সাগিয়া বলতে থাকে, 'মা'জি

তিন বার তোমাকে নিচে যাবার জন্যে খবর পাঠিয়েছে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে ব'লে ডাকিনি।'

এবার সব মনে পড়ে যায় কিরণের। দুপুরে সে নিজেই এই পারিবারিক সভার আয়োজন করতে বলেছিল রেবতীকে। আজই পেটের ভ্রূণটার ব্যাপারে চূড়ান্ত বোঝাপড়া ক'রে নিতে চায় সে। কিরণের মুখ একটু শক্ত হয়ে ওঠে। দ্রুত কফিটা শেষ করতে থাকে সে।

সাগিয়া জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এখন নিচে যাবে?'

কিরণ অন্যমনস্কর মতো বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমি কি মা'জিকে বলে আসব?'

'দরকার নেই। আমি এখনই যাচ্ছি।'

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাগিয়ার হাতে খালি কাপটা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে আসে কিরণ। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে নামতে টের পায়, তার স্নায়ুগুলো টান টান হ'য়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে এক ধরনের কাঠিন্য অনুভব করে সে। যে কথা কিরণ আজ মা বাবা ঠাকুমা এবং কুলগুরুর সামনে বলতে যাচ্ছে, মিশ্র বংশের কোনো মেয়ে কোনোদিন তা উচ্চারণ করার সাহস পায়নি। কিন্তু সে নিরুপায়। ঘা খেতে খেতে একেবারে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে কিরণ, এবার তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। অদম্য এক জেদ তার ওপর যেন ভর করতে থাকে।

মহেশ্বরীর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। যে গতিতে সিঁড়ি ভেঙে কিরণ নেমে এসেছে, দরজার মুখে হঠাৎ সেটা থমকে যায়। সে বুঝতে পারে হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে এবং গালে গলায় কপালে দানা দানা ঘাম জমতে শুরু করেছে। কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই প্রবল শক্তিতে যাবতীয় স্নায়বিক দুর্বলতা এবং ভয় কাটিয়ে সে একরোখা ভঙ্গিতে ভেতরে চলে আসে। সেই প্রবল জেদটা আবার তার মধ্যে ফিরে এসেছে।

ঘরের ভেতর নিজের বিশাল খাটে যথারীতি শুয়ে আছেন মহেশ্বরী। তাঁর পায়ের দিকে ছত্রিতে হেলান দিয়ে রেবতীকে বসে থাকতে দেখা গেল। একটু দূরে দুটো গদি-মোড়া বিশাল সোফায় বসে আছেন বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ।

কিরণ লক্ষ করল, সবার মধ্যেই একটা ঢিলেঢালা স্বস্তির ভাব। কারো চোখেমুখে কোনোরকম উত্তেজনা দুশ্চিন্তা বা টেনসান নেই। প্রভাকরকে তাড়িয়ে দেবার পর এখন তাঁরা আরামই বোধ করছেন।

কিরণকে দেখে সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'আয়, আয়—'

কিরণ সোজা মহেশ্বরীর কাছে গিয়ে বসে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'আমাদের এখানে আসতে বলেছিস কেন? কিছু দরকার আছে?'

কিরণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ।'

'কী?'

'বলছি। তার আগে আমার কয়েকটা কথা জানতে হবে।'

'কী কথা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না কিরণ। কিছুক্ষণ ভাবার পর বলে, 'নৌকরেরা কি প্রভাকরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে?'

প্রভাকরের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া পলকে বদলে যায়। সবার চোখেমুখে অস্বস্তি এবং বিরক্তি ফুটে ওঠে। মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে মুকুটনাথ বলেন, 'হ্যাঁ। আর কোনোদিন এখানে আসার চেষ্টা করলে ভূচ্চরের ছোঁয়াটাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলব। এত বড়ো সাহস ওর—'

হাত তুলে মুকুটনাথকে থামাতে থামাতে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'শান্ত হো যাও, শান্ত হো যাও। ছোকরাকে যখন ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়েছে তখন আর রাগা-রাগি কেন?'

মহেশ্বরীও বিছানায় কাত হ'য়ে সরু দুর্বল গলায় বলেন, 'ও সব কথা এখন থাক। যা হ'য়ে গেছে তা টেনে আনার জরুরত নেই। যত ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবি ততই ঝঞ্ঝাট বাড়বে।'

মুকুটনাথ আর কিছু বলেন না, থমথমে মুখ ক'রে বসে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে এবার কিরণের দিকে তাকান। বলেন, 'বেটা, তোমার জরুরি কথাটা এবার বল।'

কিরণ বলে, 'আমি জানতে চাইছি, লেখাপড়া বন্ধ ক'রে আমাকে জোর জবর-দস্তি বাড়িতে আটকে রাখা হচ্ছে। এখন আমার ভবিষ্যৎ কী? কী ইচ্ছে আপনাদের? এই কয়েদখানাতেই আমাকে পচিয়ে মারতে চান?'

বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে হেসে হেসে শান্ত মুখে বলেন, 'কথা শোন বেটার! তোমার ওপর জোরজবরদস্তির প্রশ্নই ওঠে না। ভবিষ্যতের কথা বলছ? সেটা ত কবেই ঠিক হয়ে আছে।'

'আপনি ত্রিকূটনারায়ণজির ছেলের সঙ্গে আমার শাদির কথা বলছেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ বেটা। শুভদিনও মোটামুটি স্থির হ'য়ে গেছে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এত লেখাপড়া শেখার পর ঐরকম একটা অপদার্থ গাধাকে আমায় বিয়ে করতে হবে?'

কিরণের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রেবতী চিৎকার ক'রে ওঠেন, 'চুপ রহো বেশরম লেড়কী—' এতটা গলা চড়িয়ে তাঁকে কেউ কোনোদিন কথা বলতে শোনেনি।

মহেশ্বরী কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে কিরণের মাথায় রাখতে রাখতে বলেন, 'বেটা, এমন কথা বলতে নেই। হাজার হোক, সে তোমার স্বামী—'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো কিরণ বলে, 'কে আমার স্বামী? আমি ঐ ইডিয়টটাকে বিয়ে করলে ত—'

মুকুটনাথের মাথার ভেতর বারুদের একটা স্তূপে যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, 'ইডিয়ট হোক আর গাধাই হোক, হরীশকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। এ বিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকে ঠিক করা আছে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ স্বর্গীয় হাসি হেসে বলেন, 'শুধু ছেলেবেলা থেকেই না, এ তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।' এরপর একনাগাড়ে তিনি যা বলে যান তা এইরকম। হরীশ এবং কিরণের সম্পর্ক আবহমান কালের, তা এমনই দৃঢ় আর অটুট যে কোনোদিনই ছিন্ন হবার নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায় এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মানুষের এতে হাত নেই। এ বিয়ে অনিবার্য, কারো পক্ষেই তা আটকানো সম্ভব না।

গুরুজাতীয় এই জীবটিকে টেনে একটা চড় কষাতে ইচ্ছা করছিল কিরণের। বক বক করে কতকগুলো অসার কথা গলার ভেতর থেকে সে উগরে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই করল না কিরণ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, এ বিয়ে হবে না।'

বিমূঢ়ের মতো বশিষ্ঠনারায়ণ উচ্চারণ করেন, 'হবে না?'

'না।'

'তা হ'লে?'

'আপনারা প্রভাকরকে ফিরিয়ে আনুন, নইলে আমাকে দিল্লি যেতে দিন। ওকে ছাড়া আর কাউকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না।'

মহেশ্বরী কাঁপা গলায় বলেন, কী বলছিস মুন্নুম্না ! ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেছে। এখন বিয়ে ভাঙতে গেলে আমাদের সম্মান থাকবে? এ বংশে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।'

'আমার উপায় নেই দাদী। হরীশদের জানিয়ে দাও এ বিয়ে হবে না।'

মহেশ্বরী শুধোন, 'বিয়ে ভাঙার জন্য এত জেদ ধরেছিস কেন?'

ঘোরের ভেতর থেকে কিরণ বলে ওঠে, 'আমি, আমি মা হ'তে চলেছি দাদী।'

কিরণের কথা শেষ হ'তে হ'তেই মহেশ্বরীর ঘরে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসে।

চোদ্দ

মিশ্র বংশের কোনো মেয়ে আগে আর কখনও এমন মারাত্মক কথা উচ্চারণ ক'রে নি। মুকুটনাথ মহেশ্বরী রেবতী এবং বশিষ্ঠনারায়ণের শ্বাসক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজেদের কানে শোনার পরও কথাগুলো তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হ'তে থাকে। আসলে 'মিশ্র নিকেত'-এর যা ট্রাডিশান তাতে এ জাতীয় কথা কোনো মেয়ের মুখ থেকে বেরুতে পারে, এটা এ বাড়িতে বসে চিন্তাও করা যায় না। যে বাড়ির অন্তঃপুরে এখনও মধ্যযুগের আবহাওয়া, যেখানে মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছুই থাকার কথা নয়, সেখানে এ রকম একটা ঘটনা সমস্ত পরিবারের ভিত নড়িয়ে দেবার মতো।

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যেমন ঘটে, অদ্ভুত এক স্তব্ধতা চারপাশ যেন গ্রাস ক'রে ফেলেছে। বাইরে কোথাও বুঝি কোনো শব্দ নেই, হাওয়াও থেমে গেছে, পাখিদের ডাকও শোনা যাচ্ছে না। এ বাড়িতে যে ডজনখানেক নৌকর-নৌকরানী আছে, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা ব্যস্ততা, কোনো কিছুর আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ হিক্কার মতো একটা শব্দ ক'রে ওঠেন মহেশ্বরী। তারপরেই তাঁর গলার ভেতর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে করুণ গোঙানি বেরিয়ে আসতে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধতা ভেঙেচুরে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার ক'রে ওঠেন মুকুটনাথ, 'কী বললি বেশরম মেয়ে? কী বললি?'

চমকে একবার মুকুটনাথের দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে নেয় কিরণ, কোনো উত্তর দেয় না।

গলার পর্দা আরেকটু চড়িয়ে দেন মুকুটনাথ, 'চুপ ক'রে আছিস কেন? বল, আরেক বার বল—'

নিচু, অথচ দৃঢ় গলায় কিরণ বলে, 'যা বলেছি তা ত শুনেছেনই।'

চাপা দুর্বল স্বরে একটানা গোঙানির মতো আওয়াজ ক'রে চলেছেন মহেশ্বরী। তার মধ্যেই আচমকা দু'হাতে কপালে চাপড়াতে চাপড়াতে গলার শির ছিঁড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাঁদতে থাকেন রেবতী। 'এ কী পাপ পেটে ধরেছিলাম। আমাকে মেরে ফেল তুই, মেরে ফেল।' একটানা তিনি যা বলে যান তা এইরকম। এখনও আকাশে চন্দ্রসূর্য ওঠে, এখনও পৃথিবী রসাতলে তলিয়ে যায়নি, তবু পবিত্র মিশ্র বংশের মুখে কালি লাগল কেন? এমন ভয়াবহ পাপের কথা এ বাড়িতে কে কবে শুনেছে! হে বিষুণজি, হে শিউশঙ্কর, তোমরা আমাকে মৃত্যু দাও।

বশিষ্ঠনারায়ণ উঠে এসে রেবতীর পাশে দাঁড়ান। কোনো কারণেই তিনি বিচলিত বা উত্তেজিত হ'ন না। রেবতীর মাথায় একটা হাত রেখে প্রশান্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'শান্ত হো যাও কিরণকি মা, শান্ত হো যাও। বিপদের সময় এত ভেঙে পড়লে চলে!'

রেবতী কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না। এতক্ষণ কপাল চাপড়াচ্ছিলেন, এবার মহেশ্বরীর খাটের বাজুতে উন্মত্তের মতো মাথা ঠুকতে লাগলেন। কিরণ যে এভাবে মিশ্র বংশকে নরকে ডুবিয়ে দেবে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

এদিকে প্রচণ্ড ক্রোধ এবং উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছিল মুকুটনাথের। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত; চোখ টকটকে লাল। মনে হয়, প্রবল রক্তচাপে এখনই একটা স্ট্রোক হয়ে যাবে।

মুকুটনাথ গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মহেশ্বরীর জীর্ণ শরীর হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে দুমড়ে যায়, একটা হাত কাত হয়ে ঝুলে পড়ে। পরক্ষণেই গলার ভেতর একটানা শ্লেষ্মাজড়ানো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হ'তে থাকে। সেই সঙ্গে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে। বোঝা যায়, মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

বশিষ্ঠনারায়ণ মহেশ্বরীকে লক্ষ করেছিলেন। তিনি ত্রস্ত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'মুকুটনাথ, এক্ষুণি বৈদকে (কবিরাজকে) খবর দাও। মহেশ্বরীর খুব তখলিফ হচ্ছে।'

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পালটে যায়। মাথা কুটতে কুটতে চমকে মুখ

তোলেন রেবতী। মুকুটনাথ শশব্যস্তে একটা নৌকরকে তখনই কবিরাজের বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

কিরণকে ঘিরে পারিবারিক সমস্যাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, আকস্মিকভাবে সেটা অন্য দিকে ঘুরে যায়। মহেশ্বরী যে হঠাৎ এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, খানিক আগেও ভাবা যায়নি। অবিবাহিত কিরণের গর্ভবতী হওয়ার খবরটা তাঁর প্রাচীন দেহে এবং মনে এমনই ধাক্কা দিয়েছে যে তা সামলে ওঠা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে মহেশ্বরীর দুমড়ানো শরীর যখন কিরণ সোজা ক'রে শুইয়ে দিতে যাবে, সেই সময় রেবতী হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ছুঁবি না, ছুঁবি না। তোর ছোঁয়া লাগলে ওঁর পুণ (পুণ্য) নষ্ট হ'য়ে যাবে। ভ্রষ্টা, পাপী কাঁহিকা।'

মা'র ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় কিরণ। মহেশ্বরীর গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না তার। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চুপচাপ মাথা নিচু ক'রে বসে থাকে সে।

বৈদের বাড়ি লোক পাঠিয়ে স্বয়ং মুকুটনাথ মহেশ্বরীকে সযত্নে সোজা করে শুইয়ে দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। মহেশ্বরীর শাঁসহীন রুগ্ন শরীর বেঁকেই থাকে। গলার ভেতর থেকে এতক্ষণ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হচ্ছিল, এবার সাঁই সাঁই শব্দ হ'তে থাকে।

স্থিতধী এবং বহুদর্শী বশিষ্ঠনারায়ণ মহেশ্বরীকে লক্ষ করতে করতে অনিবার্য কিছুর আভাস পেয়ে যান। অনুচ্চ চাপা গলায় তিনি সমানে আওড়াতে থাকেন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।'

রেবতী মাথা ঠোকা থামিয়ে মহেশ্বরীর পরিচর্যা শুরু করেন। কখনও হাতের চেটো ঘষে ঘষে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পায়ের তলায় উত্তাপ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন, কখনও ব্যাকুলভাবে বুকে এবং কপালে হাত বুলাতে থাকেন। মুকুটনাথ বিভ্রান্তের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কী করলে মহেশ্বরীর কষ্ট কমবে, তিনি একটু আরাম পাবেন, কিছুতেই তা ভেবে উঠতে পারছেন না।

জরুরি তলব পেয়ে কবিরাজ কিছুক্ষণের মধ্যে 'মিশ্র নিকেত'-এ দৌড়ে আসে। কিন্তু সে যখন পৌঁছয় মহেশ্বরীর শরীর তখন আরো দুমড়ে গেছে, গলার ভেতরকার সেই সাঁই সাঁই শব্দটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না।

মহেশ্বরী যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ খবর সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও এখন এতটুকু আওয়াজ নেই। চারিদিক স্তব্ধ। ডজনখানেক

নৌকর নৌকরানী পা টিপে টিপে এধারে ওধারে কাজ ক'রে যাচ্ছে, চাপা গলায় ফিস ফিস ক'রে কথা বলছে।

কবিরাজকে সোজা মহেশ্বরীর কামরায় নিয়ে আসা হয়। মহেশ্বরীর কঙ্কালসার হাতটা তুলে নাড়িতে আঙুল ঠেকিয়েই চমকে ওঠে সে, চোখেমুখে হতাশা এবং বিষাদ ফুটে ওঠে। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে মাথা নিচু করে কবিরাজ। ঘরের কারো দিকেই সে তাকাতে পারছে না।

শ্বাসরুদ্ধের মতো কবিরাজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মুকুটনাথ। শুধু মুকুটনাথই না, রেবতী বশিষ্ঠনারায়ণ এবং কিরণও। মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন ?'

কবিরাজ উত্তর দেয় না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকে।

মুকুটনাথের গলার ভেতর থেকে আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে, 'মা নেই ?'

'নেহী।' কবিরাজ বিমর্ষ স্বরে বলে যায়, 'আজ সকালেও দেখে গেছি, ভালই ছিলেন মা'জি। আরো কয়েক বছর ওঁর বেঁচে থাকার কথা। হঠাৎ এমন কী হ'ল যে দেহান্ত ঘটে গেল !'

কবিরাজের শেষ কথাগুলো কারো কানে ঢুকছিল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন মুকুটনাথ। মহেশ্বরীর পলকা শরীর জড়িয়ে রেবতী প্রায় মূর্ছিতের মতো পড়ে রইলেন। বশিষ্ঠনারায়ণের কণ্ঠস্বর এবার স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।'

মহেশ্বরীর 'দেহান্তে'র খবর পেয়ে নৌকর নৌকরানীরা দৌড়ে এসে দরজার সামনে ভিড় জমাতে থাকে। তাদের ভেতর কান্নাকাটির প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে যেন। কাজের লোকেদের এই তুমুল শোকের মধ্যে আন্তরিকতা হয়ত কিছু আছে, তবে লোকদেখানো ব্যাপারটাই বেশি। বিশেষ ক'রে তারা মুকুটনাথের নজরে পড়তে চায়। কেঁদে কেটে বড়ে সরকারকে খুশি করতে পারলে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে।

ভিড় ঠেলে, খোলা চুল উড়িয়ে আলুথালু ভঙ্গিতে এ ঘরে চলে আসে সুষমা। মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে, গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে। শোক আনন্দ বা রাগ—সব কিছুরই প্রকাশ তার মারাত্মক রকমের তীব্র।

মহেশ্বরীর খাটের একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কিরণ। তার চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে যাচ্ছে। সুষমার মতো সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না। তার সুখ-দুঃখের প্রকাশ শান্ত মৃদু ও সংযত।

পনেরো

মহেশ্বরীর মৃত্যুর খবর 'মিশ্র নিকেত'-এর সীমানা ছাড়িয়ে কিভাবে যেন দ্রুত ধরমপুরার নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই নগণ্য শহরের প্রায় প্রতিটি বাসিন্দা কোনো না কোনো দায়ে মিশ্রদের কাছে আটকে আছে। মুকুটনাথ গোপনে তেজারতির কারবার ক'রে থাকেন। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে জমিজমা সোনাদানা বাঁধা রাখেন। তা ছাড়া ধরমপুরার আধাআধি মানুষ তাঁর জমিতে সারা বছর কাজ করে। কাজেই নিজেদের মা-বাবা মরলে চোখের জল না ফেললেও তাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু মহেশ্বরীর মৃত্যুতে 'মিশ্র নিকেত'-এ দৌড়ে এসে বুক চাপড়ে কাঁদাটা তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি। বলা যায়, এক পবিত্র কর্তব্য।

বাড়িঘর কাজকর্ম ফেলে লোকজন 'মিশ্র নিকেত'-এর দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে। গেটের সামনে ক্রমশ ভিড় জমে যাচ্ছে। দারোয়ানরা অবশ্য তাদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। বাইরে দাঁড়িয়ে গলার স্বর যতটা সম্ভব চড়া পর্দায় তুলে তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সমানে কাঁদছে, 'মা'জিকা দেহান্ত হো গিয়া। পুরা ধরমপুরা বিলকুল অন্ধেরা হো চুকা।' এখানেও নৌকর নৌকরানীদের মতো একই প্রতিযোগিতা। মহেশ্বরীই শুধু না, মিশ্র বংশের যে কেউ মরুক না, তাদের কাছে ধরমপুরা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। আসল কথা যেভাবেই হোক মুকুটনাথদের খুশি করা।

এদিকে রেবতী অনেকক্ষণ মহেশ্বরীকে ধরে মূর্ছিতার মতো পড়ে ছিলেন। হঠাৎ একসময় মুখ তুলে কিরণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠলেন, 'এই পাপী শাঁখরেলটা মা'জিকে শেষ ক'রে দিল। নরকেও ওর জায়গা হবে না।' রাগে উত্তেজনায় এবং আকস্মিক এই শোকে একেবারে পাগল হয়ে গেছেন তিনি।

যে রেবতী ধীর স্থির সংযত, কোনোদিন যাঁর কণ্ঠস্বর একটা বিশেষ পর্দার ওপর ওঠে না, 'মিশ্র নিকেত'-এ যাঁর অস্তিত্ব প্রায় টেরই পাওয়া যায় না, তাঁর এভাবে ক্ষেপে ওঠার কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না কিরণের। সে উত্তর দেয় না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের অজান্তেই একটা অপরাধবোধ তাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

রেবতীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে মুকুটনাথও চিৎকার করতে লাগলেন, 'এই শয়তান ছোকরিকে আমি মাটিতে পুঁতে ফেলব। ও আমার মা'কে শেষ ক'রে দিল। আমার ঘরে যে এমন সাপ জন্মাবে, কে জানতো ?'

এই শোকের পরিবেশেও বশিষ্ঠনারায়ণ অবিচলিত রয়েছেন। তিনি শশব্যস্তে

বলে ওঠেন, 'তোমরা কী করছ মুকুটনাথ? নৌকর নৌকরানীরা কাছাকাছি রয়েছে। বাইরের লোকজন আসতে শুরু করেছে। ঘরের কেলেঙ্কারি রটিয়ে কী লাভ! শান্ত হো যাও। এখন মাথা গরম করে নিজেদের ক্ষতি ক'রো না।'

এর আগেও বেশ কয়েকবার কিরণের প্রসঙ্গে রেবতী এবং মুকুটনাথকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ঘরের কলঙ্ককে বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ ক'রে দিলে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে না। মুকুটনাথরা সেটা যে বোঝেন না তা নয়। কিন্তু কিরণের কারণে পারিবারিক মর্যাদা যে নষ্ট হয়েছে এবং মহেশ্বরীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে, এসব কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাঁরা। তাই মাঝেমাঝেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলছেন।

বশিষ্ঠনারায়ণের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই রেবতী এবং মুকুটনাথ দ্রুত দরজার দিকে তাকান। সত্যিই সেখানে 'মিশ্র নিকেত'-এর তাবত কাজের লোক জড়ো হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তাদের মাথার ওপর দিয়ে দূরে লোহার গেটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানেও প্রচুর লোকজন। অগত্যা আর কিছু বলেন না মুকুট-নাথেরা, শুধু ক্রুদ্ধ চোখে একবার কিরণের দিকে তাকান।

সব দিকে নজর রয়েছে বশিষ্ঠনারায়ণের। শোকার্ত হ'য়ে বসে থাকলে এখন চলবে না। এখন অনেক কাজ। শাস্ত্রীয় রীতিতে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। মিশ্র বংশের সবচেয়ে বর্ষীয়সী মানুষটিকে ত ঐরু-গৈরুর মতো যেমন-তেমনভাবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যায় না, তার জন্য প্রচুর আয়োজন করতে হবে। ধরমপুরা টাউন ঘিরে এক শ' মাইলের মধ্যে যত গাঁ-গঞ্জ রয়েছে সে সব জায়গার সব মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে মুকুটনাথ মিশ্রের মা অন্তিম যাত্রায় চললেন। ঘটা বা সমারোহ মিশ্র বংশের মাপ অনুযায়ী করতে হবে।

মহেশ্বরীর দেহান্তের সম্ভাবনাটা মাথায় রেখে কাশীতে এবং ধরমপুরার এই 'মিশ্র নিকেত'-এ মেহগনি কাঠের দু'-দু'খানা নতুন খাট বানিয়ে রাখা হয়েছিল। যেখানেই তিনি মারা যান, ঐ খাটে চড়িয়েই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। এ খবরটা বশিষ্ঠনারায়ণের জানা আছে।

কিন্তু একটা খাটেই ত মিশ্র বংশের সম্মানিত মানুষটির শেষ 'সংস্কার' হয় না। এর জন্য আরো অনেক কিছু দরকার।

বশিষ্ঠনারায়ণ মুকুটনাথের মাথায় গভীর স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'কেঁদো না মুকুট, কেঁদো না। মা-বাবা কারো চিরকাল থাকে না। তুমি জ্ঞানী মানুষ। জানোই তো, আমাদের এই পচনশীল দেহের বিনাশ ঠেকানো

যায় না। একদিন তা শেষ হবেই। কিন্তু আত্মা অবিনাশী। দেহান্ত ঘটলেও মহেশ্বরী সবসময় আমাদের কাছেই থাকবে।'

পুরাকালের বশিষ্ঠ ঋষির মতোই একালের বশিষ্ঠনারায়ণ তাঁর শিষ্যকে নিরাসক্ত গম্ভীর স্বরে একটানা প্রাচীন সব সান্ত্বনাবাক্য আউড়ে যান। তিনি আরো যা বলেন তা এইরকম। প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন না একদিন মহেশ্বরী মারা যেতেনই। কাশীতে কাম্য মৃত্যুটি তাঁর ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু ধরমপুরায় শিউশঙ্করজির নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয় বেনারসধাম তৈরি করেছেন মুকুটনাথ। এর মাহাত্ম্যও কম নয়। পুণ্যবতী মহেশ্বরীর শৈবলোক প্রাপ্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। ছেলে হিসেবে মায়ের জন্য এত বড়ো একটা কাজ করেছেন মুকুটনাথ। মহেশ্বরী কি কম ভাগ্যশালিনী! কাজেই অতি সাধারণ মানুষের মতো অধীর হওয়া মুকুটনাথের মানায় না, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা দেবার পর বশিষ্ঠনারায়ণ রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসেন, 'এখন ওঠ, নিজেকে শক্ত কর। খুবলাল আর তোমার সমধী ত্রিকূটনারায়ণকে খবর পাঠাও। তারা এসে অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা করুক।'

মহেশ্বরীর খাট থেকে নামতে গিয়ে ফের মুকুটনাথের নজর পড়ে যায় কিরণের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ কঠোর হয়ে যায়। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, তার আগেই বশিষ্ঠনারায়ণ তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখেন। চাপা গলায় বলেন, 'আর রাগারাগি ক'রো না। কিরণের ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বুঝতে পারছিলেন, কিরণ এ ঘরে থাকলে রেবতী বা মুকুটনাথ কেউ নিজেদের শান্ত রাখতে পারবেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে এ শহরের মান্যগণ্য লোকেরা এবং ত্রিকূটনারায়ণ রোহিণী হরীশ ইত্যাদি অনেকেই এসে পড়বে। তাদের সামনে উত্তেজনার বশে মুকুটনাথ এমন কিছু ক'রে বসতে পারেন যা কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বশিষ্ঠনারায়ণ দ্রুত কিরণের কাছে চলে আসেন। তার একটা হাত ধরে স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

বিহ্বলের মতো বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয় কিরণ। নিচু গলায় ফিস ফিস ক'রে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাব?'

'তোমার কামরায়।'

নিজের ইচ্ছায় নয়, যন্ত্রচালিতের মতো বশিষ্ঠনারায়ণের সঙ্গে কিরণ দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বাড়ির কাজের লোকেরা শশব্যস্তে তাদের জন্য পথ ক'রে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'এত বড়ো বংশের মেয়ে হয়ে তুমি এমন ভুলটা করলে কী করে ? মা, বাপ, বংশের সম্মান—এ সবের কথা একবারও তোমার মনে পড়ল না ?'

মহেশ্বরীর সঙ্গে কিরণের সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড়। সে ছিল মহেশ্বরীর খুবই প্রিয়। সে-ও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। ইদানীং দু'তিন বছর গঙ্গা-যাত্রার জন্য বেরিয়ে বেশির ভাগ সময় মহেশ্বরী বেনারসে থাকতেন। ছুটি-ছাটায় দিল্লি থেকে এলে প্রায়ই ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হ'ত না। কিন্তু তার আগে সামারে বা উইন্টারে বাড়ি এলে প্রায় সারাক্ষণই মহেশ্বরীর কাছে কাটাত কিরণ। সেই প্রিয় মানুষটি আজ মারা গেলেন। এই শোকের মুহূর্তে নিজের পেটের ভ্রূণ নিয়ে কোনো কথা বলতে কিরণের ইচ্ছা হয় না। যদিও মা-বাবা থেকে শুরু ক'রে বশিষ্ঠনারায়ণ পর্যন্ত সবার বিশ্বাস সে ঘোর অন্যায় করেছে, কিন্তু পেটের বাচ্চাটি নিয়ে তার কোনোরকম গ্লানি বা অনুশোচনা নেই। সজ্ঞানে, শুদ্ধ মনে প্রভাকরের সঙ্গে নিজের দৈহিক সম্পর্ক সে মেনে নিয়েছে।

কিরণ বলে, 'এখন ওসব থাক গুরুজি। পরে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। ঠাকুমা চলে গেলেন, বড়ো কষ্ট হচ্ছে।' সে জানে পরে হাজার বছর চেষ্টা করলেও প্রাচীন ধ্যানধারণা থেকে বশিষ্ঠনারায়ণকে টলানো যাবে না। তাঁদের সংস্কার বংশ-পরম্পরায় রক্তের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে সেটা উপড়ে ফেলা অসম্ভব। ওঁরা বিশ্বাস করেন, কুমারী মেয়ের গর্ভে সন্তান আসাটা পাপ। কোনো যুক্তিতেই তা খণ্ডানো যাবে না।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ঠিক আছে। পরেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

দোতলায় উঠে ওরা যখন কিরণের ঘরের সামনে চলে এসেছে তখন পেছনে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। ঘুরে দাঁড়াতেই কিরণরা দেখতে পায়, লম্বা লম্বা পায়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছেন মুকুটনাথ। দু'জনেই অবাক হয়ে যায়।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'তুমি !'

মুকুটনাথ বলেন, 'হ্যাঁ গুরুজি, আমাকে আসতে হ'ল।'

কাছাকাছি আসতেই দেখা যায়, মুকুটনাথের হাতে একটা ঢাউস তালা এবং চাবির গোছা। বশিষ্ঠনারায়ণ বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করেন, 'ওগুলো দিয়ে কী হবে ?'

কিরণকে দেখিয়ে নির্মম গলায় মুকুটনাথ বলেন, 'এই বজ্জাত মেয়েটাকে আটকে রাখতে হবে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ এবং কিরণ মুকুটনাথের মনোভাব বুঝতে পারছিল। কিন্তু কেউ কিছু বলে না।

মুকুটনাথ এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে দেন, 'আমরা সবাই শ্মশানে চলে যাব। সেই ফাঁকে এ যে পালিয়ে যাবে না, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। গুরুজি, ও আমার বিশ্বাস বিলকুল নষ্ট করে দিয়েছে।' কর্কশ গলায় কিরণকে বলেন, 'যা, অন্দর যা—'

কিরণ তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢোকে না। ভীরু গলায় বলে, 'আমিও শ্মশানে যাব।'

'শ্মশানে হাজারো আদমী আসবে। তাদের ঐ কালো মুখ আর দেখাতে হবে না। যা—' একরকম জোর ক'রেই ঘরের ভেতর কিরণকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে দেন মুকুটনাথ।

মুকুটনাথের চলে যাবার পর ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়েছিল কিরণ। একটা দুঃখ তার থেকেই গেল। মহেশ্বরীর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। চার ছ'মাস, বড়ো জোর বছরখানেক কি বছর দু'য়েকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটতই, কিন্তু তার গর্ভবতী হবার খবরটা প্রবল আঘাতে মহেশ্বরীর হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ অকেজো ক'রে দেয়। নিজে মহেশ্বরীর মৃত্যুর কারণ হয়ে যাওয়ায় খুবই কষ্ট পাচ্ছে কিরণ।

নিচে বোধহয় বিপুল সমারোহে শ্মশানযাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। লোকজনের হৈচৈ এবং শোকোচ্ছ্বাসের আওয়াজ ছাপিয়ে কীর্তনের আওয়াজ কানে আসছে। 'রাম নাম সত হ্যায়, রাম নাম সত হ্যায়।' ফাঁকে ফাঁকে ভরাট সুরেলা গলায় বশিষ্ঠনারায়ণের গীতাপাঠ শোনা যাচ্ছে।

একসময় নিজের অজান্তেই উঠে পড়ে কিরণ। পায়ে পায়ে পুব দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নিচের ফাঁকা জায়গাটা মানুষে বোঝাই। কখন যে দারোয়ানেরা ধরমপুরার বাসিন্দাদের জন্য গেট খুলে দিয়েছে, কে জানে।

শিউশঙ্করজির নতুন মন্দিরের চাতালে কীর্তনের দলটা বসে নিচু গলায় গেয়ে চলেছে; মন্দিরের উঁচু বারান্দায় গীতাপাঠ করছেন বশিষ্ঠনারায়ণ। নিচে এক ধারে মহেশ্বরীর শেষ যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট মেহগনির খাটটা ফুলে ফুলে সাজানো হচ্ছে। এদের মধ্যে খুবলালকে ভীষণ ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। মুকুটনাথ বা রেবতী মন্দিরে বা ফাঁকা জায়গায় কোথাও নেই। হয়ত ওঁরা মহেশ্বরীর নিষ্প্রাণ দেহটি ঘিরে বসে আছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অগুণতি শোকার্ত মানুষ দেখতে দেখতে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে

কিরণ। সে ওদের কেউ না। ছোঁয়াচে রোগীদের মতো তাকে সবার কাছ থেকে আলাদা ক'রে দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ হর্নের আওয়াজে চমকে গেটের দিকে তাকায় কিরণ। অত্যন্ত চেনা, পুরনো মডেলের একটা মোটর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সেটার ভেতর বসে আছেন ত্রিকূটনারায়ণ রোহিণী এবং হরীশ।

ষোল

শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী মহেশ্বরীর শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা করছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। কোথাও সামান্য ত্রুটি না থেকে যায়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে তাঁর। কুলগুরুর সামনেই দেহান্ত ঘটেছে মহেশ্বরীর। মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা যাতে সরাসরি স্বর্গে যেতে পারে সেদিকটা ত বশিষ্ঠকেই দেখতে হবে।

পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন মুকুটনাথ। তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। বিরাশি বছর বয়সে দেহান্ত ঘটল মহেশ্বরীর। একে কেউ অকালমৃত্যু বলবে না। তবু বাষট্টি বছরের প্রবীণ সন্তান মুকুটনাথ যে বিরামহীন চোখের জল ফেলছেন, এটা মহেশ্বরীর পক্ষে সৌভাগ্যের বলতে হবে। মায়ের মৃত্যুতে এই বয়সেও সত্যিই মুকুটনাথ অভিভূত। এটা লোকদেখানো নকল শোকোচ্ছ্বাস নয়।

শ্মশানযাত্রার তদারক করতে করতে মাঝে মাঝে মুকুটনাথকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। পরিপূর্ণ সুখের সংসার পেছনে ফেলে মহেশ্বরী এই যে স্বর্গযাত্রা করলেন, এটা কোনোভাবেই শোকাবহ ঘটনা নয়। মুকুটনাথ যেন দেহের নশ্বরতার কথা মনে রাখেন। শরীর একদিন না একদিন বিনষ্ট হবেই, কিন্তু পরমাত্মার বিনাশ নেই। মহেশ্বরীর আত্মা স্বর্গ থেকে চিরকাল তাঁর ধর্মনিষ্ঠ সন্তান মুকুটনাথের কল্যাণ ক'রে যাবে।

বশিষ্ঠনারায়ণের সান্ত্বনার কথাগুলো আবছাভাবে মুকুটনাথের কানে ঢুকছিল। তিনি যেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, ত্রিকূটনারায়ণ রোহিণী এবং হরীশকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। ওঁদের দেখামাত্র মায়ের মৃত্যুশোক পলকের জন্য ভুলে গেলেন তিনি, মনে পড়ে গেল কিরণের গর্ভবতী হবার কথা। এক ধরনের ভয় ঠাণ্ডা স্রোতের মতো তাঁর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল। কিরণের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে এঁদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, ভাবতেও সাহস হয় না মুকুটনাথের। টাকার জোরে খুনখারাপি পর্যন্ত চাপা

দেওয়া যায় কিন্তু কিরণ যে মারাত্মক কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসেছে তা ঢেকে রাখা অসম্ভব। পারার ঘায়ের মতো তা ফুটে বেরুবেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকলজ্জা মান-সম্মানের ভয়। খবরটা জানামাত্র চারিদিকে ঢিঢি পড়ে যাবে। যে মিশ্র বংশ প্রবল দাপটে ধরমপুরায় কয়েক পুরুষ ধরে প্রায় রাজত্ব করছে, তার মর্যাদা মুহূর্তে চুরমার হয়ে যাবে। কোনোদিন তাঁরা আর এ শহরে মাথা তুলে হাঁটতে পারবেন না।

এলোমেলোভাবে মুকুটনাথ ভাবেন, হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়েটা ভেঙে দেবেন কিনা। পরক্ষণেই মনে হয়, সেটা আদৌ সম্ভব না। পনেরো বছর আগে যে বিয়ে স্থির আছে, যার জন্য কিরণকে দিল্লি পাঠিয়ে একটু একটু ক'রে তৈরি করা হয়েছে, এমন কি রোহিণী কিরণকে আশীর্বাদ পর্যন্ত ক'রে গেছেন—আচমকা সেটা খারিজ ক'রে দেবেন কোন অজুহাতে? তা ছাড়া ধরমপুরা কামতিগঞ্জ এবং এই দুই শহরের চারপাশের তাবত মানুষজন জেনে গেছে, কিরণ এবং হরীশের বিয়েটা হচ্ছেই। হঠাৎ তা ভেঙে দিতে চাইলে ত্রিকূটনারায়ণ রাজী হবেন কেন? চৌবেদের পারিবারিক মর্যাদাও এই বিয়ের সঙ্গে জড়িত।

মুকুটনাথ ভাবেন, এ অঞ্চলে ত্রিকূটনারায়ণদের প্রভাব প্রতিপত্তি বা টাকার জোর তাঁদের চেয়ে এতটুকু কম নয়। চৌবেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও যথেষ্ট। তাঁদের যে বিপুল পরিমাণে জমি বেনামা করা আছে, ত্রিকূটনারায়ণের তা অজানা নয়। ওঁরা ইচ্ছা করলে তাঁকে ঘোর বিপদে ফেলতে পারেন। ঘরের কাছে এমন প্রবল শত্রু তৈরি করার মানে হয় না।

তা হ'লে কিরণ যে ভয়ঙ্কর জটটা পাকিয়ে ফেলেছে তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কীভাবে? মস্তিষ্কে সব কিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায় মুকুটনাথের।

এতক্ষণে ত্রিকূটনারায়ণরা কাছে চলে এসেছেন। শোকের পরিবেশে যেমনটি মানায় তাঁদের চোখেমুখে অবিকল সেই ধরনের বিষাদ মাখানো। ত্রিকূটনারায়ণ দু'হাতে মুকুটনাথের একটা হাত জড়িয়ে ধরেন। ভারী গলার বলেন, 'মা'জি যে এভাবে চলে যাবেন, আমরা ভাবতেই পারিনি। খবরটা যখন পেলাম, বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

ভয়ে এবং আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ভয়ানক কাঁপছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন মুকুটনাথ। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু গলার স্বর ফোটে না।

ত্রিকূটনারায়ণের মনে হয়, মায়ের মৃত্যুতে মুকুটনাথ এমনই বিহ্বল যে কথা

বলার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন, 'এত ভেঙে পড়বেন না মুকুটজি, মা-বাপ কারো চিরকাল থাকে না।'

মুকুটনাথ উত্তর দেন না।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার বলেন, 'পরশুদিনও মা'জিকে দেখে গেছি। কত হাসি-খুশি দেখাচ্ছিল। বললেন, কিরণ আর হরীশের শাদিতে খুব আনন্দ করবেন। আচানক কী এমন হ'ল যে উনি চলে গেলেন!'

মুকুটনাথ কিছু বলার আগে পাশ থেকে বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ওঠেন, 'সবই শিউশঙ্করজির মর্জি। কখন কার ডাক আসবে, আগে কি কেউ বলতে পারে! এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, কে জানে পাঁচ মিনিটের ভেতর আমার দেহান্ত হবে কিনা। জনম আর মৌত, দু'টোই ওঁর হাতে।' বলে আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দেন।

এ বিষয়ে ত্রিকূটনারায়ণেরও সম্পূর্ণ সায় রয়েছে। তিনি বলেন, 'ও তো সহী বাত। ভগোয়ানের লীলা কে বুঝবে?'

এইসব উচ্চাঙ্গের কথাবার্তার মধ্যে রোহিণী বলেন, 'মাকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

এতক্ষণে যেন গলার স্বর ফোটে মুকুটনাথের। তিনি জানান, মহেশ্বরীর নশ্বর দেহ এখনও তাঁর ঘরেই আছে। রেবতী মৃতদেহের কাছে বসে আছেন, এ খবরটা দিয়ে তিনি বলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বরীর ঘরে চলে আসেন মুকুটনাথ।

মহেশ্বরীর নিষ্প্রাণ দেহ ঘিরে শুধু রেবতীই নন, আরো কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। এরা সবাই মিশ্রদের আত্মীয়স্বজন এবং ধরমপুরা শহরের বড়ো বড়ো বংশের লোকজন। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ওরা ছুটে এসেছে।

রেবতী সমানে কাঁদছেন, তাঁর পাশে বসে সুষমাও। আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ কাঁদছে, অন্যরা বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে।

রোহিণী রেবতীর পাশে গিয়ে বসেন। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ভারী কাঁপা গলায় সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

হরীশ চুরাশি বছরের বুড়ি ভাবী দিদিশাশুড়ির মৃত্যুতে যে ভয়ানক দুঃখ পেয়েছে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই, যদিও গোলাকার মাংসল মুখে সে একটা নকল শোক ফুটিয়ে রেখেছে। খাটে শায়িত মহেশ্বরীর শরীর, চারপাশের শোককাতর মানুষজন, তাদের কারো দিকেই নজর নেই হরীশের। তার দুই চোখ

অস্থিরভাবে প্রকাণ্ড ঘরটার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় একজনকেই শুধু খুঁজে চলেছে। সে কিরণ।

শুধু রোহিণীই না, ত্রিকূটনারায়ণও কোমল স্বরে রেবতীকে সহানুভূতি জানান। বলেন, এই দুঃখের সময় এত অভিভূত হ'য়ে পড়লে চলবে না। মা'জি অর্থাৎ মহেশ্বরী নেই, এখন থেকে মিশ্র বংশের অনেক দায় রেবতীকে নিতে হবে। তিনি যদি এত কাতর হয়ে পড়েন, সংসার কে দেখবে? ইত্যাদি।

সান্ত্বনায় কিছু কাজ হয়। শোকোচ্ছ্বাস কমে এলে রেবতী ভাঙা-ভাঙা জড়ানো গলায় বলেন, 'পাঁচ বছর বয়সে নিজের মাকে হারিয়েছি। দশ বছর বয়সে বিয়ের পর 'মিশ্র নিকেত'-এ এসেছিলাম। তখন থেকে শাশুড়িই ছিলেন আমার মা। তিনি আজ চলে গেলেন। মা'র মমতা এ জীবনে আর কখনও পাবো না।'

বহুকালের প্রাচীন সেই বাক্যটি আরেক বার নতুন করে শুনিয়ে দেন রোহিণী, 'মা-বাপ কি চিরদিন সবার থাকে? একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে সবাইকে চলে যেতে হয়।'

আস্তে-আস্তে মাথা নাড়েন রেবতী, 'তা ত ঠিকই বহেনজি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যায় রোহিণীর। দ্রুত চারপাশ একবার দেখে নিয়ে তিনি বলেন, 'কিরণকে ত দেখছি না!'

স্বাভাবিক কারণেই যে কিরণের প্রসঙ্গ এসে পড়বে, এটা আগে ভাবেননি রেবতী। প্রথমটা চমকে ওঠেন তিনি, তারপর কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর মুখ মুকুটনাথের দিকে ঘুরে যায়। কী উত্তর দেবেন, বুঝতে না পেরে তিনি স্বামীর দিকে তাকান।

আবহাওয়াটা মুকুটনাথের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। বিব্রত মুখে তিনি বলেন, 'ও ওপরে আছে।'

শোকাচ্ছন্ন এই বাড়িতে মহেশ্বরীর মৃতদেহ ঘিরে যেখানে তাঁর প্রিয়জনেরা বসে বা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কিরণের না থাকাটা বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। যে সম্ভাবনাটা সবার আগে মনে পড়ার কথা সেটা প্রশ্নের আকারে বেরিয়ে এল ত্রিকূটনারায়ণের মুখ থেকে, 'কিরণের শরীর কি ভাল নেই?'

শোকের আসরে কিরণের উপস্থিত না-থাকার একটা উপযুক্ত কারণ খুঁজছিলেন মুকুটনাথ। নিজের অজান্তেই সেটা হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়েছেন ত্রিকূটনারায়ণ। মুকুটনাথ বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ। তার ওপর ঠাকুমার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছে।'

গলার ভেতর সহানুভূতিসূচক একটু শব্দ করেন ত্রিকূটনারায়ণ। রোহিণীও আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তবে হরীশের ইচ্ছা হচ্ছিল, এই মুহূর্তে দোতলায় কিরণের কাছে চলে যায়। কিন্তু সেটা বেজায় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠবে ব'লে ইচ্ছেটাকে প্রাণপণে দমিয়ে রাখতে হয়।

এরপর কিরণের বিষয়ে কেউ আর কিছু বলেন না। মহেশ্বরীকে ঘিরেই যাবতীয় আলোচনা চলতে থাকে। সাত বছর বয়সে কুলবধূ হ'য়ে মিশ্র-'নিকেত'-এ এসেছিলেন তিনি। তারপর পঁচাত্তর বছর এখানেই কাটিয়ে দিলেন। তাঁর মতো পুণ্যবতী ধার্মিক মহিলা এই ঘোর কলিযুগে ক্বচিৎ চোখে পড়ে। তিনি শ্বশুরকুলকে ত বটেই, এই ধরমপুরা টাউনকেও পবিত্র করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এই শহর এক কথায় মাতৃহারা হ'ল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে নতুন দামী খাটে মহেশ্বরীকে শুইয়ে সোজা শিউ-শঙ্করজির মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। রেবতী নিজের হাতে শাশুড়িকে নতুন তসরের থান পরিয়ে দেন। ফুলে এবং মালায় তাঁর সমস্ত শরীর ঢাকা। মুখ-খানাই যা শুধু বেরিয়ে আছে।

পবিত্র শাক্যদ্বীপি মিশ্র বংশের মৃতদেহ বা তার খাট ছোঁয়ার অধিকার কোনো অব্রাহ্মণের নেই। স্থির হয়েছে মহেশ্বরীকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাবেন স্বয়ং মুকুটনাথ, ত্রিকূটনারারণ এবং ধরমপুরা টাউনের দুবে চৌবে এবং পাণ্ডে পদবীধারী কয়েকজন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ আগে আগে মন্ত্রপাঠ করতে করতে যাবেন। সবার আগে থাকবে পেশাদার কীর্তনের দল। 'রাম নাম সত হ্যায়' —গাইতে গাইতে তারা মহেশ্বরীর স্বর্গযাত্রার রাস্তাটি একেবারে নিষ্কণ্টক করে দেবে।

মহেশ্বরীর শববাহকদের পেছনে থাকবে বর্ণ অনুসারে ধরমপুরার বাসিন্দারা। প্রথমে ব্রাহ্মণ, তারপর কায়াথ, ক্ষত্রিয়, এবং সবার শেষে দোসাদ গঞ্জু ধাঙড় গাঙ্গোতা, ইত্যাদি।

শ্মশানঘাট 'মিশ্র নিকেত' থেকে মাইল আড়াই দূরে, একটা মজা নদীর পাড়ে। এতটা দূরে একটা মৃতদেহ কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যাওয়া ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার। খুবলাল একবার বলেছিল, ট্রাকে ক'রে মহেশ্বরীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু এক কথায় এই পরিকল্পনা খারিজ ক'রে দিয়েছেন মুকুটনাথ। 'মিশ্র নিকেত'-এর সবচেয়ে বর্ষীয়সী এবং সবচেয়ে পুণ্যবতী মহিলা, বিশেষ ক'রে স্বয়ং মুকুটনাথের

মা'কে ট্রাকে চাপিয়ে হুস ক'রে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা কোনোভাবেই কাম্য হ'তে পারে না। চিরকাল এ বাড়ির লোকজনকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে, দামী পালঙ্কে শুইয়ে, গোটা শহরকে জানিয়ে তবেই না শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ ভাল ক'রে বুঝবে না, জানবে না, তার আগেই মহেশ্বরী শ্মশানে পৌঁছে যাবেন, তা কি কখনও হতে পারে! মিশ্র বংশের সঙ্গে সমারোহ কথাটা ব্যাপকভাবে জড়িয়ে আছে। তা সে জন্মই হোক, শিশুর প্রথম অন্ন গ্রহণই হোক, বিয়ে বা মৃত্যুই ঘটুক। মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় মহেশ্বরীকে শ্মশানে না নিয়ে গেলে এই বংশের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে না।

একসময় রেবতী সুষ্মা আত্মীয়স্বজন রোহিণী বাড়ির নৌকর নৌকরানী এবং ধরমপুরাবাসীদের শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে শ্মশানযাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে আত্মীয়দের সঙ্গে মায়ের খাটে কাঁধ দেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণও খাটের অন্য প্রান্ত কাঁধে তুলে নেন।

'মিশ্র নিকেত' থেকে বেরুবার আগে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ঠিক সেই-ভাবেই সুশৃঙ্খল জনতা শবের পেছন পেছন চলতে থাকে। একেবারে সামনে টাঙ্গায় মাইক লাগিয়ে কীর্তনের দল একনাগাড়ে গাইতে থাকে :

'রামনাম—'

'সত হ্যায়।'

'রামনাম—'

'সত হ্যায়।'

ধরমপুরা শহরের মাঝখান দিয়ে শিরদাঁড়ার মতো সোজা একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। সেই পথ ধরেই শবযাত্রা এগিয়ে যেতে থাকে। দু'ধারের প্রতিটি বাড়ি-ঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে কাতারে কাতারে মানুষ চারিদিকে অলিগলি থেকে ছুটে আসতে থাকে। তাদের অনেকেই বুক চাপড়ে কাঁদছে। মহেশ্বরীর সঙ্গে এদের কোনো আত্মীয়তা নেই, নেই কোনোরকম রক্তের সম্পর্ক। এই শোক হ'ল আবহমান কাল ধরে মিশ্র বংশের প্রতি ধরমপুরাবাসীদের আনুগত্যের প্রকাশ।

কিছুক্ষণ মহেশ্বরীর খাট বয়ে নিয়ে যাবার পর শববাহকের ভূমিকা থেকে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণকে মুক্তি দেওয়া হয়। এবার মুকুটনাথের আত্মীয় এবং ধরমপুরার সৎ ব্রাহ্মণেরা মহেশ্বরীকে শ্মশানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেয়।

খাটের পেছন পেছন নিঃশব্দে খানিকটা হাঁটার পর চোখের কোণ দিয়ে একবার

ত্রিকূটনারায়ণের দিকে তাকান মুকুটনাথ। তাঁর জীবনে এত বড়ো একটা শোকাবহ ঘটনা যে ঘটে গেল, মহেশ্বরীকে এই যে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চারপাশে এত যে মানুষজন, একটানা কীর্তনের সুর—কিছুই যেন মুকুটনাথের মাথায় সেভাবে দাগ কাটছে না। ত্রিকূটনারায়ণদের দেখার পর থেকে যে দুশ্চিন্তা এবং ভয়টা শুরু হয়েছিল, সেটা যেন তাকে পেয়ে বসে। গর্ভবতী কিরণকে নিয়ে এখন তিনি কী করবেন ? তার পেটের ভ্রূণটার কথা ত্রিকূটনারায়ণরা জেনে ফেললে তার কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হবে, ভাবতেও সাহস হয় না। অথচ ব্যাপারটা এতই মারাত্মক যে কোনোভাবেই তা গোপন ক'রে রাখা সম্ভব না।

মুকুটনাথের ধাতটাই এমন যে মাথায় দুর্ভাবনা নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। মনে হয়, পাগল হ'য়ে যাবেন কিংবা প্রবল চাপে মস্তিষ্ক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যেভাবে হোক কিরণের বিষয়ে একটা চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। যা লুকিয়ে রাখা যাবে না, কাল হোক পরশু হোক ফুটে বেরুবেই, সে ব্যাপারে ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে নেওয়াই ভাল। হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে না হ'লে সেটা ভবিতব্য বলেই মেনে নেবেন। মুকুটনাথ পরজন্মের মতো অদৃষ্টেও ঘোর বিশ্বাসী। তাঁর কাছে ভাগ্য অপরিবর্তনীয়, কোনো মানুষের সাধ্য নেই তা বদলাতে পারে।

মুকুটনাথ মনস্থির ক'রে ফেলেন। 'যা হবার হবে—'এমন এক ভঙ্গিতে তিনি হঠাৎ ডাকেন, 'ত্রিকূটজি—'

অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ। হয়ত ভাবছিলেন, এই মহাগুরু-নিপাতের ফলে মিশ্রদের যে কালাশৌচ চলবে তাতে আগামী মাসখানেক হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। দুই বংশই আচার-নিয়ম নিষ্ঠাভরে মেনে চলে। কাজেই বিয়ের জন্য আরেকটা দিন ঠিক করতে হবে।

মুকুটনাথের ডাকে চমকে ওঠেন ত্রিকূটনারায়ণ। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'কিছু বলবেন ?'

'হ্যাঁ।' বলে চুপ করে যান মুকুটনাথ।

উৎসুক মুখে তাকিয়ে থাকেন ত্রিকূটনারায়ণ।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'কিরণের সঙ্গে হরীশের শাদির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

'কী কথা ?'

'মায়ের কাজটা চুকে যাবার পর বলব।'

'ঠিক আছে।'

এরপর আর কোনো কথা হয় না। 'রাম নাম সত হ্যায়' করতে করতে শব-যাত্রীরা এগিয়ে চলে।

বিপুল সমারোহে শ্রাদ্ধের কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলেন মুকুটনাথ। মিশ্র বংশের মহিমা যাতে বিন্দুমাত্র খাটো না হয় সেদিকে সতর্ক নজর ছিল তাঁর। আড়ম্বর বা জাঁকজমকে বিন্দুমাত্র খুঁত থাকতে দেননি। মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচশ' একজন সৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে স্বর্ণ, রজত, মূল্যবান বস্ত্র, নতুন বাসন, ঘৃত, মধু, এগারো রকমের ফল, ছাতি, খাট, খড়ম ইত্যাদির সঙ্গে একটি ক'রে সবৎসা গাভীও দান করেছেন। তা ছাড়া ধরমপুরার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে জল-অচল অচ্ছুত পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে কাছে দাঁড়িয়ে উৎকৃষ্ট ভোজন করিয়েছেন। এ শহরে ভিখারীরাও বঞ্চিত হয়নি। তাদেরও পরম সমাদরে ডেকে এনে আকণ্ঠ খাওয়ানো হয়েছে এবং মাথা পিছু পাঁচ টাকা ক'রে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে।

দান ধ্যান এবং সমারোহে এমন বিরাট আকারের পারলৌকিক ক্রিয়া ধরম-পুরাবাসীরা আগে আর কখনও চোখে দেখেনি। সবাই বলাবলি করেছে, মুকুটনাথ হচ্ছেন 'রাজা য্যায়সা আদমী'। রাজা না হ'লে এমন ব্যাপকভাবে মাতৃ-শ্রাদ্ধ কেউ করতে পারে?

সতেরো

শ্মশানঘাটে মহেশ্বরীর অন্তিম সংস্কার ক'রে আসার পরের দিন থেকে রোজই ভোরবেলা ত্রিকূটনারায়ণ এবং রোহিণী 'মিশ্র নিকেত'-এ চলে এসেছেন, কোনো কোনো দিন এসেছে হরীশ। সারাদিন এবং সন্ধ্যের পরও কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতেন।

মহেশ্বরীর পারলৌকিক কাজের সময়ও কিরণকে একবারও দেখা যায়নি। সে গুরুতর অসুস্থ, এই অজুহাতে তাকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণ কিছুটা উতলা হয়ে শয্যাশায়ী কিরণকে দেখতে চেয়েছেন। কিরণের জন্য হরীশ কী পরিমাণে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সেটা তার মুখচোখের চেহারা দেখেই আন্দাজ করা গেছে। কিন্তু ভাবী পত্নীকে দেখার কথাটা লজ্জায় সে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। মুকুটনাথ কাউকেই দেখা করতে দেননি। সবিনয়ে

জানিয়েছেন, ডাক্তার কিরণকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, সুস্থ হলেই কিরণ নিজে ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে দেখা করবে।

ত্রিকূটনারায়ণের মন ঘোর সংশয়ে ভরে যাচ্ছিল। ক'দিন আগেও কিরণকে পুরোপুরি সুস্থ দেখেছেন। হঠাৎ কী এমন হ'ল যে তার সঙ্গে দেখা করাও বারণ! গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা চাতুরি রয়েছে। মুকুটনাথরা কি হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে দিতে চান না! তাঁরা কি এই সম্পর্ক ভেঙে দেবেন?

এই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে পারলে সব দিক থেকেই ত্রিকূটনারায়ণ লাভবান হবেন। যৌতুকের এক শ' বিঘে জমি ত পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া মুকুটনাথের 'সাপোর্ট' পেলে পরের চুনাও-তে নির্ঘাত ভাল মার্জিনে যাবেন। সবার ওপর রয়েছে বংশের মর্যাদা। পনেরো বছর ধরে এ অঞ্চলের তাবত মানুষ জানে হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়েটা হচ্ছেই। হঠাৎ সেটা ভেঙে গেলে কারো কাছেই মুখ দেখানো যাবে না। কাজেই সব দিক থেকেই লাভজনক এই বিয়ে যেভাবে হোক ঘটাতেই হবে।

কাজেই শ্রাদ্ধশান্তির পরদিন আবার এলেন ত্রিকূটনারায়ণ। এ ক'দিন মুকুটনাথরা এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনার পরিবেশই ছিল না। কিন্তু আজ কিরণকে অসুস্থ ক'রে রাখার রহস্য তাঁকে জানতেই হবে। ত্রিকূটনারায়ণের ধারণা, কিরণের কিছুই হয়নি, সে সম্পূর্ণ সুস্থই আছে। তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না, কিরণকে এভাবে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখার কারণ কি থাকতে পারে।

আজ একাই এসেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। রোহিণী এবং হরীশ সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। তাদের আনেননি তিনি।

অনেকক্ষণ আগেই বিকেল হয়েছে। বেলা আর বেশি নেই। রোদের তাপ দ্রুত কমে যাচ্ছে। বহুদূরে পাতলা মলমলের মতো কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

নতুন শিউশঙ্করজির মন্দিরের চবুতরে মুকুটনাথ এবং কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ বসে ছিলেন। ত্রিকূটনারায়ণকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে মুকুটনাথ বলেন, 'আসুন ত্রিকূটজি, আসুন—'

ত্রিকূটনারায়ণ কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'মুকুটনাথজি, আপনার সঙ্গে আলাদা-ভাবে একটু কথা বলতে চাই।' বশিষ্ঠনারায়ণের উদ্দেশে হাতজোড় ক'রে বলেন, 'গুরুজি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। দশ মিনিটের ভেতর মুকুটজিকে ছেড়ে দেবো।'

বশিষ্ঠনারায়ণ হেসে বলেন, 'ঠিক হ্যায়।'

মুকুটনাথ উঠে পড়েন। ত্রিকূটনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে একতলার বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে বলেন, 'কথাটা নিশ্চয়ই গোপনীয়?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'হ্যাঁ। কিরণ আর হরীশের বিয়ের ব্যাপারে—'

মুকুটনাথ অবাক হ'ন না। তিনি যেন এর জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। বলেন, 'জানি। আমারও অনেক কথা আছে। আসুন।'

আঠারো

ত্রিকূটনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে একতলার বসার ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে মুকুটনাথ বলেন, 'বসুন ত্রিকূটজি।'

মুকুটনাথের আচরণে রীতিমত অবাকই হয়ে যান ত্রিকূটনারায়ণ। একটা সোফায় বসে তিনি চুপচাপ বিমূঢ়ের মতো ভাবী বেয়াই-এর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মুখোমুখি বসতে বসতে মুকুটনাথ বলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার গোপন কিছু কথা আছে। আমি চাই না, আমাদের আলোচনা কেউ শুনে ফেলুক।'

ত্রিকূটনারায়ণ লক্ষ করেন মুকুটনাথ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর অস্থিরতার কারণ আন্দাজ করতে না পেরে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের চাপা টেনসান অনুভব করতে থাকেন। বলেন, 'ঠিক আছে, কথাটা কী?'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'ত্রিকূটজি, যদি অপরাধ না নেন, আমি একটা অনুরোধ করব?'

'অপরাধ নেওয়ার প্রশ্নই নেই। আপনি বলুন।'

বলতে গিয়েও থেমে যান মুকুটনাথ। দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ পর কাঁপা গলায় শুরু করেন, 'আপনি হরীশের সঙ্গে অন্য মেয়ের বিয়ে দিন। যদি বলেন তো সদ্বংশের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে আমি যোগাড় করে দেবো।'

আচমকা এই ঘরে বাজ পড়লেও এতটা চমকে উঠতেন না ত্রিকূটনারায়ণ। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর বলেন, 'কী বলছেন মুকুটনাথজি! পনেরো বছর ধরে এ বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, পঞ্চাশ মাইলের ভেতর এ খবর কারো জানতে বাকি নেই। এখন এই বিয়ে ভেঙে অন্য জায়গায় হরীশের বিয়ে দিতে গেলে লোকের কাছে কী কৈফিয়ত দেব? আমার এক গালে চুনা, আরেক গালে কালি লেপে দেবে সবাই। আমাকে এভাবে বেইজ্জৎ করবেন না মুকুটনাথজি—'

মুকুটনাথ উত্তর দিলেন না। মুখ ঢেকে ধ্বংসস্তূপের মতো বসে রইলেন।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার বলেন, 'আরেকটা কথা ভেবে দেখছেন ?'

'কী ?'

'হরীশ পুরুষমানুষ। এ বিয়ে যদি কোনো কারণে না হয় তার একটা গতি হ'য়েই যাবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে কিরণের কী হাল হ'বে, সেটা বোধ হয় চিন্তা করেননি।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ঝাপসা গলায় মুকুটনাথ বলেন, 'সব দিক খুব ভাল ক'রে ভেবে দেখেছি। এক আধ দিন না, পুরো বারো চোদ্দ দিন। তারপর আপনাকে এসব বলছি। দুশ্চিন্তার চোদ্দটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি ত্রিকূটনাথজি।'

বিয়ে স্থির হয়ে আছে। মহেশ্বরীর মৃত্যুর কারণে যে কালাশৌচ চলছে, সে জন্য যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে যাবতীয় দোষ খণ্ডন করা হবে। তারপর শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলা হবে। আজ এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ কিন্তু মুকুটনাথের দিক থেকে এমন ভয়াবহ অনুরোধ আসবে, এ তিনি ভাবতেই পারেননি। এই বিয়ের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্মান ত বটেই, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ জড়িত। তা ছাড়া পুরো এক শ' একর উৎকৃষ্ট জমি যৌতুক হিসেবে যে পাওয়ার কথা, সেটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। মাথার ভেতর হঠাৎ যেন বিপর্যয় ঘটে যায় ত্রিকূটনারায়ণের। কিন্তু তিনি রাজনীতি-করা মানুষ। কখন নিজেকে ধীর এবং সংযত রাখা প্রয়োজন তা তিনি ভাল ক'রেই জানেন। ক্ষেপে উঠতে গিয়েও ধৈর্য হারান না। শান্ত গলায় বলেন, 'এই বিয়ে ভেঙে দিতে চান কেন ? কৃপা ক'রে কারণটা বলবেন ?'

দ্বিধান্বিতভাবে মাথা নাড়েন মুকুটনাথ। বলেন, 'হ্যাঁ, বলব। কারণটা আপনাকে জানানো দরকার। নইলে আমাকে ভুল বুঝবেন।'

ত্রিকূটনারায়ণ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

মুকুটনাথ বলেন, 'সে খুব লজ্জার কথা ত্রিকূটজি। যা ঘটেছে তা শোনার আগে কেন আমার মৃত্যু হ'ল না ?' বলতে বলতে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেন তিনি।

ত্রিকূটনারায়ণ দেখতে পান, গ্লানিতে দুঃখে অসীম যন্ত্রণায় একেবারে ভেঙেচুরে যাচ্ছেন মুকুটনাথ। কিছু না বলে তিনি তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন, এঁকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, নিজের থেকেই এবার সব খুলে বলবেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণ অপেক্ষা করতে থাকেন।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'লজ্জাটা আমার মেয়ে কিরণকে নিয়ে।'

বিয়ে ভেঙে দেবার কারণ যে কিরণ হ'তে পারে, এটা মাথায় আসেনি ত্রিকূটনারায়ণের। তিনি হকচকিয়ে যান, 'কী করেছে কিরণ?'

'সর্বনাশ করেছে ত্রিকূটজি—'বলেই আবার দু'হাতে মুখ ঢাকেন মুকুটনাথ এবং ভাঙা আবছা গলায় কিরণের গর্ভবতী হওয়ার খবরটা দিয়ে বলেন, 'এই জন্যে আমার মা হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন। সব জেনেশুনে কলঙ্কিনী মেয়েকে আপনাদের পবিত্র বংশে পুত্রবধূ ক'রে পাঠাতে চাই না। আমাদের বংশকে ও ত নরকে পাঠিয়েছেই, আপনাদেরও ক্ষতি হোক, এটা আমি কিছুতেই হতে দেবো না।'

প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের মতো প্রচণ্ড কিছু ত্রিকূটনারায়ণের সমস্ত অস্তিত্বে ভাঙচুর ঘটিয়ে দেয়। চিন্তা করার শক্তি একেবারে অসাড় হ'য়ে যায় তাঁর। স্তম্ভিত হ'য়ে বসে থাকেন তিনি।

মুকুটনাথ বলেন, 'আশা করি সব শোনার পর আমাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীতে দুশ্চরিত্র মেয়ের বাপ হওয়ার মতো মহাপাপ আর নেই।'

কিছুক্ষণের জন্য 'মিশ্র নিকেত'-এর এই ঘরটা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। দু'টি মানুষ শ্বাসরুদ্ধের মতো পরস্পরের মুখোমুখি বসে থাকে।

এক সময় গভীর শ্বাস টানার মতো শব্দ করে মুকুটনাথ ফের বলেন, 'আপনার কাছে একটা মিনতি আছে ত্রিকূটজি—' বলতে বলতে হাতজোড় ক'রে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন।

বিভ্রান্তের মতো মুকুটনাথের হাত দু'টি ধরে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'না না, ওভাবে বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমাকে কী করতে হবে বলুন—'

'আপনি আমার বন্ধু—'

'নিশ্চয়ই।'

'তা ছাড়া আমাদের দুই বংশের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্কে হ'তে যাচ্ছিল। কত আশা ছিল আমার। দুই বংশ এক হ'য়ে গেলে আমরা কী না করতে পারতাম। কিন্তু মেয়েটা একেবারে সত্যনাশ ক'রে দিল।'

ত্রিকূটনারায়ণ পলকহীন মুকুটনাথের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি উত্তর দিলেন না।

মুকুটনাথ থামেননি, 'আমার মতো আপনিও সন্তানের বাপ। আমার কষ্টটা নিশ্চয়ই বুঝবেন। কিরণ যা করেছে সেটা জানাজানি হ'লে আমাকে আত্মহত্যা

করতে হবে। আপনার ওপর আমার ভরসা আছে। দয়া ক'রে এই কলঙ্কের কথা গোপন রাখবেন। আমরা মৌত পর্যন্ত আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

ত্রিকূটনারায়ণ দূরদর্শী মানুষ। কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বহু দূরের একটি ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেই ছবিটির দিকে তাকিয়ে খুব আন্তরিক স্বরে তিনি বলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মুকুটনাথজি। কিরণ যেমন আপনার বেটি, তেমনি আমারও। আপনার ক্ষতি মানে আমারও ক্ষতি।'

আশ্বস্ত মুকুটনাথের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। গাঢ় গলায় তিনি বলেন, 'আমাকে বাঁচালেন।'

একটু চুপচাপ। তারপর ত্রিকূটনারায়ণ জিজ্ঞেস করেন, 'কিরণের এই খবরটা আর কে কে জানে?'

'আমার স্ত্রী, আমি, আমাদের গুরুজি আর আমার মা। মা ত চলেই গেলেন।'

'গুরুজি কারো সঙ্গে এ নিয়ে চর্চা করবেন না ত?'

'না না, ওঁর মতো হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের খুব কমই আছে।'

'খুব ভালো। এ সব পাঁচ কান না হওয়াই মঙ্গল। তবু তাঁকে কথাটা গোপন রাখতে বলবেন। সাবধানের মার নেই।'

'গুরুজিকে হুঁশিয়ার করার দরকার হবে না। কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন জানিয়ে রাখব।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'আমাদের সঙ্গে যে রিস্তেদারি হ'তে যাচ্ছিল সেটা এক্ষুণি ভেঙে দেবেন না। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

অবাক বিস্ময়ে ত্রিকূটনারায়ণকে লক্ষ করতে থাকেন মুকুটনাথ। ভেতরে ভেতরে তাঁর তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বলেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না ত্রিকূটজি।'

কী করেই বা বুঝবেন মুকুটনাথ? এই মুহূর্তে তিনি মানসিক দিক থেকে এমনই বিপর্যস্ত যে ত্রিকূটনারায়ণের মস্তিষ্কে দুরন্ত গতিতে যে সব সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলছে তা টের পাওয়ার মতো অবস্থাই তাঁর নেই।

এদিকে এক শ' একর উৎকৃষ্ট জমি, এম. এল. এ এবং মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন মিলিয়ে সুদূরপ্রসারী লোভনীয় অদৃশ্য যে চিত্রটি ত্রিকূটনারায়ণের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে স্নিগ্ধ গলায় তিনি বলেন, 'ছেলেমেয়েরা একটা ভুল

ক'রে বসলে তাদের ত ফেলে দেওয়া যায় না। ভুলটা শুধরে তাদের জীবনে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। এটাই মা-বাপের কর্তব্য।' একটু থেমে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করেন, 'জমানা বদলে গেছে মুকুটনাথজি। আমাদের কাল আর নেই। এখন মেয়েদের আর পর্দার আড়ালে রাখা যাচ্ছে না। বেঙ্গলে যান, মহারাষ্ট্রে যান, কেরালায় যান, গুজরাত, দিল্লি যেখানে যাবেন মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কো-এড কলেজে পড়ছে, অফিসে পাশাপাশি বসে কামকাজ করছে। এত ফ্রি-মিক্সিং হ'লে থোড়া কুছ এদিক সেদিক ত হবেই। সেটা মাথায় রেখে এখন আমাদের চলতে হবে। রাগের মাথায় কিছু করা যেমন ঠিক হবে না, তেমনি ভেঙে পড়লেও চলবে না।'

যত শোনেন ততই বিস্ময় বাড়তে থাকে মুকুটনাথের। তাঁদের মিশ্র বংশের মতোই ত্রিকূটনারায়ণরাও মারাত্মক গোঁড়া, মান্ধাতার বাপের আমলের যাবতীয় সংস্কার তাঁদের রক্তের মধ্যেও বয়ে চলেছে অব্যাহত ধারায়। হঠাৎ এই মানুষটির মুখে এমন প্রবল প্রগতিশীলতার কথা মুকুটনাথকে প্রায় বিপর্যস্ত ক'রে ফেলে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তা হ'লে আপনি এখন আমাকে কী করতে বলেন?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'এক, এক্ষুণি হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে ভেঙে দেবার কথা ভাববেন না। দুই, কিরণকে বেশি শাসন করার দরকার নেই। তবে তার ওপর নজর রাখবেন, যেন বাড়ি থেকে বেরুতে না পারে, আত্মহত্যা না ক'রে বসে।'

আত্মহত্যার যে একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, এটা আগে মাথায় আসেনি মুকুটনাথের। হঠাৎ তিনি অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে পড়েন। একে ত কুমারী মেয়ের গর্ভবতী হওয়াটা মারাত্মক দুর্ভাবনার কারণ। তার ওপব কিরণ যদি আত্মহত্যা ক'রে বসে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, ভাবা যায় না। এ সব কেসে পুলিশ টানা-হ্যাঁচড়া ক'রেই থাকে। তাদের মুখ বন্ধ করার কৌশল অবশ্য তাঁর জানা আছে। তবু অকারণ হুজ্জুতের মধ্যে গিয়ে কী লাভ? যা হবার তা ত হয়েই গেছে। নতুন ঝঞ্ঝাট যাতে না বাঁধে সেদিকে নজর রাখা দরকার। মুকুটনাথ বলেন, 'আপনি যা বললেন তাই হবে। কিরণকে আপাতত বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছি না। এখন থেকে সব সময় ওর কাছে একজন নৌকরানীকে রাখার ব্যবস্থা করব। এমন কি রাত্তিরেও সে কিরণের ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকবে। আর কিছু?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'নৌকরানীটা বিশ্বাসী ত?'

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে মুকুটনাথ বলেন, 'কিরণের একটা খাস নৌকরানী আছে।

ওর জন্যে ছোকরি জান দিতে পারে। ভাবছি ওকে বদলে অন্য নৌকরানী দেবো। ভালো হবে না?'

'হ্যাঁ।'

'আর কী করতে হবে?'

'এখন আর কিছু করতে হবে না। আমাকে দু-একটা দিন ভাবতে দিন, একটা না একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই।'

মায়ের মৃত্যু এবং মেয়ের কেলেঙ্কারিতে মুকুটনাথ এতই বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন যে স্বাধীনভাবে কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব না। ত্রিকূট-নারায়ণ যেভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাতে তিনি অভিভূত। তাঁর ধারণা ছিল কিরণের গর্ভবতী হওয়ার কথা শুনেই তাঁর মুখে থুতু ছিটিয়ে অপরিসীম ঘৃণায় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বড়ো সহৃদয় ব্যবহারই পাওয়া গেল। ত্রিকূটনারায়ণের সহানুভূতি এবং উদারতায় তিনি মুগ্ধ। এই মানুষটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ত্রিকূটনারায়ণ আস্তে আস্তে উঠে পড়েন। বলেন, 'আজ চলি। কাল আর পরশু বাদ দিয়ে একেবারে তরশু আবার আসছি। এর ভেতর যদি কোনো গোল-মাল হয়, আমাকে খবর দেবেন।'

'আচ্ছা—' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন মুকুটনাথ।

কথা বলতে বলতে ওঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিজের পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়িটায় ওঠার আগে মুকুটনাথের কাঁধে একটা হাত রেখে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'দুশ্চিন্তা ক'রে শরীর খারাপ করবেন না। আগেই যদি কিরণের ব্যাপারটা আমাকে জানাতেন, মা'জিকে এভাবে হারাতে হ'ত না। সবই ভাগ্য। যাই হোক, যা হাওয়ার তা ত হয়েই গেছে। এখন থেকে আপনার ভাবনা আমার। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।'

গভীর আবেগে ত্রিকূটনারায়ণের দুই হাত জড়িয়ে ধরেন মুকুটনাথ। তাঁর চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একটু পরে দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসেন ত্রিকূটনারায়ণ।

ত্রিকূটনারায়ণকে বিদায় দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে আসেন মুকুটনাথ। রেবতীকে এখন তাঁর খুব প্রয়োজন। এ ক'দিন কিরণের সমস্যাটা তাঁকে যেন একটা বায়ুশূন্য অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল,

কোনোদিন আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলায় আলো দেখতে পেয়েছেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণ যখন ভরসা দিয়েছেন, সুরাহা কিছু একটা হয়ে যাবেই। এই বিষয়েই রেবতীর সঙ্গে জরুরি আলোচনা করতে হবে।

দোতলার টানা বারান্দার শেষ মাথায় অনেকগুলো পাখির খাঁচা ঝুলছে। রোজ এই সময়টা রেবতী পাখিদের দানা খাওয়ান। শীত গ্রীষ্ম বারো মাস, কখনই এই নিয়মের হেরফের হওয়ার উপায় নেই।

আজও যথারীতি রেবতীকে পাখির খাঁচাগুলোর কাছে দেখা গেল। কাছাকাছি এসে মুকুটনাথ বলেন, 'আমার সঙ্গে এসো।'

মুকুটনাথ যে ত্রিকূটনারায়ণকে নিয়ে নিচের বসার ঘরে ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়েছেন, রেবতী তা জানেন। দু'জনের ভেতর এতটা সময় কী নিয়ে কথা হয়েছে সেটাও তাঁর অজানা নয়। নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছেন মুকুটনাথ।

উদ্বিগ্ন মুখে স্বামীর দিকে তাকান রেবতী। কিন্তু মুকুটনাথকে দেখে মনে হয় না তাঁর মধ্যে কোনোরকম ভয় দুর্ভাবনা বা টেনসান রয়েছে। এই ক'দিন তাঁকে কেউ ভেঙে গুঁড়িয়ে একেবারে চুরমার ক'রে দিয়েছিল যেন। আজ তাঁকে বেশ সতেজ এবং ভারমুক্ত দেখায়। রেবতীর উৎকণ্ঠা অনেকটা কেটে যায়।

একটু পর মুকুটনাথের পেছন পেছন নিজেদের শোওয়ার ঘরে চলে আসেন রেবতী। বিশাল ঘরখানার একধারে পুরনো আমলের ক'টি সোফা আর ডিভান রয়েছে। দু'জনে সোফায় মুখোমুখি বসলেন।

রেবতী জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সঙ্গে ত্রিকূটনারায়ণজির কী কথা হ'ল ?'

মুকুটনাথ তাঁদের আলোচনার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে গেলেন, একটি শব্দও বাদ দিলেন না।

সব শুনে কৃতজ্ঞ রেবতী হাতজোড় ক'রে কপালে ঠেকান। গভীর গলায় বলেন, 'সবই শিউশঙ্করজির কৃপা।' একটু থেমে বলেন, 'ত্রিকূটজির মতো মানুষ হয় না। শিউশঙ্করজি তাঁর কল্যাণ করবেন। তোমার কী মনে হয়, সব জানার পর ত্রিকূটজি হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়েতে রাজী হবেন ?'

মুকুটনাথ বলেন, 'আমার ত তা-ই মনে হয়। অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। আপত্তি থাকলে বিয়েটা নিশ্চয়ই ভেঙে দিতেন।'

'ওদের সঙ্গে রিস্তেদারিটা যদি শেষ পর্যন্ত হয়ে যায়, সেটা আমাদের সৌভাগ্য।'

'দেখা যাক।'

'এখন তা হ'লে আমাদের কী করতে হবে ?'

ত্রিকূটনারায়ণ কিরণের ব্যাপারে যে কর্মসূচি ঠিক ক'রে দিয়েছেন সেটা জানিয়ে দেন মুকুটনাথ।

একটু চিন্তা করে রেবতী বলেন, 'সরসতীয়াকে কিরণের ঘরে পাঠিয়ে দিই। সে ওর ওপর নজর রাখবে।'

সরসতীয়া মাঝবয়সী জবরদস্ত নৌকরানী। যেমন কর্মঠ তেমনি বিশ্বাসী। অনেক দিন 'মিশ্র নিকেত'-এ আছে। তিন কুলে কেউ নেই তার, মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে যাবে। মুকুটনাথ এবং রেবতী বললে সে চোখ বুজে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। এ জন্য একবারও ভাববে না, একটা প্রশ্নও করবে না।

মুকুটনাথ বলেন, 'সেই ভালো। কিন্তু কিরণের নৌকরানী সাগিয়ার কী হবে ?'

'ওকে গম পেষাইয়ের কাজে লাগিয়ে দেবো।'

'ঠিক আছে। সরসতীয়াকে ডাকো।'

রেবতী ঘর থেকে বেরিয়ে সরসতীয়াকে ডেকে আনেন। কীভাবে সারাক্ষণ কিরণের গতিবিধির ওপর নজরদারি কবরে, সব বুঝিয়ে দেন দু'জনে। এমন কি রাত্তিরেও তাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কিরণ যাতে না পালায়, বাইরের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে বা চরম হতাশায় আত্মহত্যা না ক'রে বসে—এ সব দিকে তাকে লক্ষ রাখতে হবে।

সরসতীয়া ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'সমঝ গিয়া।' ব'লে রেবতীর কাছ থেকে কিরণের ঘরের চাবি নিয়ে চলে যায়। এ ক'দিন তাকে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।

সরসতীয়ার হাতে কিরণের দায়িত্ব দেওয়ার পর অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে যান রেবতী। বলেন, 'এবার কী করব ?'

'এখন আমাদের আর কিছু করার নেই। বুধবার ত্রিকূটজি আসবেন। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

উনিশ

কথামতো বুধবারই বিকেলের দিকে চলে এলেন ত্রিকূটনারায়ণ। বলেন, 'প্রবলেমটার বিলকুল সমাধান বের ক'রে ফেলেছি। আর চিন্তা নেই।'

গভীর আগ্রহে মুকুটনাথ বলেন, 'কী সমাধান ?'

'সব বলব। তার আগে গুরুজি আর ভাবীজির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ঠিক আছে। এখনই ওদের ডাকছি।'

কিছুক্ষণ পর দোতলার মুকুটনাথের শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে পরামর্শ সভা বসে। ত্রিকূটনারায়ণকে সামনে রেখে তাঁর মুখোমুখি বসেন রেবতী বশিষ্ঠ-নারায়ণ এবং মুকুটনাথ।

বশিষ্ঠনারায়ণ মুকুটনাথের কুলগুরু হওয়ার সুবাদে তাঁর ভাবী বেয়াইকে তুমি ক'রে বলেন। তিনি বললেন, 'কী বলবে বল। কিরণের ব্যাপারে আমরা ত কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না।'

ষড়যন্ত্রকারীর মতো চাপা গলায় এবার নিজের সমাধান-সূত্রটি জানিয়ে ত্রিকূট-নারায়ণ বলেন, 'এ ছাড়া আর ত কোনো উপায় দেখছি না। আপনারা কী বলেন ?'

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো চুপচাপ বসে থাকে বাকি তিনজন। তারপর বশিষ্ঠনারায়ণ আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার মনে হয়, এর চেয়ে ভালো সুরাহা আর হয় না। তোমাদের কী মত ?' বলে রেবতী এবং মুকুটনাথের দিকে তাকান।

রেবতী মুখ নিচু করে বসে আছেন, তিনি উত্তর দেন না। বশিষ্ঠনারায়ণের মতো গোঁড়া প্রাচীন মানুষ যে এতটা সংস্কার মুক্ত হয়ে উঠতে পারেন, এটা ভাবতে পারেননি মুকুটনাথ। দ্বিধান্বিতভাবে তিনি বলেন, 'কিন্তু গুরুজি, আমাদের বংশে এমন কাজ কেউ কখনও করেনি। মহাপাপ হবে না ত ?'

বশিষ্ঠনারায়ণ প্রগতিবাদী সোসাল রিফর্মারদের মতো উদারভাবে জানান, জমানা বদলে গেছে। পুরনো সংস্কার ধরে বসে থাকলে চলে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অদলবদল মেনে নিতে হয়। জগতে কোনো কিছুই অনড় বা অপরি-বর্তনীয় নয়।

কুলগুরুর কাছ থেকে জোরালো সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও খুঁত খুঁত করতে থাকেন মুকুটনাথ। তিনি বলেন, 'মা বেঁচে থাকলে কিছুতেই এতে রাজী হতেন না।

'আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতাম। বংশের সুনাম সম্মান রক্ষা করতে হ'লে ত্রিকূট যা বলছে সেটাই একমাত্র পথ। চিন্তা কোরো না। পাপ যাতে না ঘটে, সে জন্যে যাগযজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। আমি তার ব্যবস্থা করব। ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

নিরুপায় মুকুটনাথকে শেষ পর্যন্ত রাজী হ'তে হয়।

এরপর ক'টা দিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। এর মধ্যে সকাল বিকেল দু'বেলা রোজ 'মিশ্র নিকেত'-এ এসে মুকুটনাথদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। তাঁদের আলোচনার বিষয়টা এত গোপন রাখা হয়েছে যে কাকপক্ষী পর্যন্ত টের পায়নি। একদিন মুকুটনাথ তাঁকে নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন অনেকটা রাত ক'রে। মিশ্র বংশ ঘিরে যে মারাত্মক সমস্যা ঘনিয়ে এসেছে, এ সব যে তারই জন্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আজ সন্ধ্যের পর রেবতী সোজা কিরণের ঘরে চলে আসেন। ত্রিকূটনারায়ণের কথামতো ক'দিন ধরে তার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করছেন রেবতীরা। মিশ্র বংশকে নরকে ডোবানোর জন্য যে গর্হিত কাজটি সে করেছে সে সম্পর্কে কেউ একটি কথাও বলেনি তাকে। অবশ্য সরসতীয়া শিকারী কুকুরের মতো সর্বক্ষণ তাকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে।

রেবতী বলেন, 'আমার সঙ্গে তোকে এক জায়গায় যেতে হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।'

জীবনে কখনও মা তাকে কোথাও নিয়ে গেছেন কিনা, কিরণ মনে করতে পারে না। প্রথমটা সে অবাক হ'য়ে যায়। তারপর বলে, 'কোথায় যাব আমরা?'

'গেলেই বুঝতে পারবি।'

যদিও মা-বাবা ইদানীং সদয় ব্যবহার করছেন, তবু সাগিয়াকে সরিয়ে সরসতীয়াকে তার দেখাশোনা করার জন্য পাঠানোয় কিরণ খুব সন্দিগ্ধ। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো চতুর পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা যে কী, ধরা যাচ্ছে না। সংশয়ের গলায় কিরণ জিজ্ঞেস্ করে, 'আর কে যাচ্ছে?'

রেবতী বলেন, 'আর কেউ না।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না কিরণ। দ্বিধার সঙ্গে খানিকটা কৌতূহলও সে বোধ করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর পোশাক বদলে মায়ের সঙ্গে নিচে নেমে আসে কিরণ। সেখানে একটা ফীটন দাঁড়িয়ে আছে। ফীটনটা তাদের নয়, আগে কখনও দেখেনি।

খানিক দূরে শিউশঙ্করজির নতুন মন্দিরের চাতালে একা বসে আছেন বশিষ্ঠ-নারায়ণ। মুকুটনাথকে ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে ক'টা নৌকর নৌকরানী এধারে ওধারে ছোটাছুটি ক'রে কাজকর্ম করছে।

রেবতী বলেন, 'উঠে পড়।'

কোচোয়ান ফীটনের মাথায় বসে ছিল, রেবতী এবং কিরণ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে

ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকার। একটু পর গাড়িটা গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

গোটা ব্যাপারটা কিরণের কাছে অদ্ভুত রহস্যময় মনে হয়। 'মিশ্র নিকেত'-এর মেয়েরা নৌকর নৌকরানী বা বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে ছাড়া এক পা-ও বেরোয় না। বিশেষ ক'রে রেবতী একা একা বাইরে যাবার কথা ভাবতেও পারেন না। কী এমন ঘটল যাতে কিরণকে নিয়ে তাঁকে এভাবে বেরুতে হচ্ছে! হঠাৎ ভয়ে এবং উদ্বেগে কিরণের শ্বাস আটকে আসে। সে ভীত চোখে রেবতীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা, আমাদের সঙ্গে আর ত কেউ এল না!'

'কে আসবে?' রেবতী জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। মুখ না ফিরিয়েই কথাটা বললেন।

'বাবুজি খুবলালজি কি কোনো নৌকর।'

'ওদের কারো আসার দরকার নেই।'

'কিন্তু চিরকাল রাস্তায় বেরুলে কেউ না কেউ সঙ্গে ত থাকেই।'

'চিরকাল থাকে বলে আজও থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।'

কিরণ নিরুৎসুক স্বরে বলে, 'কী ব্যাপার? আমরা এভাবে কোথায় যাচ্ছি? আর কেনই বা যাচ্ছি?'

'তখনই ত বললাম, গেলেই বুঝতে পারবি।'

কিরণ আবার কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন রেবতী। বলেন, 'এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়। চুপ করে বসে থাক।' তাঁর গলার স্বর নীরস এবং রুক্ষ।

কিরণ রেবতীর দিকে তাকিয়েই ছিল। তিনি জানালার বাইরে থেকে এখনও মুখ ফেরাননি। কিরণ লক্ষ করল, মা'র মুখ পাথরের মতো শক্ত। যে রেবতী কোনো দিন কাউকে কড়া কথা বলেননি, বাড়িতে যাঁর অস্তিত্ব প্রায় বোঝাই যায় না, তাঁকে এই মুহূর্তে ভয়ানক কঠোর মনে হচ্ছে। কিরণ আর কোনো প্রশ্ন করে না, নিঃশব্দে দুর্জ্ঞেয় ভবিতব্যের জন্য ফীটনের এক কোণে বসে থাকে।

'মিশ্র নিকেত' থেকে বেরিয়ে গাড়িটা নানা রাস্তা ঘুরে ঘুরে কোথায় চলেছে কে জানে। ধ্রমপুরা এমনিতে খুবই নগণ্য শহর। এখানকার জীবনযাত্রা ঢিমে তালে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। দিনের বেলাটা তবু মোটামুটি সরগরম থাকে কিন্তু সন্ধের পর শহর একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। রাস্তায় লোকজন কমে যায়। ক্বচিৎ

দু'চারটে গৈয়া গাড়ি কি টাঙ্গা বা সাইকেল রিকশা এমন অলস ভঙ্গিতে চলতে থাকে, মনে হয় জগতের কোনো ব্যাপারেই তাদের আদৌ তাড়া নেই।

শহরে জমজমাট পাড়াগুলো ছাড়িয়ে ফীটনটা কখন যে দক্ষিণ দিকের নির্জন এলাকায় চলে এসেছিল, কিরণের খেয়াল নেই। এখানে নতুন মহল্লা গড়ে উঠছে। দু-চারটে আনকোরা বাড়ি এধারে-ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, ঝোপঝাড়, গাছপালা। একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ির দূরত্ব অনেকখানি। এই অঞ্চলের রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো নেই। রাত্তিরে জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে হয়ে যায়। মনুষ্যজগতের সঙ্গে এই জায়গাটার যেন কোনো সম্পর্ক নেই।

এখানে তাকে কী কারণে নিয়ে আসা হয়েছে, কিরণ বুঝতে পারে না। তার ভয়টা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। উদ্বেগের চাপে বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে ব'লে মনে হয়।

একটা বাড়ির সামনে এসে ফীটন দাঁড়িয়ে পড়ে। কোচোয়ান নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'আ গিয়া মা'জি। উতারিয়ে—'

গাড়ির ভেতর ছোট কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। তার টিমটিমে আলোয় হঠাৎ কিরণ দেখতে পায়, মা'র দুই চোখ থেকে জলের ধারা গালের ওপর বয়ে যাচ্ছে। সে চমকে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে মা'র কঠোর ব্যবহারের সঙ্গে এই নীরব অশ্রুপাত কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। অজানা আশঙ্কায় শ্বাস আটকে আসে কিরণের।

কোচোয়ানের গলা শুনে শশব্যস্তে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে ভারী গলায় রেবতী মেয়েকে বলেন, 'নেমে আয়।'

কিরণ একবার ভাবে, কিছুতেই নামবে না। 'এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসার অর্থ কী?' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সে থমকে যায়। কোনো অলৌকিক শক্তি এক হাতে তার কণ্ঠনলী টিপে রেখে একটি শব্দও বেরুতে দেয় না, আরেক হাতে প্রবল ধাক্কায় ফীটন থেকে তাকে নামিয়ে দেয়।

বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। মাঝখানে ঝকঝকে নতুন দোতলা, চারপাশে ফুল এবং ফলের বাগান।

রাস্তায় আলো না থাকায় এখানে অন্ধকার অনেক বেশি গাঢ়। চারিদিকে অগুনতি জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। মাটির অতল থেকে উঠে আসছে

ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ। দূর থেকে শিয়াল এবং কাছাকাছি কোনো গাছের কোটর থেকে প্যাঁচাদের কর্কশ ডাক ভেসে আসছে।

ফীটনটা এসে দাঁড়িয়েছিল পোর্টিকোর তলায়। সেখানে অবশ্য আলো জ্বলছে। কিন্তু ধরমপুরায় বিজলির ভোল্টেজ এত কম যে, যত পাওয়ারের বাল্বই জ্বালানো হোক, আলোর তেজই হয় না।

পোর্টিকো থেকে আট দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে তবে মূল বাড়িটা। মা'র সঙ্গে নিচে নামতেই হতবাক কিরণ দেখতে পায়, ওপরের শেষ সিঁড়িটার মাথায় ভকিল খুবলাল এবং দুটো শক্ত চেহারার মাঝবয়সী অচেনা মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্ধকার রাতে তিনটে মানুষ এমন একটা বাড়িতে তাদের জন্যই যে অপেক্ষা করছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ঢ্যাঙা কুঁজো চেহারার খুবলাল সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতো তর তর ক'রে নেমে আসে। মেয়েমানুষ দুটোও নামতে থাকে; তবে খুবলালের মতো অত দ্রুত নয়, তাদের গতি অনেক কম।

খুবলাল ঘাড় ঝুঁকিয়ে রেবতী এবং কিরণকে বলে, 'আইয়ে ভাবীজি, আও আও বেটা—'

মেয়েমানুষ দুটো কাছে আসতে একজনকে চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু কোথায় তাকে দেখেছে, চট ক'রে মনে করতে পারে না।

মায়ের পাশাপাশি খুবলালদের সঙ্গে ওপরে উঠতে থাকে কিরণ।

খুবলাল রেবতীকে বলে, 'রাস্তায় আসতে কোনো তখলিফ হয়নি ত ভাবীজি?'

রেবতী বলেন, 'না।'

'আগে কি পুরা কোঠিটা দেখে নেবেন?'

'আপনি যদি বলেন তাই দেখব।'

এবার খুবলাল কিরণের দিকে ফিরে বলে, 'বেটা কিরণ, এ কোঠিটা মুকুটনাথজি কিনবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর ইচ্ছা, কেনার আগে নতুন কোঠিটা তোমাকে আর ভাবীজিকে দেখিয়ে দিই। তোমাদের পসন্দ হ'লে তবেই কেনা হবে।'

কিরণ শুনেছে খুবলাল লোকটা নাকি একজন অত্যন্ত ঘাঘী উকিল। তার মতো বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়েকে এখানে টেনে আনার যে অজুহাতটি সে দিল তা এতই ছেঁদো এবং অবিশ্বাস্য, ভাবা যায় না। লোকটা তাকে ভেবেছে কী? দুগ্ধপোষ্য নাবালিকা? শুধু বাড়ি দেখানোই যদি উদ্দেশ্য হ'ত, মা সোজাসুজি

তাঁকে বলে দিতে পারতেন। ষড়যন্ত্রকারীর মতো কৌশলে তাকে টেনে আনার প্রয়োজন ছিল না।

কিরণ এক সময় খুবলালকে বেশ পছন্দই করত। কিন্তু মুকুটনাথের অসুস্থতার খবর দিয়ে দিল্লি থেকে নিয়ে আসার পর থেকেই তার ওপর বিরূপ হয়ে আছে। কিরণের ধারণা আজ যে এখানে তাকে আনা হয়েছে তার ভেতরেও গভীর চক্রান্ত রয়েছে এবং এর পেছনে নিশ্চয়ই আছেন মুকুটনাথ এবং তাঁর হাতের পুতুল এই মানুষগুলো—খুবলাল রেবতী এমন কি ঐ মাঝবয়সী মেয়েমানুষ দুটোও। কিন্তু চক্রান্তটা যে কী, তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ অপার্থিব কিছু যেন ভর করে কিরণের ওপর। 'যা হবার হবে'—এমন একটা বেপরোয়া একরোখা চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। বুকের ভেতর থেকে উৎকণ্ঠা এবং ভয়টা বের ক'রে দিতে দিতে মা'র সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় উঠে আসে।

এ বাড়িটার একতলায় দোতলায় সব মিলিয়ে আঠারোখানা ঘর। খুবলাল ভকিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত ঘর, বাথরুম, ঝুলবারান্দা, কিচেন ইত্যাদি দেখিয়ে রেবতী এবং কিরণকে শেষ পর্যন্ত দোতলার বসার ঘরে নিয়ে এল। বাড়ি দেখাবার সময় সেই মেয়েমানুষ দুটো অবশ্য সঙ্গে ছিল না।

কিরণ লক্ষ করেছিল, প্রতিটি ঘরই দামী দামী আসবাবে সাজানো। বাথরুমে নকশা-করা টাইলস এবং শাওয়ার। এত বড়ো বাড়িটা কিন্তু একেবারে ফাঁকা। খুবলাল আর সেই মেয়েমানুষ দুটি ছাড়া অন্য কাউকে চোখে পড়েনি।

যাই হোক, ড্রইংরুমে এসে বসতেই খুবলাল অসীম উৎসাহে রেবতীকে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িটা চমৎকার, তাই না?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে উত্তর দেন রেবতী।

এবার কিরণের দিকে তাকিয়ে খুবলাল, জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কেমন লাগল?'

এ বাড়িটার মালিক যেন খুবলাল নিজেই। এটা দেখিয়ে সে যেন চাপা গর্বই বোধ করছে। কিরণ বলে, 'ভালো বাড়ি।'

'তোমাদের যখন পসন্দ হয়েছে, মুকুটনাথজিকে কিনে ফেলতেই বলি।'

কিরণ উত্তর দিল না।

খুবলাল এবার জানায়, বাড়িটা জলের দরে পাওয়া যাচ্ছে। কে এক বিজনেসম্যান নাকি শখ ক'রে এটা বানিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসায় ভরাডুবি হওয়ায় বাড়িটা বেচে দিচ্ছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা একেবারেই উচিত হবে না, ইত্যাদি।

আসল ষড়যন্ত্রকারী অর্থাৎ মুকুটনাথকে না দেখে কিরণ আবছাভাবে ভাবে, হয়ত বাড়িটা দেখাবার জন্যই তাকে এবং রেবতীকে এখানে আনা হয়েছে। পরক্ষণে রেবতীর আগের আচরণ, চোখের জলের ধারা এবং তাঁর কথাবার্তা মনে পড়তেই পুরনো সন্দেহ ফিরে আসে।

একনাগাড়ে কথা বলতে বলতে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে খুবলাল, 'আরে ভামরী, চায়-পানি ত দিয়ে যা।' হঠাৎ অতিথি আপ্যায়নের জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

ভামরী নামটা শুনে চমকে ওঠে কিরণ। মনে পড়ে, এ বাড়িতে ঢুকে দুটো মেয়েমানুষের মধ্যে যাকে চেনা চেনা মনে হয়েছিল তাকে গোলগোলি মৌজায় দেখেছে সে। সেখানে ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে যেদিন তাকেও যৌতুকের জন্য জমি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মুকুটনাথ, ভামরী ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে চলে এসেছিল, তার ঘরে সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল।

একটা চাপা গুঞ্জন একসময় ধরমপুরায় শোনা যেত, ভামরী নাকি মুকুটনাথের রাখনী বা রক্ষিতা। যৌবনের চটক নষ্ট হবার পর মুকুটনাথ তাকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এ সব কথা আগেই কানে এসেছে কিরণের। কিন্তু সে ভেবেই পাচ্ছে না, যে মেয়েমানুষটিকে মুকুটনাথ অনেক কাল আগেই ত্যাগ করেছেন সে এখানে এল কী করে? এই যোগাযোগের ব্যাপারটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না। সব কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

ভেতর থেকে ভামরীর গলা ভেসে আসে, 'আতী হ্যায় ভকিলজি—'

একটু পর প্রচুর মিঠাই এবং ঠাণ্ডাই সরবত নিয়ে এ ঘরে চলে আসে সে। তবে দ্বিতীয় মেয়েমানুষটিকে এখন আর দেখা যায় না।

কিরণ বলে, 'এখন আমি কিছু খাব না।'

খুবলাল হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'তাই কখনো হয়! একটু না খেলে আমার আত্মার শান্তি হবে না। লেও বেটা—'

খুবলাল অনেক অনুনয়-টনুনয় করায় শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই সরবতের গেলাস তুলে নেয় কিরণ। রেবতী খাবার দাবার কিছুই ছোঁন না। বাইরে খাওয়ার অভ্যাস নেই তাঁর।

ঠাণ্ডাই আধাআধি খাওয়া হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ কিরণের মনে হয়, মাথার ভেতর চাকার মতো কিছু ঘুরে যাচ্ছে। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি, নাক-কান দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে যেন হল্কা বেরুচ্ছে। চোখ-

দুটো গভীর ঘুমে যেন জড়িয়ে আসতে থাকে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও চোখ খুলে রাখতে পারে না কিরণ। সে টের পায় বিপর্যয়ের মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। সেটা যে ঠিক কী, বুঝবার আগেই চোখের সামনের সমস্ত কিছু গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায়।

*

জ্ঞান ফেরার পর প্রথমটা কিরণ আবছাভাবে দেখতে পায় কে যেন তার মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছেন। মানুষটা কে, সে বুঝতে পারে না। তবে এটা টের পায় তার তলপেটে কেউ করাত চালাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণায় শরীরের নিচের দিকটা ছিঁড়ে যাবে। কিরণের গলা থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে?' একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় কিরণ। কিন্তু তার স্নায়ু এখন এতই দুর্বল যে গলাটা কার, একেবারেই বুঝতে পারে না। ঘোরের মধ্যেই টের পায়, তার মুখে থকথকে আরকের মতো কিছু ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

আরকটা গিলে ফেলার বেশ কিছুক্ষণ পর তলপেটের কষ্টটা অনেক কমে আসে। এবার তার চোখের ঘোলাটে ভাব অনেকটাই কেটে যায়। মাথার ভেতরটা এতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, ফলে আশেপাশের কোনো কিছুই ভালো ক'রে বুঝতে বা ধরতে পারছিল না। এখন সে দেখতে পায় 'মিশ্র নিকেত'-এ নিজের ঘরের খাটটিতে শুয়ে আছে, আর রেবতী উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা ছাড়া এ ঘরে অন্য কেউ নেই।

কিরণের মস্তিষ্কে হঠাৎ স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে কাজ শুরু হ'য়ে যায়। মনে পড়ে মা'র সঙ্গে নির্জন নতুন বাড়িতে গিয়েছিল সে। সেখানে খুবলাল ভামরী এবং আরেকটি মেয়েমানুষ তাদের আপ্যায়নের জন্য অপেক্ষা করছিল। ভামরী তাকে ঠাণ্ডাই খাওয়ায়, তারপর কয়েক ঘণ্টা, নাকি কয়েকদিন কী ঘটেছে তার মনে নেই। এখন দেখা যাচ্ছে নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

রেবতী আরো একটু ঝুঁকে বলেন, 'এখন ব্যথাটা কম লাগছে?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় কিরণ। সে কিছুটা অবাকই হয়। ফীটফাটে ক'রে সে যখন নতুন বাড়িটায় যায় মাকে অত্যন্ত কঠোর এবং রুক্ষ দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই রেবতী একেবারে বদলে গেছেন। এখন চিরকালের চেনা কোমল, স্নেহময়ী, সন্তানের দুঃখে কাতর মা'কেই তার পাশে দেখতে পাচ্ছে!

রেবতী আর্দ্র স্বরে বলেন, 'দু'চারদিন একটু কষ্ট হবে। তারপর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কোনো ভয় নেই।'

কিরণ উত্তর দেয় না। আচমকা তার মনে হয়, তার শরীরের অভ্যন্তরে যে নতুন প্রাণটি লালিত হচ্ছিল, সেটি আর নেই। ভ্রূণটাকে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে। এই জন্যই কি কৌশলে তাকে সেই বাড়িটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কে যেন তাকে বলেছিল, আজকাল গর্ভপাত ক'রে পয়সা কামায় ভামরী।

কিরণ শিউরে ওঠে, দু'হাতে মুখ ঢেকে অবুঝ বালিকার মতো কাঁদতে থাকে।

গভীর মমতায় তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রেবতী বলেন, 'কাঁদিস না মা, কাঁদিস না।'

কিরণের কান্না ক্রমশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে, 'কেন তোমরা আমার সর্বনাশ করলে? কেন?'

'তোর কোনো ক্ষতি করা হয়নি মা। পাপটাকে শুধু নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর যে কোনো উপায় ছিল না।'

*

কয়েকদিন পর শিউশঙ্করজির নতুন মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় প্যাণ্ডেল খাটিয়ে কিরণের গর্ভশুদ্ধির জন্য হোমযজ্ঞের আসর বসান বশিষ্ঠনারায়ণ। গর্ভ-শুদ্ধির কথাটা অবশ্য গোপন রাখা হয়। যেটা জানানো হয় তা হ'ল, অসুস্থ কিরণের আরোগ্যের জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে।

ধরমপুরার তাবত মানুষজনকে এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাদের জন্য ঢালাও প্রসাদের ব্যবস্থা করেছেন মুকুটনাথ। তা ছাড়া এক শ' একজন নাম-করা সৎ ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে নতুন বস্ত্র, স্বর্ণ, ফল, ফুল, মিষ্টি, রুপোর থালা, উপবীত, নিখুঁত গরু এবং দু শ' এক টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

যজ্ঞকুণ্ডের আগুনে ধুনো, ঘি ইত্যাদি নিবেদন করতে করতে উদাত্ত স্বরে মন্ত্রপাঠ করছেন বশিষ্ঠনারায়ণ।

'দ্যো শান্তিঃ; অন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ,
ওষধয়ঃ শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ
বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ

বিশাল শামিয়ানার নিচে প্রচুর লোকজন। এককোণে পাশাপাশি বসে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে আলোচনা করছিলেন।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'গর্ভশুদ্ধি হয়ে গেল। আর কোনো অশান্তি নেই। এবার কিরণের পেটে যে সন্তান আসবে তার জন্য মাতৃকুল পিতৃকুল কারো কোনো ক্ষতি হবে না। ঈশ্বর তাকে পাপমুক্ত করছেন।'

মুকুটনাথ সাগ্রহে বলেন, 'কিরণ সুস্থ হ'য়ে উঠলে গুরুজিকে তা হ'লে বিয়ের একটা দিন ঠিক ক'রে দিতে বলি ?'

'নিশ্চয়ই।'

ওদিকে বশিষ্ঠনারায়ণের গভীর কণ্ঠস্বর আকাশে বাতাসে মন্ত্রের পবিত্র বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে।

'ওঁ সর্ব্বরোগ শান্তিঃ, ওঁ সর্ব্বপচ্ছান্তি। ওঁ যৎ এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতি-গুচ্ছতু। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।'